আল্লামা সাঈদী

রচনাবলী

১

আল্লামা সাঈদী রচনাবলী

১

www.pathagar.com

আল্লামা সাঈদী রচনাবলী

১

প্রকাশক

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

আল্লামা সাঈদী রচনাবলী- ১

প্রকাশক ঃ	রাফীক বিন সাঈদী ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯
অনুলেখক ঃ	আব্দুস সালাম মিতুল
প্রথম প্রকাশ ঃ	মে-২০০৭
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ	নাবিল কম্পিউটার ৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, ০১৭১-৪৩৮৮২৫৪
প্রচ্ছদ ঃ	মশিউর রহমান
মুদ্রণ ঃ	আল আকাবা প্রিন্টার্স ৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ	৩০০ টাকা মাত্র।

Allama Sayedee Rachonabolee-1st Part, Co-operated by Rafeeq bin Sayedee. Managing Director of Global publishing Network, Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Global publishing Network, Dhaka. 1st Edition: May 2008. Price: 300 TK, Only in BD. 12 Doller in USA. 8 Pound in UK.

www.pathagar.com

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط

উ ৎ স র্গ

আমার প্রতি যাঁর অফুরন্ত ইহ্সানের পুরুস্কার কেবলমাত্র

লা- শরীক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই দিতে পারেন

আমার গর্ভধারিণী মা.............

মুহ্তারামা গুলনাহার বেগম

এর পবিত্র করকমলে

স্নেহধন্য

সাঈদী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে শতকোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি একান্তই দয়া করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জীবন বিধান হিসাবে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী **হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** প্রতি, যাঁর মাধ্যমে দিশেহারা মানবতা পেয়েছে সঠিক পথের দিশা। চির অবহেলিতা নারী জাতি পেয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার। যিনি বর্ণ-বৈষম্য দূরীকরণের পথিকৃৎ, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়েছেন, এক কথায় অদ্বিতীয় সফল রাষ্ট্র নায়ক ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে সমগ্র বিশ্বে তিনি অতুলনীয়।

আজকের পৃথিবী ও তার অধিবাসীরা যদি সত্যকার অর্থে শান্তি পেতে চায়, ভীতিহীন নিরাপত্তাপূর্ণ, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বিশ্ব দেখতে চায় তাহলে মানব রচিত সকল মতবাদ দু'পায়ে দলে ফিরে আসতে হবে রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিথ পথে। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে এ পথের বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের মাধ্যমে জন সমক্ষে সার্থকভাবে যাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন আল্লামা সাঈদী তাঁদেরই অন্যতম।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মুক্তি পাগল জনতার কাছে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত একটি নাম, একটি আন্দোলন, একটি প্রতিষ্ঠান। সমগ্র বিশ্বে যাঁরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁদের অনেকের নিকট সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব তিনি। আল্লাহর কোরআনের প্রচার ও প্রসারের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মুসলিম বিশ্বের গন্ডী অতিক্রম করে অমুসলিম বিশ্ব তথা পাশ্চাত্য জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি আল কোরআনের খাদেম ও অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে এ দেশের সকল স্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত।

এদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁর দ্বীনি খেদমত গণমানুষের মনের মনিকোঠায় দীর্ঘকাল জাগরুক থাকবে ইনশাআল্লাহ্। বাংলাদেশের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে তিনি মহাগ্রন্থ্ আল কোরআনের বিপ্লবী আহ্বান নিয়ে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের সে আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলো আশাহত দিশাহারা জাতি। বাংলাদেশে আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি যে জাগরণ সৃষ্টি করেছেন- আল হাম্‌দুলিল্লাহ্, এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই, সে ইসলামী জাগরণকে অবদমিত করতে পারে। জনপ্রিয়তার যে কোনো মানদন্ডে উত্তীর্ণ আল্লামা সাঈদী গোটা জাতির কাছে যেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী। আমরা মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তাঁর সুস্বাস্থ্য, ঈমান দীপ্ত দীর্ঘ জীবন এবং মানসিক স্বস্তি কামনা করি।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সবকটি মহাদেশের বহুসংখ্যক দেশেই অডিও, ভিডিও, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাঁর আকর্ষণীয় কণ্ঠ যেমন ধ্বনিত হচ্ছে তেমনি ওয়েবসাইটেও পঠিত হচ্ছে তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ। তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী ছোট-বড় গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে ষাটের উর্ধ্বে। তাঁর কোরআন-হাদীস ও বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য শুনে দেশ- বিদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক অমুসলিম ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্কের এ্যাটর্নি অব ল' যোশেফ গ্রোয়ে অন্যতম।

বহু সংখ্যক নাস্তিক ও চরম ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থী তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত পবিত্র কোরআনের তাফসীর শুনে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন। বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য বিভ্রান্ত নারী-পুরুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন। যারা নামাযের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতো, জীবনে কখনো মসজিদ মুখী হতেন না, তাঁরা নিয়মিত নামায আদায় করছেন। পবিত্র কোরআন যারা পাঠ করতে জানতেন না, আরবী অক্ষর যাদের কাছে বিরক্তি সৃষ্টি করতো, তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে আরবী ভাষায় কোরআন পাঠের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তাঁর মাহফিল শোনার পূর্বে এদেশের জনগণের কাছে এ কথা অজানা ছিল যে, ওয়াজ-তাফসীর আধুনিক বিজ্ঞান সমৃদ্ধ একটি শিল্পসৌকর্য বা ওয়াজ-বক্তৃতা একটি

www.pathagar.com

মনোমুগ্ধকর আর্ট। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর কণ্ঠসৌকর্য দিয়ে ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন, বক্তৃতা একটি শিল্প বা একটি চমৎকার আর্ট। তিনি ওয়াজের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন তা অকল্পনীয়। বর্তমানে শুধু ওয়াজের মাহফিলেই নয়–প্রতি জুম্‌য়া'বারে সম্মানিত খতিব সাহেবগণ যে আলোচনা করেন, সে আলোচনাও হয় অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। আল্লামা সাঈদী যে ধারায় এবং যে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে বক্তৃতা করেন, বর্তমানেও বহুসংখ্যক সম্মানিত ওয়ায়েজীন ও খতিবগণ সে চেতনা তাঁদের বক্তৃতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। আল্লাহর দ্বীনকে সহজবোধ্য করার জন্য নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এক বড় নিয়ামত। কারণ আধুনিক শিক্ষিত শ্রোতাবৃন্দের রুচিরও পরিবর্তন এসেছে, তারা আগের মতো শুধু কিচ্ছা-কাহিনী নির্ভর ওয়াজ শুনতে চান না, তাঁরা চান কোরআর-হাদীস সমৃদ্ধ ও জীবন সম্পৃক্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি নির্ভর আলোচনা। সে ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

শহর নগর বন্দর অতিক্রম করে বাংলার নিভৃত পল্লীর জীর্ণ কুটিরেও আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠ অনুরণিত হচ্ছে। তাঁর কণ্ঠ নিসৃত পবিত্র কোরআনের শব্দাবলীর ঐন্দ্রজালিক সুর মানুষকে এমনভাবে তাফসীর মাহফিলের দিকে টেনে নিয়ে আসে, যেমন চম্বুক টেনে নিয়ে আসে লৌহ খন্ডকে। তিনি শুধু সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। তাঁকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে বহুমাত্রিক পরিবেশ। তাঁকে কেন্দ্র করেই জনতার সাগরে জেগে ওঠে ঊর্মিমালা। মুসলিম নামক ঘুমন্ত নরশার্দুলদের ঘুম ভাঙ্গানোর অন্যতম হাতিয়ার আল্লামা সাঈদী কর্তৃক পরিবেশিত কোরআন তাফসীর। আল হাম্‌দুলিল্লাহ্- এটি মহান আল্লাহর কোরআনের অন্যতম মুজিযা। আল্লাহ তা'য়ালা ঘূণে ধরা সমাজ তথা শির্‌ক- বিদয়াত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মিল্লাতকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগ- জামানায় সময়ের ব্যবধানে তাঁর একনিষ্ঠ গোলামদের মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে এ বিষয়ে সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন।

১৯৭১ সন পরবর্তী বাংলার অন্ধকার অমানিশায় আল্লামা সাঈদী কোরআনের প্রদীপ জ্বালাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নিজ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে সেই থেকে অদ্যাবধি পবিত্র কোরআনের রঙে রাঙিয়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশে ও বিদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে তিনি নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আল্লাহর কোরআনের

www.pathagar.com

সৈনিক বেরিয়ে আসছে। অমুসলিম দেশসমূহেও তিনি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে মহাসত্যের আলো কুফুরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত অমুসলিম জাতির ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে।

অমিত সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত বাংলাদেশ, গোড়া থেকেই দেশটি ছিলো সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীদের কু-নজরে। ইউরোপ- আমেরিকার প্রচেষ্টা দেশটিকে গোলাম বানানোর, রাশিয়ার প্রচেষ্টা ছিলো এদেশের মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করার আর ভারত এদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বানানোর নিত্য- নতুন চক্রান্ত ষড়যন্ত্রে কখনো বিরতি দেয়নি। দেশ ও জাতিসত্তা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বহুমুখী চক্রান্তে যখন হারিয়ে যাচ্ছিলো মুসলমানদের স্বর্ণালী ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ডুবে যাচ্ছিলো তারা শির্ক- বিদয়াত ও কুসংস্কারের অন্ধকার গহ্বরে।

পুজিবাদ, নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, শির্ক ও বিদয়াতের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ো বাতাসে উপমহাদেশে মুসলিম উম্মাহ্ এ ঝড়ো বাতাসের প্রচন্ডতায় যেনো ঈমানী তথা ইসলামী চেতনা না হারায় সে লক্ষ্যে তৎকালীন ওলামা- মাশায়েখ ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদগণ তাঁদের ক্ষুরধার লিখনী, যুক্তি-নির্ভর শানিত বক্তব্য ও যৌক্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী চেতনাকে মুসলিম উম্মাহ্র হৃদয় কোটরে জীবিত রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। চরম প্রতিকূল পরিবেশে ভারতীয় উপমহাদেশে যে কয়জন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফাঁসির রশিকে ফুলের মালা হিসেবে মনে করে দিশাহারা জাতিকে কোরআন- হাদীস ও বিজ্ঞানভিত্তিক সাহসী বক্তব্য এবং লেখনীর মাধ্যমে পথের দিশা দেখিয়েছেন, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসীম অনুগ্রহে আল্লামা সাঈদী তাঁদেরই একজন।

তাঁর সাহসী কন্ঠস্বর বন্ধ করে দেয়ার জন্যে স্বৈরশাসকরা কিছু দিনের জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলো, ৮০'র দশকে দেশব্যাপী অসংখ্য হরতাল ও অগণিত বার ১৪৪ ধারা জারি করেছিলো। আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহ্ফিল বন্ধের অপচেষ্টায় ষড়যন্ত্রকারীরা মাত্র এক বছরেই ৫৬ বার হরতাল করেছিলো। পক্ষান্তরে কোরআন প্রেমিক অগণিত নারী-পুরুষ ইসলাম বিদ্বেষীদের একটি হরতাল এবং ১৪৪ ধারা কোথাও কার্যকর হতে দেয়নি। দেশবাসী সাক্ষী, নির্ধারিত সকল তাফসীর মাহ্ফিল ১০০% সফল হয়েছে। কোনো একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এত বার ব্যর্থ হরতালের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

www.pathagar.com

গন্তব্যে তাঁর যাত্রা পথে বহু সংখ্যক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। তাফসীর মাহফিলে তিনি পবিত্র কোরআনের তাফসীর পেশ করার জন্যে ঢাকা থেকে আকাশ পথে সিলেট গিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে বিমান থেকে নামতে না দিয়েই ঢাকায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। সর্বোপরি আমাদের জানা মতে এ পর্যন্ত দেশের পাঁচটি স্থানে বিভিন্ন সময় তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রও করা হয়েছিলো। মাহফিলে তাফসীর পেশ করা অবস্থায় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়া হয়েছে। কিন্তু মহান রাহ্‌মানুর রাহীম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম অফুরন্ত দয়া ও গণমানুষের হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসায় তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ অবস্থায় এখনো আমাদের মাঝে পবিত্র কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে যাচ্ছেন- আল হাম্‌দু লিল্লাহ্। যদিও দেশে জরুরী অবস্থার কারণে তিনি তাফসীর মাহফিলে বক্তব্য রাখতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে আর তাঁর ক্ষুরধার কলম ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, নমরুদ যেখানে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলার চেষ্টা করেছে ইবরাহীম (আঃ) সেখানে আবির্ভূত হয়ে নমরুদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। যেখানেই ফেরাউন জনগণের ওপরে খড়গ হস্ত হয়েছে সেখানেই মূসা (আঃ) গর্জে উঠে তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। যেখানেই আবু জেহেল- আবু লাহাবরা ইসলামের বিরুদ্ধে ফণা বিস্তার করার চেষ্টা করেছে সেখানেই আবু বকর-ওমর (রাঃ) সে ফণা দলিত মথিত করেছেন– এটাই চিরন্তন ইতিহাস।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় এ জাতি নিজের স্বকীয় আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুন্দর, সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল। শাহাদাতের স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মহান আল্লাহর পবিত্র নামে মরণ-পণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতির কুসুমাস্তীর্ণ পথ ষড়যন্ত্রের দানব সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বসে পড়লো। গোটা জাতি যেন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। মহাঅমানিশা নেমে এলো জাতীয় জীবনে। কোথাও সামান্যতম আলোর রেখাটুকু বাকি রইলো না। জাতীয় জীবনের স্বপ্ন স্বৈরাচারের উদ্ভট নানাবিধ চেতনার পদতলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো। ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলার মুসলিম তরুণ-যুবকদের সমগ্র বোধশক্তির ওপরে, ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও ইসলামের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার আস্তরণে চিরতরে মহাবিস্মৃতির কৃষ্ণকালো অন্ধকারের যবনিকা টেনে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করলো। জাতীয় জীবনের যেখানে শুরু সেখানেই নামিয়ে দেয়া হলো

www.pathagar.com

অভিশাপের সর্বগ্রাসী অনল প্রবাহ। ইতিহাস সাক্ষী, দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে তওহীদী জনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর হিসেবে আল্লামা সাঈদী অকুতোভয়ে সিংহ গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিরাশার সাগরে নিমজ্জিত ও হতাশাগ্রস্ত জাতিকে শুনিয়েছিলেন আশার বাণী। সাহসী আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছিলেন তৎকালীন নিন্দিত বিশ্বের নন্দিত গন্তব্য।

মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অমোঘ অলংঘনিয় নিয়মে আল্লামা সাঈদী একদিন অবশ্য অবশ্যই চিরকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাবেন- এ সত্যের মৃত্যু নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ও লিখনী যেনো সহসাই হারিয়ে না যায় এ জন্যে গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আমরা নিয়েছি কতিপয় সাহসী পদক্ষেপ। এ পর্যন্ত আমরা তাঁর লিখিত দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ চার খন্ড তাফসীরে সাঈদীসহ বিভিন্ন বিষয়ে অর্ধশত ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে সুলিখিত তাঁর রচনাবলী আমরা গ্রন্থাকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। উদ্যোগ নিয়েছি ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাংলাভাষী মুসলমান নর-নারী বিশ্বের যেখানেই থাকুন, তাঁরা যেনো আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠ নিঃসৃত তাফসীর শুনতে পারেন এবং তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ পড়তে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা Islam.Net.bd উক্ত উদ্যোগের অংশ হিসেবে সূচনাতেই যে সাতটি পুস্তিকা একত্রে **আল্লামা সাঈদী রচনাবলী-১** নামে প্রকাশ করা হলো, সে সাতটি রচনার নাম যথাক্রমেঃ–

১। আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় ও তাঁর অবস্থান

২। জীবন্ত ঈমানের স্বাদ

৩। কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক ব্যাখ্যা

৪। ইসলামী জিন্দেগীর সাফল্য ও ব্যর্থতার মানচিত্র

৫। দ্বীনে হকের আন্দোলনে শরীক না থাকার পরিণতি

৬। ইসলামী আন্দোলনে ধৈর্য্যের অপরিহার্যতা

৭। মৃতদেহ নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা কি করবেন?

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষে

বিনয়াবনত

আব্দুস সালাম মিতুল

www.pathagar.com

আলোচ্য সূচী

পৃষ্ঠা নং	আল্লাহ্ তা'য়ালার পরিচয় ও তাঁর অবস্থান
২১	আল্লাহ্ তা'য়ালা কোথায় আছেন?
২৫	শাসন কর্তৃত্বের আসনে তিনি সমাসীন
২৭	তাঁর জ্ঞান সৃষ্টি জগতকে বেষ্টন করে রেখেছে
২৮	সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম বিষয়ও তাঁর কাছে গোপন নেই
২৯	দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সবকিছুই তাঁর আয়ত্বে
৩০	আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দার কত কাছে?
৩১	অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে
৩২	তাঁর অজ্ঞাতে একটি পাতাও পড়ে না
৩৩	তাঁর সৃষ্টি কাজে কেউ অংশীদার ছিল না
৩৩	আল্লাহর সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়
৩৪	নিষ্প্রাণের মাঝে তিনিই প্রাণ দানকারী
৩৪	তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন
৩৪	রাত ও দিনকে তিনি যদি দীর্ঘ করে দেন
৩৫	সমস্ত কিছুর ভান্ডার আল্লাহ্রই হাতে
৩৬	তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী
৩৬	তিনিই সৃষ্টিতে ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন
৩৯	তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত
৪০	আল্লাহ্ শব্দ কিভাবে এলো

www.pathagar.com

জীবন্ত ঈমানের স্বাদ

৪৯ জীবন্ত ঈমানের অতুলনীয় স্বাদ

৫০ ঈমানের প্রভাবে ইতিহাসের বিস্ময়কর বিপ্লব

৫৪ চিন্তার জগতে ঈমানের প্রভাব

৫৭ ঈমান জাগতিক ভয়-ভীতি দূর করে দিয়েছিলো

৬৮ ঈমান জীবনের বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক ব্যাখ্যা

৭৩ আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক

৭৪ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

৭৮ ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ

৮৪ ইবাদাতের ব্যাপক অর্থ ও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি

৮৮ প্রাকৃতিক আইন বনাম ইবাদাত

৯০ সৃষ্টিসমূহ আল্লাহর ইবাদাত করছে

৯২ আল্লাহর নিয়ম অপরিবর্তনীয়

৯৪ মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি আনুগত্য করা

৯৭ আত্মার বিকাশ ও ইবাদাত

৯৯ মানবাত্মার খাদ্য

১০২ ইবাদাতের তাৎপর্য

১০৩ মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মই ইবাদাত

১০৬ বন্দেগী ও দাসত্বের ক্ষেত্রে ইবাদাত

১০৯ ইবাদাতের পূর্ব শর্ত লক্ষ্য স্থির করা

১১১ ইবাদাতের লক্ষ্য হবেন একমাত্র আল্লাহ

১১৪ একমাত্র আল্লাহ-ই ইবাদাত লাভের অধিকারী

১১৯ দোয়া–দাসত্বের স্বীকৃতি

১১৯ দোয়া ও তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি

১২৫ আনুগত্য বনাম ইবাদাত

www.pathagar.com

১২৮ পূজা বনাম ইবাদাত
১৩২ মারাত্মক বিভ্রান্তি
১৩৬ আল্লাহর দাসত্ব মানুষের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা
১৪০ আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার
১৪২ দাসত্বকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা
১৪৫ ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা
১৫১ আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা
১৫৬ আল্লাহর প্রতি মানুষের দাবী
১৫৭ পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহর

ঈমানী জিন্দেগীর সাফল্য ও ব্যর্থতার মানচিত্র

১৬৩ মানব জীবনে সময়ের গুরুত্ব
১৬৫ মানব জীবন নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ
১৬৭ ক্ষতির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য
১৬৮ আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ব্যর্থ হবে
১৬৯ প্রকৃত দেউলিয়া কোন্ ব্যক্তি
১৭১ ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে
১৭৪ দুনিয়া পূজারী ব্যক্তি ব্যর্থ হবে
১৭৬ মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে কারা
১৭৮ মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার মূল কারণ
১৮৪ আমলে সালেহ্ ও নিয়্যতের বিশুদ্ধতা
১৮৬ সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে দুটো শর্ত
১৮৯ আখিরাতে যেসব সৎ কাজের বিনিময় দেয়া হবে না
১৯৭ আখিরাতে যারা সফলতা অর্জন করবে
২০১ ধন-ঐশ্বর্য্য সফলতার মানদন্ড নয়
২০৩ ব্যর্থতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—কারুণ
২০৮ সম্মান মর্যাদার প্রকৃত মানদন্ড
২১৬ সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে শেষ কথা

www.pathagar.com

দ্বীনে হকের আন্দোলনে শরীক না থাকার পরিণতি

২২৩ দ্বীনে হক–এর অর্থ ও ব্যাখ্যা
২২৮ দ্বীনে হক–এর প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ও কর্তব্য
২৩৫ দ্বীনে হক–এর বাস্তব সুফল
২৪২ দ্বীনে হক–এর বাস্তবায়নে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা
২৪৫ দ্বীনে হক–এর প্রতি সাক্ষ্যদানের প্রক্রিয়া
২৪৮ দ্বীনে হক–এর সাক্ষ্য দান ও বর্তমান মুসলমানদের কর্মনীতি
২৫৫ দ্বীনে হক–এর দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি
২৬৫ দ্বীনে হক–এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী
২৬৭ দ্বীনে হক–এর দাওয়াত দানকারীকে দুঃসাহসী হতে হবে
২৭১ দ্বীনে হক–এর দাওয়াত দানকারীকে নির্লোভী হতে হবে
২৭৩ দ্বীনে হক–এর দাওয়াত দানকারী আল্লাহকে সাহায্য করে
২৭৬ দ্বীনে হক–এর দাওয়াত দানকারীকে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে
২৭৯ দ্বীনে হক–এর বিরোধিদের ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা

ইসলামী আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

২৮৯ ধৈর্যের ব্যাপক ও সামগ্রিক অর্থ
২৯৩ সর্বাবস্থায় সততার নীতি অবলম্বন করাও 'সবর'
২৯৬ অন্যায়ের মোকাবেলা ন্যায় দ্বারা করাও 'সবর'
২৯৮ অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করাও 'সবর'
৩০৬ ধৈর্যশীলদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ
৩০৯ হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের 'সবর'
৩১৪ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের 'সবর'
৩২২ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক 'হক'-এর দাওয়াত
৩২৬ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের 'সবর'
৩৩০ হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের 'সবর'
৩৩২ শয়তানের প্ররোচনা ও 'সবর'

www.pathagar.com

৩৩৪ মুমিনের জীবন ও 'সবর'
৩৩৮ স্বাধীনভাবে আল্লাহ্র গোলামীর ক্ষেত্রে 'সবর'
৩৪২ অভিযোগহীন 'সবর'
৩৪৭ 'সবর'-এর উত্তম প্রতিদান
৩৫২ ধৈর্যশীলদের প্রধান দুটো গুণ

মৃতদেহ নিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা কি করবেন?

৩৫৯ মৃত্যু এক মহাসত্য এ থেকে কেউ পালাতে পারবে না
৩৫৯ মৃত্যুর সময় কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না।
৩৬০ দুনিয়া পূজারী লোকেরা মৃত্যুর সময় আফসোস করবে
৩৬১ মৃত্যু যন্ত্রণা অসহনীয়- অবর্ণনীয়
৩৬২ মৃত ব্যক্তির পরকাল যাত্রা
৩৬৫ কবর বলতে কি বুঝায়?
৩৬৭ পরকালীন জগৎ কাল্পনিক কোনো জগৎ নয়
৩৬৯ পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে
৩৭৩ প্রথমে মুসলমান হতে হবে
৩৭৫ কবরে নামানোর সময় কি বলা হচ্ছে?
৩৭৭ আপনি একজন ছাত্র, আপনার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন
৩৭৯ আপনি একজন ব্যবসায়ী, আপনার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন
৩৮১ আপনি একজন নারী, আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন
৩৮২ মৃতদেহ নিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা কি করবেন?
৩৮৬ আখিরাত ভিত্তিক চরিত্র গড়ুন
৩৮৭ আখিরাত বিশ্বাসীদের অপরাধ কি?
৩৮৯ নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না

www.pathagar.com

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ـ
وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ ـ

"তাঁর (নিদর্শনের অন্যতম) নিদর্শন হচ্ছে স্বয়ং আকাশসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝখানে যতো প্রাণী রয়েছে তা তিনিই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন; তিনি যখন চাইবেন তখন এদের সবাইকে (পুনরায়) একত্রিত করতে সক্ষম হবেন।" (সূরা আশ্ শূরা- ২৯)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'য়ালার পরিচয়
ও
তাঁর অবস্থান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা কোথায় আছেন?

গোটা আকাশ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। সকল সৃষ্টির তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও মালিক। তিনি এক ও একক সত্ত্বা, এই পরাক্রমশালী, রাজাধিরাজ, সম্রাটদের সম্রাট, সৃষ্টিকুলের একচ্ছত্র অধিপতি, লা-শরীক আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'য়ালার পরিচয় কি? এই আকীদার প্রশ্নে মুসলমানকে কোরআন- হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধভাবে বুঝতে হবে-জানতে হবে আল্লাহ্ কোথায় আছেন? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক বিভ্রান্তি। কোরআন ও সহীহ হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, তবুও না জানার কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। যে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন, তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। অনেকে বলে থাকেন যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সদা সর্বত্র বিরাজমান। এই ধারণা ও বিশ্বাস সঠিক নয়, কোরআন ও হাদীসের বিপরীত। কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক কথা হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবস্থান আরশের ওপর কিন্তু তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান, ক্ষমতা, কুদরত ও দেখা-শোনার মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সত্ত্বাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন।

আল্লাহ কোথায় আছেন, এই প্রশ্নের জবাব কোনো মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব হবে না বিধায় স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোথায় আছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের অবস্থান সম্পর্কে সাতবার বলেছেন যে তিনি আর্‌শে আযীমে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

ثُمَّ سْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ–

এরপর স্বীয় আরশের ওপর আসীন হয়েছেন। (সূরা আল আ'রাফ-৫৪)

এই একই বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা ইউনুস, সূরা রা'দ, সূরা ত্বাহা, সূরা ফোরকান, সূরা সিজ্‌দা ও সূরা হাদীদে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন, আল্লাহ তা'য়ালার এ কথার বাস্তব রূপ অনুধাবন করা কোনো মানুষের পক্ষে কক্ষণই সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা এই কথার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই মহাবিশ্ব এবং এর বাইরে যা কিছু রয়েছে, এসব সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'য়ালা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি বা তিনি সৃষ্টি কাজ সমাপ্ত করে তাঁর সৃষ্টি থেকে তিনি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেননি। তিনি নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে অচেতন, বেখবর, অসজাগ, অসতর্ক বা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেননি। অথবা সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে তিনি তাঁর সৃষ্টি জগৎ পরিচালনার দায়িত্বও কারো প্রতি অর্পণ করেননি। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার লক্ষ্যেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আরশে আযীমে সমাসীন হয়েছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন গোটা মহাবিশ্বের শুধুমাত্র সৃষ্টি কর্তাই নন, তিনি এই মহাবিশ্বের প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, পর্যবেক্ষক, সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণকারী, আবেদন শ্রবণকারী, দোয়া কবুলকারী এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও বিধান দানকারী।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন, এই বিষয়টি মানুষকে জানিয়ে দিয়ে তিনি এ কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি এই মহাবিশ্বকে অস্তিত্বশীল করে অবসর গ্রহণ করেননি এবং মহাবিশ্ব থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাননি। বরং মহাবিশ্ব লোকের ক্ষুদ্র থেকে সর্ববৃহৎ অংশ পর্যন্ত সর্বস্তরের বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্ব তিনিই করছেন। শাসন কার্য পরিচালনা ও সার্বভৌমত্বের সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র তাঁরই মুষ্ঠিতে নিবদ্ধ। মহাবিশ্ব ও এর বাইরে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু তাঁরই অধীন ও মুখাপেক্ষী। প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর বিধানের অধীনে ক্রিয়াশীল। সৃষ্টিসমূহের ভাগ্য চিরস্থায়ীভাবে তাঁরই বিধানের অধীনে বন্দী।

আল্লাহ্ তা'য়ালা কয়েকটি স্তরের মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে আরশে সমাসীন হয়েছেন, এই কথার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর মানুষের কাছে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্টি কাজে যেমন কারো কোনো অংশীদার ছিল না, অনুরূপভাবে সৃষ্টি কাজের পরিচালনা, প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও কারো সামান্যতম অংশীদারিত্ব নেই। তাঁর আরশ বা সিংহাসন, যা সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে, সেখান থেকেই তিনি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। মানুষকেও তিনি স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে স্বেচ্ছাচার হওয়ার স্বাধীনতা দেননি। মানুষের প্রত্যেকটি স্পন্দনের প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যেসব বিধি-বিধান প্রয়োজন, সে বিধানও তিনি আরশে বা আযীম থেকে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং মানুষের স্বেচ্ছাচারী হওয়া বা নিজের ভাগ্যের মালিক নিজেকে মনে করার কোনো অবকাশ নেই– এই কথাটিই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট করে দিয়েছেন এভাবে যে, তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। অর্থাৎ মূল কেন্দ্রে থেকে তিনিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ করছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ عَرْشِهٖ وَعَرْشُهٗ فَوْقَ سَمٰوٰتِهٖ وَقَالَ

بِاَصْبَعِهٖ مِنَّ الْقُبَّةِ–

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ আর্শের ওপর রয়েছেন। তাঁর আরশ হচ্ছে সমস্ত আকাশের ওপর। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরশে আযীমে আসীন হয়েছেন আর আরশ হলো আকাশ সমূহের ওপরে। আল্লাহ তা'য়ালা যে তাঁর মহান আরশে আযীমে অধিষ্ঠিত এবং আরশ যে ওপরে অবস্থিত এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে–

تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ–

ফেরেশ্‌তাগণ এবং রুহ আল্লাহ তা'য়ালার দিকে উর্ধ্বগামী হয়। (সূরা মায়ারিজ-৪)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ–

তাঁরই দিকে আরোহন করে উত্তম কথা এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। (সূরা ফাতির-১০)

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ–

বরং আল্লাহ তাঁকে (ঈসাকে) উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের দিকে। (সূরা আন্ নিসা-১৫৮)

বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে,– এই কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি কোনো স্থান থেকে বা নীচু স্থান থেকে কোনো কিছু প্রেরণ করা হলে অবতীর্ণ করা বুঝায় না। ওপর থেকে কোনো কিছু প্রেরণ করা হলে তা অবতীর্ণ করা বুঝায়। আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন সম্পর্কে বলেছেন–

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ–

এটি একটি কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসো। (সূরা ইবরাহীম-১)

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ–

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতরণ করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যা বুঝিয়েছেন তা দিয়ে তুমি মানুষের মধ্যে শাসন ও ফয়সালা করতে পারো। (সূরা নিসা-১০৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর বায়তুল মাক্‌দাসকে কিবলা হিসেবে নামায আদায় করতেন। তিনি মনে মনে

www.pathagar.com

কামনা করতেন, মক্কার কা'বাঘরকে যদি কিবলা বানানো হতো। এ জন্য তিনি বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি দিতেন। তাঁর দৃষ্টি দেয়ার অর্থ এটা ছিলো যে, ওপর থেকে আল্লাহ তা'য়ালা যদি কোনো আদেশ দিতেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের মনের অবস্থা দেখলেন এবং রাসূলকে জানিয়ে দিলেন−

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ−

নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেখি। (সূরা বাকারা-১৪৪)

আল্লাহর রাসূলের থেকে মহান আল্লাহর পরিচয় আর কে বেশী জানতে পারে? তিনিই সবথেকে বেশী আল্লাহর পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি জানেন যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা ওপরে আরশে আযীমে অবস্থান করছেন। এ জন্যই তিনি বার বার ওপরের দিকে তাকাতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে উপস্থিত সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, আমি কি তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি? উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ জবাব দিলেন, অবশ্যই। তখন তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে ইশারা করে আকাশের দিকে শাহাদাত আঙ্গুলী উঁঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।' (মুসলিম)

এ কথা যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা সব জায়গায় আছেন বা তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাহলে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল বিল, হাওড়, সাগর, মহাসাগর, আকাশ-বাতাস, আগুন-পানি, ময়লা তথা বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সকল স্থানেই তিনি রয়েছেন। যেসব জায়গা অবাঞ্ছনীয়, নিন্দনীয়, অবান্তর সেসব জায়গাতেও আল্লাহকে থাকতে হয়। পৃথিবীর সবথেকে নিকৃষ্ট, দুর্গন্ধময়, অপবিত্র তথা যেখানে বা যে স্থানে কোনো রুচিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়, সেখানেও আল্লাহ তা'য়ালা রয়েছেন− নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আসলামী (রাঃ) এর দাসীকে প্রশ্ন করলেন−

اَيْنَ اللّٰهُ؟ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا؟ قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ−

বলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা কোথায়? দাসী জবাব দিলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা আকাশের ওপর। তিনি পুনরায় সেই দাসীকে প্রশ্ন করলেন– বলো, আমি কে? দাসী জবাব দিলো, আপনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকামকে আদেশ দিলেন, এই দাসীকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে ঈমানদার। (মুসলিম)

শাসন কর্তৃত্বের আসনে তিনি সমাসীন

যদি ধরে নেয়া হয় যে আল্লাহ্ সব জায়গায় আছেন এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান এই কথার অর্থ হলো আল্লাহর ইলমে, আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে আল্লাহর নজরের সামনে গোটা সৃষ্টি জগত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোথায় রয়েছেন, এই প্রশ্ন মানুষের মনে জাগবে। মানুষ এই প্রশ্নের সঠিক জবাব কারো কাছ থেকে পাবে না। এ কারণে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাই এই প্রশ্নের জবাব এভাবে দিয়েছেন–

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى-لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى-وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى-

তিনি পরম দয়াবান। বিশ্ব জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসনে তিনি সমাসীন। যা কিছু পৃথিবীতে ও আকাশে রয়েছে, যা কিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে রয়েছে এবং যা কিছু ভূগর্ভে রয়েছে সবকিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চাইতেও গোপনে বলা কথাও জানেন। (সূরা ত্বা-হা-৫-৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে তোমাদের স্থিতি অবস্থিতি ও তোমাদের শান্তি-নিরাপত্তা প্রত্যেক মুহূর্তেই আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তোমরা এখানে আনন্দ-ফূর্তি করছো, অহঙ্কার প্রদর্শন করছো, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলছো, লিখছো, মিছিল-মিটিং করছো, আল্লাহর আদেশের বিপরীত পথে জীবন পরিচালিত করছো। এসব কিছু তোমরা করছো তোমাদের নিজেদের ক্ষমতাবলে নয়। তোমাদের জীবনের এখানে অতিবাহিত প্রত্যেকটি মুহূর্ত মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সংরক্ষণ বা হেফাযতের পরিণতি মাত্র। তাঁর ইঙ্গিতে যে কোনো মুহূর্তে প্রলয়ঙ্করী ভূ-কম্পনের মাধ্যমে এই যমীন তোমাদের জন্য আনন্দ

www.pathagar.com

ফূর্তির স্থান না হয়ে কবরস্থানে পরিণত হতে পারে। তোমরা যেসব বিলাস সামগ্রী নির্মাণ করেছো, সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছো, তা মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যেতে পারে।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ،

তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গিয়েছো সেই মহান সত্তা সম্পর্কে যিনি আকাশে রয়েছেন, এ ব্যাপারে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটির মধ্যে বিধ্বস্ত করে দিবেন এবং এই ভূ-তল সহসা হ্যাচকা টানে টল-টলায়মান হয়ে কাঁপতে শুরু করবে? (সূরা মূলক-১৬)

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا-

তোমরা কি এই ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গিয়েছো যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রবল বায়ূ প্রবাহিত করবেন? (সূরা মূলক-১৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ-

তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের ওপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

এই হাদীসেও আল্লাহ তা'য়ালার অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, তিনি আসমানের ওপরে আরশে আযীমে অবস্থান করছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে দিন ও রাতে পালাক্রমে আল্লাহর ফেরেশতারা যাওয়া আসা করে থাকেন। এই পালা পরিবর্তন হয় আসর ও ফজরের নামাযের সময়। এরপর যেসব ফেরেশ্তারা তোমাদের সাথে রাতে থাকেন, তারা আকাশে উঠে যান। তখন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে প্রশ্ন করেন, আমার বান্দাকে কোন্ অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? অথচ তিনি বান্দার অবস্থা সম্যক অবগত রয়েছেন। প্রশ্নের জবাবে ফেরেশ্তাগণ বলেন, তাদেরকে নামায আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং তারা যখন নামায আদায় করছিলো, তখন তাদের কাছে গিয়ে পৌছে ছিলাম। (বোখারী ও মুসলিম)

পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্তা নিয়োজিত রেখেছেন। এই ফেরেশ্তারা ফজর ও আসরের সময় পালা পরিবর্তন করেন। এ জন্য এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতে যে ফেরেশতারা বান্দার সাথে থাকেন, তাঁরা ফজরের

www.pathagar.com

নামাযের সময় চলেন যান এবং আরেক ফেরেশ্তা বান্দার কাছে আসেন। বান্দা যদি নামাযে থাকে, তাহলে যে ফেরেশ্তা চলে গেলেন তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালাকে জানান, বান্দাকে নামায আদায়রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যিনি এলেন, তিনিও আল্লাহ তা'য়ালাকে জানান, বান্দাকে নামায আদায়রত অবস্থায় পেয়েছি। এভাবে আসরের সময়ও ফেরেশ্তাদের পালা পরিবর্তন হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত বলে স্বীকৃতি দাও না? আমি তো ঐ সত্তার কাছে বিশ্বস্ত যিনি আকাশের ওপর রয়েছেন। সকাল ও সন্ধ্যায় আমার কাছে আকাশের সংবাদ এসে থাকে।' (বোখারী ও মুসলিম)

তাঁর জ্ঞান সৃষ্টি জগতকে বেষ্টন করে রেখেছে

তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান এ কথার অর্থ হলো– আল্লাহ্ তা'য়ালার ইলম গোটা সৃষ্টি জগতকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাঁর ইলমের ভেতরে রয়েছে সব। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ তা'য়ালা নিজের জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (সূরা তালাক-১২)

অর্থাৎ মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের বাইরে যা কিছু রয়েছে, এর মধ্যে অণু-পরমাণু বা তার থেকেও অতিক্ষুদ্র কোনো বিষয় মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের জগতে বিরাজমান, ক্ষুদ্রতম কোনো বিষয়ও তাঁর জানার বাইরে নেই। অনুরূপভাবে তাঁর রহমতও সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ-

আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ-১৫৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقِ كَتَبَ فِى كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَه فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ-

যখন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর আরশের ওপরে একটি কিতাবে লিখেছেন, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার গযবের ওপর বিজয়ী হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম বিষয়ও তাঁর কাছে গোপন নেই

সৃষ্টিসমূহের ক্ষুদ্রতম কোনো বিষয়ও আল্লাহ তা'য়ালার কাছে গোপন নেই, তিনি সমস্ত কিছু জানেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ
هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ–

বস্তুত কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই, আকাশেও নয় এবং যমীনেও নয়। তিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করে থাকেন। (সূরা ইমরাণ-৫-৬)

মহাকাশের প্রত্যেকটি স্তরে প্রত্যেক মুহূর্তে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, এই পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে তিনি সজাগ রয়েছেন এবং যা কিছুই ঘটছে, তা তাঁরই নির্দেশে ঘটছে। সৌর ঝড়, সূর্যের বুকে মহা প্রলয়, প্রত্যেকটি ছায়াপথের চলমান গতি, একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটে যেন কোনো বিশৃংখলার সৃষ্টি না হয়, এসব কিছু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ ও সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি যেন পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, এসব কিছুই একমাত্র তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

যমীনের অতল তলদেশে মৃত্তিকা গর্ভের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত লাভা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আলোড়িত হচ্ছে, সেই লাভা হঠাৎ উদগিরণ হয়ে পৃথিবীর সমস্ত জীবের জন্য যেন ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়– এ ব্যাপারেও তিনি সজাগ রয়েছেন। আগ্নেয়গিরি থেকে ক্ষতির গ্যাস নির্গত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী মুহূর্তে যেন মৃত্যু মুখে পতিত না হয়, এ বিষয়টিও তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। সমস্ত সাগর মহাসাগরের পানি একই মুহূর্তে জলোচ্ছাসের সৃষ্টি করে পৃথিবীর যমীনকে তলিয়ে দিতে না পারে, এসব যাবতীয় বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

মায়ের গর্ভে যেখানে কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, সেখানে কার কি আকৃতি হবে, কার হাতের আঙ্গুল দশটির স্থানে বারটি হবে, কার এক পা ছোট আরেক পা বড় হবে, কে কুৎসিত দর্শন হবে আর কে সুশ্রী হবে, কে মূক-বধির হবে আর কে

www.pathagar.com

বাক ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হবে এসব কিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। অর্থাৎ সবর্ত্র তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে এভাবে তাঁর কাছে দোয়া করতে শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ–وَمَا يَخْفى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ–

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও প্রকাশ করি। আকাশ ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। (সূরা ইবরাহীম-৩৮)

দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সবকিছুই তাঁর আয়ত্বে

পরিদৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যা কিছু রয়েছে, তার সবকিছুই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার আয়ত্বে রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْو هُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ–

তারা কি জানতো না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন। (সূরা তওবা-৭৮)

অদৃশ্য জগতে কোথায় কি পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ও জীব জগতের কি অবস্থা হবে, এই বিষয় জানার কোনো মাধ্যম মানুষের কাছে নেই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে এসব বিষয় গোপন নেই এবং তিনি তাঁর মহাশক্তিবলে এসব পরিবর্তন ঘটান এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি তিনি স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ এসব কিছুর ওপরে তাঁর বিধান কার্যকর রয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাগাবুন-১৮)

মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখন কি চিন্তা-পরিকল্পনা করে, মনের গহীনে কখন কোন্ মুহূর্তে কি কল্পনা ও আশার উদ্রেক হয়, তা জানার মতো কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের

মনের জগৎ তথা চিন্তার জগৎ অজ্ঞাত নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ–

তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (সূরা নাম্‌ল-৭৪)

সৃষ্টি কাজে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কারো বিন্দুমাত্র অংশ ছিল না। সুতরাং মানুষের দেহ একজন সৃষ্টি করলো আর আরেকজন তার চিন্তার জগৎ বা মনের জগৎ সৃষ্টি করলো, বিষয়টি এমন নয়। মানুষের দেহ ও মন-মস্তিষ্ক তথা চিন্তার জগৎ সেই একক সত্তাই সৃষ্টি করেছেন– যাঁর নাম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ–

বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কি তা সম্যক অবগত নন? (সূরা আনকাবুত-১০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দার কত কাছে?

আল্লাহ্ তা'য়ালার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি মানুষের মনের কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবগত রয়েছেন এবং তাঁর ক্ষমতা মানুষের সমস্ত সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ–وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ–

আর আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার কাছে তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।(সূরা কাফ্-১৬)

মানুষে একা একা নীরবে নির্জনে মনে মনে যে চিন্তা-কল্পনা করে, সেটা যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয়, তেমনি দুই জন মানুষ যখন কোথাও নির্জনে গোপন সলাপরামর্শ করে, সেটাই আল্লাহর কাছে অজানা থাকে না। সর্বত্র আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা বিরাজ করছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، مَا يَكُوْنُ

مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ–

তুমি কি কখনো এটা অনুধাবন করো না যে, আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'য়ালা তা সবই জানেন, কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলাপরামর্শ হয় এবং সেখানে 'চতুর্থ' হিসেবে আল্লাহ্ তা'য়ালা উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচজনের মধ্যে কোনো গোপন পরামর্শ হয় না– যেখানে 'ষষ্ঠ' হিসেবে তিনি থাকেন না, এ সলাপরামর্শকারীদের সংখ্যা তার চাইতে কম হোক বা বেশী, তারা যেখানেই থাক না কোনো, আল্লাহ্ তা'য়ালা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন, অতপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের সবাইকে বলে দিবেন তারা কি কাজ করে এসেছে, আল্লাহ তা'য়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন। (সূরা মুজাদালা-৭)

পৃথিবীর সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত– এই পৃথিবীর বুকে কোথায় কত সংখ্যক কি আকৃতির মানুষ বাস করেছে এবং কোন্ অঞ্চলে কি আকৃতির কত সংখ্য প্রাণী বাস করেছে, তার সঠিক পরিসংখান পরিপূর্ণভাবে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গবেষণার মাধ্যমে কিছুটা অনুমান করতে পারে মাত্র। অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাণীসমূহের ফসিল ও মানুষের কঙ্কাল যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তার ওপর গবেষণা করে একটি অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্তে মানুষ পৌঁছতে পারে। পৃথিবীর সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সৃষ্টি জগতে যেখানে যে পরিবর্তন ঘটছে, পাহাড় পবর্ত, নদী-সাগর-মহাসাগর, আগ্নেয়গিরি, মৃত্তিকার তলদেশে তথা সমগ্র সৃষ্টি জগৎ জুড়ে যে পরিবর্তন ঘটছে, তার সঠিক কারণ নির্ণয় এবং সঠিক সময় ও কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, তার যথাযথ তথ্য জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে

শুধুতাই নয়– বর্তমান সময় থেকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোথায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে, কোন্ আকার-আকৃতির ও চিন্তা-চেতনা এবং রুচির অধিকারী মানুষ পৃথিবীতে আগামীতে আগমন করবে, এর সঠিক তথ্য মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ–

তোমাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। (সূরা হিজ্‌র-২৪)

তাঁর অজ্ঞাতে একটি পাতাও পড়ে না

কোথায় বৃষ্টি হবে, পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে খরা হবে, কখন কোন্ নদী বা সাগরে জলোচ্ছাস ঘটবে, আকাশের কোন্ কোণে মেঘমালা পুঞ্জিভূত হয়ে প্রচন্ড ঝড়ের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীর কোন্ স্থানে মৃত্তিকার তলদেশে কি আলোড়ন হচ্ছে এবং তা ভূমিকম্পের আকারে কখন কিভাবে আঘাত করবে, এসব বিষয় মানুষের জানা নেই। তারা শুধু অনুমান করতে পারে এবং তাদের অনুমান প্রচার মাধ্যমে প্রচার করতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারে না। মাটির ওপরে যে দুর্বা ঘাস, সেই ঘাসের ওপরে ওপর থেকে গাছের পাতা পড়ার কারণে যে শব্দ হয় এবং দুর্বা ঘাসের ওপর থেকে ঐ পাতা যখন মাটিতে পড়ার সময় যে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটাও মহান আল্লাহর অগোচরে থাকে না। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গভীর অন্ধকারে কোথায় কখন কোন্ উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং কোন্ বীজ বিনষ্ট হবে, মহান আল্লাহর জ্ঞানে সবকিছু রয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ–وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ–

অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কেনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা আনআম-৫৯)

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ–

আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অণু-পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়। (সূরা ইউনুস-৬১)

www.pathagar.com

তাঁর সৃষ্টি কাজে কেউ অংশীদার ছিল না

সৃষ্টি কাজে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কেউ অংশীদার ছিলো না। তিনি একাই আপন ক্ষমতাবলে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং গোলামী করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার। যেসব মানুষ আইন-কানুন, মতবাদ-মতাদর্শ তৈরী করে অন্য মানুষকে তা মেনে চলার জন্য আহ্বান জানায়, তারা হলো পথভ্রষ্টকারী। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি কাজে এদের অংশ গ্রহণ দূরে থাক, এরা নিজেরাই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তাঁরই আইন মেনে চলতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَا اَشْهَدْ تُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَا الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا–

আমি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করার সময় তাদেরকে ডেকে পাঠাইনি। আর না আমার সৃষ্টি কাজে তাদেরকে শরীক করেছিলাম। আর পথভ্রষ্টকারীদের নিজের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করা আমার নীতি নয়। (সূরা কাহ্ফ-৫১)

আল্লাহর সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَه مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ–

তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দ্রকে দিয়েছেন দীপ্তি। এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মন্যিল সঠিকভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা এর সাহায্যে বছর ও তারিখসমূহের হিসাব জেনে নাও। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই সব কিছু (অনর্থক নয়, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নির্দশনসমূহ একটি একটি করে সুস্পষ্টরূপে পেশ করছেন– তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। (সূরা ইউনুস-৫)

www.pathagar.com

নিষ্প্রাণের মাঝে তিনিই প্রাণ দানকারী

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ-

তিনি জীবন্তকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে বের করে আনেন। আর যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও মৃত অবস্থা থেকে বের করে আনা হবে। (সূরা রূম-১৯)

তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخْتَارُ-

তোমাদের রব যা কিছু ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচিত করে নেন। (সূরা কাসাস-৬৮)

وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ-اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ-تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ-اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً-

তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইন-বিধানের অধীন বন্দী। সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই। অপরিসীম বরকতময় আল্লাহ সমগ্র জাহানের মালিক ও প্রতিপালক। তোমরা আল্লাহকে ডাকো, মিনতি পূর্ণ কণ্ঠে ও চুপে চুপে। (সূরা আ'রাফ-৫৪-৫৫)

রাত ও দিনকে তিনি যদি দীর্ঘ করে দেন

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ، اَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ، قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ، اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ-

www.pathagar.com

হে নবী! বলে দিন! তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যদি রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপরে দীর্ঘ করে দেন তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন্ ইলাহ্ তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারবে? তোমরা কি শুনতে পাওনা? হে নবী! তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ্ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য দিন বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন্ ইলাহ্ আছে যে, রাত এনে দিতে পারবে– যেন তোমরা শান্তি লাভ করতে পারো? তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখো না? (সূরা কাসাস-৭১-৭২)

সমস্ত কিছুর ভান্ডার আল্লাহ্রই হাতে

وَ اِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُه، وَمَانُنَزِّلُـهٗ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ، وَاَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ، وَمَا اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ، وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُوْنَ، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ، اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ–

এমন কোনো জিনিস নেই যার ভান্ডার আমার কাছে নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি। বৃষ্টিবাহী বায়ূ আমিই পাঠাই। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভান্ডার তোমাদের হাতে নেই। জীবন ও মৃত্যু আমিই দান করি এবং আমিই হবো সবার উত্তরাধিকারী। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেকে আমি দেখে রেখেছি এবং পরবর্তী আগমনকারীরাও আমার দৃষ্টি সমক্ষে আছে। অবশ্যি তোমার রব তাদের সবাইকে একত্র করবেন। তিনি জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন। (সূরা আল হিজ্র-২১-২৫)

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا، وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا–

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং অন্যটি লোনা ও খার। আর দুয়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের একাকার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে। আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ তৈরী করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বশুরালয়ের দুটো পৃথক ধারা চালিয়েছেন। তোমার রব বড়ই শক্তি সম্পন্ন। (সূরা আল ফুরকান-৫৩-৫৪)

তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا– اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا–

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি এই ফুরকান তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন, যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়। যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাকদীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। (সূরা আল ফুরকান-১-২)

তিনিই সৃষ্টিতে ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন

মহাবিশ্বের কোনো একটি জিনিসও বিশৃংখল ও অপরিমিতভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি তাকদির বা একটি সামগ্রিক পরিমাণ নির্ধারণ রয়েছে। এই পরিমাণ অনুযায়ীই একটি বিশেষ সময় তা অস্তিত্বশীল হয় এবং একটি বিশেষ রূপ ও আকার-আকৃতি ধারণ করে। একটি বিশেষ পরিমাণ পর্যন্ত তা প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে এবং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে এবং একটি বিশেষ সময়ে তা শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ–

আমি প্রত্যেকটি জিনিসই একটি পরিমাপসহ সৃষ্টি করেছি। (সূরা কামার-৪৯)

তিনি রব, কোন কিছুই ভারসাম্যহীন করে সৃষ্টি করেননি। যা সৃষ্টি করেছেন, তার ভেতরে ভারসাম্য রক্ষা করেই সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে মানব সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মানব সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে মহান রব্ব এমন

www.pathagar.com

নিয়ম করে দিয়েছেন যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আধিপত্য ও শক্তি সামর্থ লাভের সুযোগ দেন। কিন্তু কোন দল যখন সেই সীমা লংঘন করতে শুরু করে, তখন অপর এক মানব গোষ্ঠীকে দিয়ে তার শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। পৃথিবীতে যদি একটি দল ও একটি জাতির স্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যবস্থা করা হতো এবং তার স্বৈরাচারী নীতি আর জুলুমমূলক ব্যবস্থা অমর অক্ষয় হয়ে থাকতো, তাহলে গোটা পৃথিবীতে এক চরম দুর্যোগ, ধ্বংস আর বিপর্যয় দেখা দিত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ-لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের মাধ্যমে দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর নিয়ম শৃঙ্খলা সব বিনষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু পৃথিবীবাসীদের প্রতি বড়ই করুণাময়। (সূরা বাকারা-২৫১)

এভাবে মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুতেই ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীর বুকে কোন জালিমই স্থায়ীভাবে তার জুলুমের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। দম্ভ, অহঙ্কার স্থায়ী হয়নি। প্রাণীজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেখা যায়, রাব্বুল আলামীন তাদের ভেতরে কি সুন্দর করে ভারসাম্য রক্ষা করছেন।

সামুদ্রিক কচ্ছপগুলোর যখন ডিম দেয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন তারা রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে উঠে আসে, দিনের আলোয় আসে না। দিনের আলোয় এসে ডিম দিয়ে গেলে তা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর চোখে পড়বে। তার ডিম ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, তারপর পা দিয়ে তারা বালির ভেতরে গর্ত করে। গর্ত করা শেষ হলেই একের পর এক ডিম দিতে থাকে। মুরগী, হাঁস বা অন্যান্য পাখি যে সংখ্যক ডিম দিবে, তা প্রতিদিন একটি করে দিয়ে থাকে। আর কচ্ছপ যে ডিমগুলো দিবে তা একই সময়ে একটির পর একটি করে দিতে থাকে। যতগুলো ডিম দেয়া প্রয়োজন, তা পনের বা বিশ মিনিটের মধ্যে দিয়ে দেয়। তারপর ডিমে পরিপূর্ণ গর্ত পায়ের সাহায্যে বালি দিয়ে ভরে দেয়।

ডিমের ওপরে বসে তা দিতে হয় না। মাটি বা বালির অভ্যন্তরীণ তাপেই ডিমগুলো নির্দিষ্ট দিন পরে ফোটে। যেখানে মাটি বা বালির ঘনত্ব বেশী সেখানেও তারা ডিম দেয় না। কারণ বাচ্চাগুলো তা দীর্ণ করে পৃথিবীতে আসতে পারবে না। সমুদ্রের পানি থেকে মাত্র দশ অথবা বিশ ফুট দূরে কাছিম এভাবে ডিম দেয়। অনেক দূর থেকে আসতে আসতে বাচ্চারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

www.pathagar.com

স্থলে কচ্ছপ দ্রুত গতিতে চলতে পারে না। এ জন্য তারা পানির খুব কাছেই ডিম দেয় যেন বাচ্চা বের হয়েই দ্রুত পানির ভেতরে যেতে পারে। সদ্যজাত বাচ্চাগুলো ডিম থেকে বেরিয়েই পানির দিকে ছুটতে থাকে। ওদের গতি পানির বিপরীত দিকে কখনোই হয়না। এই সাবধানতা অবলম্বন করে ডিমগুলো রক্ষা করতে হবে, পানির কাছাকাছি ডিম দিতে হবে, বাচ্চাগুলোকে পানির দিকে ছুটতে হবে, কচ্ছপের ভেতরে যিনি এই চেতনা দিয়েছেন, তিনিই হলেন রব।

কচ্ছপ ডিম দিয়ে চলে যায়, ওদের ডিমের অনুসন্ধানে চলে আসে শিয়াল, বেজি এবং অন্যান্য প্রাণী। এরা সন্ধান পেলেই ডিমগুলো খেয়ে নেয়। যেগুলোর সন্ধান পায় না সেগুলোর বাচ্চা ফোটে। এই বাচ্চাগুলো ডিম থেকে বেরিয়ে পানির দিকে যাবার পথে নানা ধরনের প্রাণী এদেরকে খেয়ে ফেলে। পানির ভেতরে বড় বড় মাছ এই বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলে। আল্লাহ্ তা'য়ালা যদি সমস্ত কচ্ছপের ডিম হেফাজত করে বাচ্চা ফুটিয়ে বাচ্চাগুলোকে বাঁচতে দিতেন, তাহলে গোটা পৃথিবীই কচ্ছপে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ، وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ–

আমারই কাছে রয়েছে প্রতিটি বস্তুর অফুরন্ত ভান্ডার এবং আমিই তাদের সরবরাহ্ করি এক পরিজ্ঞাত পরিমাপে। (সূরা আল হিজর-২১)

কুমিরের ডিমেরও এই একই অবস্থা। কুমির স্থলে ডিম দিয়ে কোন কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর পাহারা দিতে থাকে। শিয়াল, বেজি এবং অন্যান্য প্রাণী কুমিরকে প্রহরা দিতে দেখেই বুঝে নেয়, ওখানে ওর ডিম আছে। ওরা কুমিরের গতি-বিধির ওপরে নজর রাখে। ডিমের কাছ থেকে একটু দূরে গেলেই ওরা এসে ডিম খেয়ে নেয়। তারপরেও যে বাচ্চাগুলো জন্ম নেয়, সেগুলোকে ধরে মাছসহ অন্যান্য প্রাণী খেয়ে নেয়। সমস্ত কুমির, সাপ, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি যত বাচ্চা দেয়, তা যদি বাঁচতে পারতো, তাহলে এই পৃথিবী আর মানুষ বসবাসের উপযোগী থাকতো না। এদের সৃষ্টির ভেতরে রাব্বুল আলামীন ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى–الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى–

(হে নবী!) আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টিকুলকে তৈরী করেছেন, তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (সূরা আ'লা–১-২)

www.pathagar.com

পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদেরও এই অবস্থা। আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন একটি উদ্ভিদকেও মাত্রার অতিরিক্ত বিস্তৃতি ঘটতে দেন না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ–

আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি পরিমাপ। (সূরা রা'দ-৮)

বিশেষ বিশেষ ঋতুতে অসংখ্য উদ্ভিদ জন্ম নেয়। আবার এমন ঋতু পৃথিবীতে আগমন করে, কতকগুলো উদ্ভিদ ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। এভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। বান্দাকে তিনিই প্রতিপালন করেন, বান্দার কল্যাণে এসব ব্যবস্থা তিনিই করেন। অতএব একমাত্র তাঁরই প্রশংসা ও দাসত্ব করতে হবে।

তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত

মাটি বা পানির অতল তলদেশে একটি পাথরের মধ্যে এমন একটি প্রাণী বাস করে, যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত মানুষের চোখে পড়বে না। সেই প্রাণী সম্পর্কেও মহান আল্লাহ্ অমনোযোগী নন। ঐ প্রাণীর যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا كُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ–

আমি আমার সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে অমনোযোগী নই।

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ–

তোমার রব পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিসমূহকে বেশী জানেন। (সূরা বনী ইসরাঈল)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ–

তুমি কি দেখ না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে! প্রত্যেকেই জানে তার নামাযের ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা কিছু করে আল্লাহ্ তা জানেন। (সূরা নূর-৪১)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا-

যমীনে বিচরণশীল কোনো জীব এমন নেই, যার রিয্‌ক দানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত নয় এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে আর কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। (সূরা হূদ-৬)

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ-

তবে কি যিনি প্রতিটি প্রাণীরই উপার্জনের ওপর দৃষ্টি রাখেন, (তাঁর মোকাবেলায় এই ধরনের দুঃসাহস করা হচ্ছে যে,) লোকজন তাঁর কিছু শরীক নির্দিষ্ট করে রেখেছে? (সূরা আর রা'দ-৩৩)

اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ-

এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রতিটি জিনিস দেখছেন? (সূরা হা-মিম আস্ সিজদাহ্-৫৩)

لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا-

যা কিছু আমাদের সামনে ও যা কিছু পেছনে এবং যা কিছু এর মাঝখানে আছে তার প্রত্যেকটি জিনিসের তিনিই মালিক এবং তোমার রব ভুলে যান না। (সূরা মারয়াম- ৬৪)

وَلاَ يَضِلُّ رَبِّيْ وَلاَ يَنْسٰى-

আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না। (সূরা ত্বা-হা-৫২)

আল্লাহ্ শব্দ কিভাবে এলো

মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক মানুষই আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। ফেরাউন, নমরুদ এবং এদের মতো আরো যারা ছিল, তারা কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল না। তারা কখনো এ কথা বলেনি যে, 'এই সমগ্র বিশ্ব আমি সৃষ্টি করেছি'। বরং তারা বলেছে, কোরআনের ভাষায়–

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى-

আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব। আমার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তারা দাবী করেছে, 'এই বিশাল ভূখন্ডের শাসক হিসাবে দেশের জনগণের ওপরে আইন ও বিধান চলবে আমার। এখানে অন্য কারো আইন-কানুন চলবে না। জনগণ অন্য কারো আইন অনুসরণ করতে পারে না। আইন চলবে একমাত্র আমার এবং আমাকেই ইলাহ হিসাবে পূর্জা-অর্চনা করতে হবে। মাথানত করতে হবে একমাত্র আমার কাছে।' এভাবে দেশের জনগোষ্ঠী আল্লাহকেও বিশ্বাস করেছে, সেই সাথে তারা আল্লাহর অংশীদার বানিয়েছে। পবিত্র কোরআনে দেখা যায় আরবের যারা মূর্তিপূজক ছিল তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। মুখে তারা আল্লাহর নাম বেশ শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করতো। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কাছে পৌছানোর মাধ্যম হলো এসব মূর্তি।

পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে শিখালো, আল্লাহ্ এমন এক অদ্বিতীয় সত্তার নাম, যিনি গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই তাঁরই সৃষ্টি। সমস্ত সৃষ্টির সব ধরনের প্রয়োজন যিনি পূরণ করেন তিনিই হলেন মহান আল্লাহ। আল্লাহ শব্দের বিকল্প কোন শব্দ নেই। তিনিই মানব জাতির সব ধরনের বিধান দাতা। প্রাচীন সিমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি শাখাতেই সামান্য রূপান্তর ভেদে 'আল্লাহ' কথাটি এক, অদ্বিতীয়, অনাদী, অনন্ত উপাস্য সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভাষাবিদগণ অনুমান করেন যে, মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই তওহীদবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্ব প্রতিপালকের একক সত্তা বোঝানোর জন্য 'আল্লাহ' শব্দটির প্রচলন রয়েছে। যেমন প্রাচীন কালদানীয় ও সুরইয়ানী ভাষায় আল্লাহ শব্দটি 'আলাহিয়া,' প্রাচীন হিব্রুভাষায় 'উলুহ' এবং আরবী ভাষায় 'ইলাহ' রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিবর্তিত আরবী ভাষায় 'ইলাহ' শব্দের সাথে আরবী আল অব্যয় যুক্ত হয়ে 'আল-ইলাহ' বা আল্লাহ্ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেও আরবদের মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দটিই মহান পরওয়ারদেগারের একক শব্দরূপে ব্যবহৃত হতো। আল্লাহ শব্দটির কোন লিঙ্গান্তর হয় না। এর কোন দ্বিবচন বা বহুবচনও হয় না। এ প্রাচীন শব্দটিই পরম উপাস্যের সত্তা বোঝানোর জন্য পবিত্র কোরআনে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী শরীআতে আল্লাহ নামের কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহকে তাঁর যে কোন গুণবাচক নামেও ডাকা যায়। তবে আল্লাহ্ ও আল্লাহর গুণবাচক নামের বিকল্প যেমন গড, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান ইত্যাদি কোন নামে ডাকা স্পষ্ট হারাম। কারণ এসব শব্দের মধ্য দিয়ে তওহীদ বিশ্বাসের অনুরূপভাব প্রকাশ পায় না। কারণ ঐ সমস্ত শব্দের লিঙ্গান্তর করা যায় এবং স্ব স্ব ভাষার ব্যকরণ শুদ্ধভাবে

www.pathagar.com

করা যায়। ইংরেজী গড শব্দের ইংরেজী বানান God. এখানে ইংরেজী বর্ণমালার তিনটি অক্ষর রয়েছে। এই শব্দটি যদি উল্টিয়ে উচ্চারণ করা হয় তাহলে তা একটি চতুষ্পদ জন্তুর নাম প্রকাশ করবে। আল্লাহ্ কে এবং তাঁর পরিচয় স্বয়ং তিনিই এভাবে দিয়েছেন–

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ–

হে নবী! আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন। তাকে কেউ জন্ম দেয়নি তিনিও কাউকে জন্ম দেননি, তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় আর কেউ নেই। (সূরা ইখলাস)

আর ভগবানের সংজ্ঞা শ্রী মদ্ভাগবত গীতা দিয়েছে এভাবে, অর্জুনের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন–

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভুত্থনমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
(গীতা, চতুর্থোহধ্যায় ঃ জ্ঞানযোগ–৭–৮)

অনুবাদ ঃ হে অর্জ্জুন! যে যে সময়ে ধর্মের পতন আর পাপের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি জন্ম লইয়া থাকি। এইভাবে পাপীদের বিনাশ করিতে (শাস্তি দিতে) আর সৎ লোকদের বাঁচাইতে এবং ধর্ম্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে যুগে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করি।

হিন্দু সম্প্রদায় শ্রী কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান নামে অভিহিত করেন। সুতরাং ভগবান প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভগবান পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভগবান একবার চার অংশে রাজা দসরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন–এই চার নাম ধারণ করেছিল। ভগবান তার ভক্ত প্রহল্লাদের সামনে পশুরাজ সিংহের আকৃতি ধারণ করে নিজেকে প্রকাশ করেছিল। তাহলে দেখা গেল ভগবান এই পৃথিবীতে মাতৃগর্ভে পিতার ঔরসে প্রয়োজনে জন্মগ্রহণ করে। যে কোন পশুর রূপও ধারণ করতে পারে। সুতরাং, স্রষ্টাকে নামের পরিচয়ে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মানুষ

www.pathagar.com

এমন সব শব্দ আবিষ্কার করেছে যে, এসব শব্দের যে কি অর্থ এবং শব্দকে খন্ডিত করলে যে কি অর্থ প্রকাশ করে, সেদিকে লক্ষ্য না রেখেই মানুষ তার সীমিত জ্ঞান প্রয়োগ করে কল্পিত স্রষ্টার একটি নাম রেখেছে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হলো ইসলাম। ইসলাম আল্লাহ্ নামের যে পরিচয় দিয়েছে, তার কোন বিকল্প নেই।

আরবের ছাফা পর্বতের অনেক শিলালিপিতে আরবী আল্লাহ শব্দটি সেই যুগ থেকেই লিখা ছিল এবং এখনো আছে। উত্তর আরবের জনগোষ্ঠী এবং নাবাতী জনগোষ্ঠী নামের একটি অংশ আল্লাহ্ নাম ব্যবহার করতো। নাবাতীদের কাছে আল্লাহ নামটা পৃথক কোন উপাস্য হিসাবে বিবেচিত না হলেও তাদের শিলালিপিতে দেবতাদের নামের সাথে আল্লাহ নাম সংযুক্ত দেখা যায়। পক্ষান্তরে সেল, মাবগলিউথসহ্ অনেক ইসলামবৈরী পাশ্চাত্য গবেষক 'আল্লাহ্' শব্দটি জাহিলিয়াত যুগের 'আল লাত' নামক দেবমূর্তির নামের রূপান্তর বলে যে কষ্ট কল্পনা করেছে, আরবী শব্দ গঠন পদ্ধতির বিচারে এটা নিতান্তই হাস্যস্পদ অপচেষ্টা মাত্র। 'আল্লাহ্' শব্দটি এমনই এক শব্দ যে, এই শব্দের কোন অনুবাদ হয় না। 'আল্লাহ্' শব্দের অনুবাদ কেউ যদি 'স্রষ্টা' লিখে তাহলে তা হবে এক মারাত্মক ভুল। কারণ, স্রষ্টা হিসাবে তো মহান আল্লাহর 'খালিক' নামক একটি গুণবাচক নাম রয়েছে। শুধু একটি নয়, আল্লাহর অনেকগুলো সর্বোত্তম গুণবাচক নাম রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا، وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهٖ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

আল্লাহ্ সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী, তাঁকে সেই সুন্দর নামেই ডাকো। সেই লোকদের কথার কোন মূল্য দিও না, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। (সূরা আ'রাফ, ১৮০)

আল্লাহর গুণবাচক নাম রহমান, এ নামেও তাঁকে ডাকে যায়। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ–اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى–

হে নবী! এদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ অথবা রহমান যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সব ভালো নামই নির্দিষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল–১১০)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর গুণবাচক নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গুণবাচক নাম সম্পর্কে স্বয়ং তিনিই বলেছেন-

اَللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلَّاهُوَ-لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-

তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ। (সূরা ত্ব-হা)

আল্লাহর এসব গুণবাচক নামও অতীব সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এসব নামেরও তসবীহ্ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى-

(হে নবী!) আপনার মহান শ্রেষ্ঠ রব-এর নামের তাসবীহ্ করো। (সূরা আ'লা–১)

আল্লাহ শব্দের অর্থ কোনক্রমেই 'স্রষ্টা' হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে না এবং এ নামের কোন অনুবাদও হতে পারে না। আল্লাহ নামের কোন বিকল্প হতে নেই। স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ্ তা'য়ালার একটি নাম রয়েছে। পবিত্র কোরআন বলছে–

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى،

তিনিই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও তার বাস্তবায়নকারী এবং তা অনুসারে আকার-আকৃতি প্রদানকারী, তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। (সূরা হাশর-২৪)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন **'আল্লাহ্'** নাম দিয়েই তিনি তাঁর পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন–

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ-لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ
لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ-

আল্লাহ্ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি সদাজাগ্রত এবং তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর সার্বভৌমত্ব তাঁর। (সূরা বাকারা-২৫৫)

আল্লাহ্ হলেন তিনি, যিনি একমাত্র দাসত্ব লাভের অধিকারী এবং অসীম দয়ালু; তাঁর কাছে গোপন ও প্রকাশ্য বলে কোন কিছু নেই। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

www.pathagar.com

هُوَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ،

তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুরই জ্ঞাতা, তিনিই রহমান ও রাহীম। (সূরা হাশর-২২)

আল্লাহ মহাপবিত্র এবং তিনি সকল কিছুর মালিক, সকল কিছুরই বাদশাহ, রাজাধিরাজ। পবিত্র কোরআন তাঁর পরিচয় এভাবে পেশ করছে-

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ-

তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি মালিক-বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র। সম্পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। (সূরা হাশর- ২৩)

সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি হলেন আল্লাহ। তাঁর নাম বিকৃত করার সামান্যতম অবকাশ নেই। আল্লাহ নামের প্রতিটি অক্ষর দিয়েই তাঁর পরিচয় কোরআন উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ নাম লিখতে প্রথমে আরবি অক্ষর আলিফ-এর প্রয়োজন হয়। এই আলিফ অক্ষর বাদ দিলেও আল্লাহর নাম বিকৃত করা যাবে না। কোরআন বলছে-

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ-

আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছুই রয়েছে, তা সবই আল্লাহর। তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো অথবা না-ই করো আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন। (সূরা বাকারা-২৮৪)

পবিত্র কোরআন আল্লাহ শব্দের **'আলিফ'** ব্যতিতই এ ধরনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় প্রকাশ করেছে, তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা তুলে ধরেছে। উল্লেখিত আয়াতের আল্লাহ শব্দ থেকে আলিফ উহ্য রাখার কারণে আল্লাহ শব্দের সামান্যতম বিকৃতি ঘটেনি। আল্লাহ শব্দ থেকে আলিফ উহ্য রাখলে শব্দ হলো **'লিল্লাহ'** অর্থাৎ আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর। এই লিল্লাহ শব্দ থেকেও যদি একটি **'লাম'** অক্ষর বাদ দেয়া হয় তাহলে অবশিষ্ট থাকে **'লাহু'**। এই **লাহু** শব্দ দিয়েও

পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহ্র পরিচয় তুলে ধরেছে এভাবে–

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ-اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ-

আকাশ ও যমীনের ভান্ডারসমূহের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ, যাকে ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সব কিছু জানেন। (সূরা আশ শূরা–১২)

এভাবে আল্লাহ্ শব্দ থেকে আলিফ অক্ষরটি বাদ দেয়া হলো, তারপর দুটো লাম অক্ষরের প্রথমটি বাদ দেয়া হলো। এবারে দ্বিতীয় **লাম** অক্ষরটি বাদ দেয়ার পরে থাকে শুধুমাত্র **'হা'** অক্ষরটি। এই 'হা' অক্ষরের সাথে পেশ যুক্ত করে **'হু'** আকারে উচ্চারিত হয়ে মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে। পবিত্র কোরআন এই 'হু' শব্দ দিয়ে আল্লাহর পরিচয় এভাবে পেশ করছে–

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ، وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ، ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ-

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশ-অধিপতি, মহান শ্রেষ্ঠতর। নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্নকারী। (সূরা বুরুজ)

সুতরাং, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের **'আল্লাহ'** নামের কোনভাবেই বিকৃতি ঘটানো সম্ভব নয়। **'আল্লাহ'** শব্দটি আরবী অক্ষরে লিখতে যে কয়টি অক্ষরের প্রয়োজন, এর যে কোনো একটি অক্ষর ছেড়ে দিলেও তা অবিকৃত থাকে এবং সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। এ নামের সাথে কোন কিছুর তুলনা করা যায় না এবং এ নামের কোন ভাষান্তর করাও যায় না।

www.pathagar.com

জীবন্ত ঈমানের স্বাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জীবন্ত ঈমানের অতুলনীয় স্বাদ

ঈমান যদিও আরবী শব্দ কিন্তু এটি বিভিন্ন ভাষায় সর্বাধিক উচ্চারিত ও ব্যবহৃত একটি শব্দ। অনেকের কাছে ঈমানের অর্থ অজানা থাকলেও শব্দটি তারা প্রায় সঠিক সময়ে ও সঠিক জায়গায় ব্যবহার করে থাকে। ঈমানের শাব্দিক অর্থঃ বিশ্বাস স্থাপন করা, স্বীকৃতি দেয়া এবং সত্যায়ন করা। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ঈমানের অর্থ হচ্ছেঃ অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে তা উচ্চারণের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া এবং স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের দ্বারা একে বাস্তবায়নের জন্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করা।

ঈমান শুধু মুখে উচ্চারণের বিষয় নয় বা শুধু মুখে দাবী করার বিষয়ও নয়। মুসলমানদের জন্য সেই ঈমান প্রয়োজন যে ঈমানের বলে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেননি, তিনি তাঁর সদ্যজাত সন্তান ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে খাদ্য-পানিয় বিহীন জনমানব শূন্য নির্জন মরুপ্রান্তরে রেখে আসতেও সামান্যতম ইতস্তত বোধ করেননি। এমনকি মহান আল্লাহকে খুশী করার জন্যে নিজের কলিজার টুকরা অপূর্ব সুন্দর কিশোর সন্তানের কণ্ঠনালীতে ছুরি চালাতেও তাঁর বুক কেঁপে উঠেনি।

তিনি ঈমানের স্বাদ হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে খুশী করার জন্যে সকল কিছু কোরবানী দেয়ার জন্যে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তেই প্রস্তুত ছিলেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) জীবন্ত ঈমানের পরশ লাভ করেছিলেন বলেই প্রিয় সন্তান ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সামান্যতম অভিযোগ করেননি। বরং সকল দিক দিয়েই তিনি ধৈর্য্যের পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

হযরত ই্যাকুব (আঃ) এর প্রাণাধিক সন্তান হযরত ইউসুফ (আঃ) সার্বক্ষণিকভাবে জীবন্ত ঈমানের বর্মে আচ্ছাদিত ছিলেন বলেই যুবক বয়সে অদম্য যৌবনকে পদদলিত করে কামনা তাড়িত পরমা সুন্দরী নারীর কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার তুলনায় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠকেই সর্বাধিক প্রিয় মনে করে দীর্ঘ কারাজীবনকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন।

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী কলিজার টুকরা সন্তানকে পানির উত্তাল তরঙ্গমালায় নিমজ্জিত হয়ে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও হযরত নূহ্ (আঃ) মহান আল্লাহর ভয়ে নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন শুধুমাত্র জীবন্ত ঈমানের কারণেই।

হযরত ইউনুস (আঃ) রাতের ঘন কালো অন্ধকারে অথৈ জলধীর অতল তলদেশে বিশাল আকৃতির মাছের উদরে উদরিস্থ অবস্থায় ত্রিবিধ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েও তিনি নিরাশ হননি, একাগ্রচিত্তে কেবলই মহান আল্লাহ তা'য়ালার রহমত কামনা করেছেন। জীবন্ত ঈমানের অনির্বাণ শিখায় তিনি আলোকিত ছিলেন বলেই জীবনের সেই চরম মুহূর্তেও হাতাশা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

হযরত আইয়ুব (আঃ) দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ কঠিন পীড়ায় অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, কিন্তু অধৈর্য্য তাঁর মনে আঁচড় কাটতে পারেনি। জীবন্ত ঈমানের জান্নাতী স্বাদের কাছে তাঁর রোগ যন্ত্রণা বড় হয়ে দেখা দেয়নি বলেই তিনি মহান আল্লাহর কাছে কোনো অভিযোগ করেননি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন্ত ঈমানের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন এবং তাঁর পবিত্র ছায়ায় যে সকল মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও জীবন্ত ঈমানের স্বাদ দেহ-মন দিয়ে অনুভব করেছেন। ফলে সে সকল সাধারণ মানুষ এমন অসাধারণ মানুষের স্তরে উপনীত হয়েছিলেন যে, পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সে সকল মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষের কাছে পরম অনুসরণীয় হয়ে রয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের পরে বর্তমান সময় পর্যন্ত যারাই জীবন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করেছেন, তাঁরা মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জীবনের সকল কিছু ত্যাগ করতেও দ্বিধান্বিত হননি। প্রয়োজনে হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুর রশি কণ্ঠে ধারণ করেছেন।

ঈমানের প্রভাবে ইতিহাসের বিস্ময়কর বিপ্লব

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো, একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন। মানবতা মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলো এবং পৃথিবী তার যাবতীয় উপকরণসহ ধ্বংসের ভীতিপ্রদ ও গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে চলছিলো। রাসূলের আবির্ভাবকালে সারা পৃথিবীর অবস্থা সেই ঘরের অনুরূপ ছিলো, যার ভিত্তি এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের তীব্র আঘাতে ভঙ্গর করে দিয়েছিলো। পৃথিবীর মানুষগুলোর অস্তিত্ব নিজেদের দৃষ্টিতেই নিজেরা যেন ছিলো নগণ্য ও মূল্যহীন। বৃক্ষ, তরু-লতা, প্রস্তরখন্ড, আগুন-পানি ও উর্ধ্ব জগতের গ্রহ-নক্ষত্র এবং তারকারাজিসহ বস্তু মাত্রই উপাস্য হিসাবে মানুষের কাছে পূজিত হচ্ছিলো।

মানুষের চিন্তার জগতে এতটাই স্থবিরতা ও বিশৃংখলা নেমে এসেছিলো যে, দৈনন্দিন জীবনের স্থূল সত্যগুলো অনুধাবন করতেও তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলো এবং তাদের অনুভূতি ভুল পথে চলছিলো। স্থূল ও সহজবোধ্য জ্ঞানও তাদের কাছে সূক্ষ্ম ও অবোধগম্য এবং সূক্ষ্ম ও অবোধ্যগুলোও তাদের কাছে স্থূল ও সহজবোধ্যে পরিণত হয়েছিলো। নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ও তাদের কাছে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত এবং সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ও তাদের কাছে নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। রুচি তাদের এতটাই বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, তিক্ত ও বিস্বাদ জিনিসও সুস্বাদু এবং সুস্বাদু জিনিসও তাদের কাছে তিক্ত ও বিস্বাদ বলে বোধ হচ্ছিলো। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো, ফলে বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্খীদের সাথে শত্রুতা এবং শত্রু ও অকল্যাণকামীদের সাথে ছিলো তাদের গভীর বন্ধুত্ব ও মিত্রতা।

তদানীন্তন পৃথিবীতে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি বস্তুই যেন ভুল আকার-আকৃতিতে ও ভুল স্থানে সজ্জিত ছিলো। সে সমাজে অরণ্যে বসবাসের উপযোগী হিংস্র নেক্ড়ে তুল্য মানুষগুলোকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হয়েছিলো। সে সমাজে দুরাচারী, অপরাধীরা ছিলো সৌভাগ্যবান ও পরিতৃপ্ত আর সদাচারী চরিত্রবান লোকগুলো ছিলো অপাংক্তেয়, দুঃখ কষ্টে জর্জরিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। সদাচরণ এবং সচ্চরিত্রতার চাইতে বড় অপরাধ ও বোকামি আর অসচ্চরিত্র ও অসদাচরণের চাইতে বড় যোগ্যতা ও গুণ সে সমাজে আর কিছুই ছিলো না। গোটা সমাজের আচার-আচরণ ছিলো ধ্বংসাত্মক যা সারা দুনিয়াকেই ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত করেছিলো। শাসক শ্রেণী ও বিত্তবানরা অর্থ-সম্পদকে হাতের ময়লা এবং সাধারণ মানুষগুলোকে নিজেদের ক্রীতদাস মনে করতো। তথাকথিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দগণ সাধারণ মানুষের প্রভুর আসন দখল করেছিলো। তারা সাধারণ লোকদের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করতো এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানবীয় গুণাবলীকে অত্যন্ত নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করা হচ্ছিলো অথবা অপাত্রে ব্যয় করা হচ্ছিলো এবং মানবীয় গুণাবলী থেকে কোনো উপকার গ্রহণ বা যথাস্থানে তা ব্যবহার করা হচ্ছিলো না। বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ব্যবহৃত হচ্ছিলো অন্যায়-অত্যাচারের ক্ষেত্রে। উদারতা ও বদান্যতা ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপব্যয় ও অপচয়ে। আত্মমর্যাদাবোধ ব্যবহৃত হচ্ছিলো অহঙ্কার ও দাম্ভিকতায়। ধীশক্তি ও মেধা ব্যবহৃত হচ্ছিলো প্রতারণা ও অপকৌশলে। জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপরাধের নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে এবং প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির নতুন নতুন উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

তদানীন্তন পৃথিবীতে মানব সম্পদ সুদূর অতীতকাল থেকেই বিনষ্ট হচ্ছিলো। সে সময়ে মানুষই ছিলো এমন কাঁচামাল যার ভাগ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কোনো কারিগর জোটেনি, যিনি মানব সম্পদ ব্যবহার করে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশুদ্ধ কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন। মানুষগুলো ছিলো যেন সেই মূল্যবান শস্যক্ষেত্র, যা আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। এমন কারো অস্তিত্ব ছিলো না, সেই আগাছা উৎপাটিত করে শস্য ক্ষেত্রসমূহ শস্য ফলনের উপযোগী করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। সংগঠিত ও সুশৃংখল জাতি-গোষ্ঠী ছিলো না, রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত হতো সেই বদ্ধ উন্মাদদের দ্বারা, যারা সেই শক্তি ব্যবহার করতো ধ্বংসাত্মক পন্থায়। আরব-অনারব নির্বিশেষে সবাই অত্যন্ত বিকৃত জীবন-যাপন করছিলো।

যেসব বস্তু ছিলো মানুষের অধীন এবং পৃথিবীতে যা অস্তিত্ব লাভ করেছে মানুষেরই কল্যাণের জন্য, যেসব বস্তু মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং যাদের আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি-পুরস্কার দেয়ার একবিন্দু ক্ষমতা নেই, মানুষ সেসব বস্তুকে উপাস্য জ্ঞানে তার সামনে মাথানত করতো। তদানীন্তন পৃথিবীর মানুষগুলো এমন বিকৃত ধর্মের অনুসারী ছিলো, আখিরাতের জীবন দূরে থাক, চলমান জীবন-যিন্দেগীতে যার কোনোই প্রভাব ছিলো না এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রে, মন-মস্তিষ্কে ও আত্মার ওপর যার কোনোই ক্ষমতা ছিলো না।

ধর্মজ্ঞানে তারা যা অনুসরণ করতো, চরিত্র ও সমাজ সেই ধর্ম দ্বারা আদৌ প্রভাবিত ছিলো না। তাদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এমন ছিলো যে, যেমন একজন শিল্পী বা কারিগর তার কর্ম শেষ করে ক্লান্তি জনিত কারণে বিশ্রামের জন্য নির্জনতা বেছে নিয়েছেন এবং পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যটি সেইসব লোকদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সমাজে যারা বিত্তবান এবং ধর্মীয় আসনে আসীন। এখন তারাই পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিপতি। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের ভাগ্য নিয়ন্তা তারাই এবং সমস্ত কিছুই তাদের ব্যবস্থাপনাধীন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি তাদের ঈমান এক ঐতিহাসিক অবহিতির চেয়ে অধিক কিছু ছিলো না। ইতিহাসের কোনো ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আণবিক বোমা প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়েছিলো, ছাত্রটি তার সঠিক উত্তর দেবে বটে কিন্তু সঠিক উত্তর বলার সময় তার মন-মস্তিষ্ক আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতার ভয়ে আতঙ্কিত হবে না এবং তার ওপর কোনো প্রভাবও পড়বে না। ঠিক তেমনি ছিলো আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না, ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমান তাদের দৈনন্দিন জীবনধারায় কোনো প্রভাব বিস্তার করতো না। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার

www.pathagar.com

কারণে তাঁর প্রতি অনুরাগ, ভয়, শ্রদ্ধা ছিলো না, তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও বড়ত্বের কোনো চিত্র তাদের হৃদয়ে ছিলো না। মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিলো অস্পষ্ট, যার ভেতরে কোনো গভীরতা ও শক্তি ছিলো না। ফলে সেই ঈমানের বাস্তব রূপায়নও ছিল তাদের চরিত্রে অনুপস্থিত।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী ও রিসালাতসহ প্রেরণ করলেন, যাতে করে তিনি মুমূর্ষ মানবতাকে নব জীবন দান করেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। বিশ্বনবীর আবির্ভাব মানবমন্ডলীকে নবজীবন, নতুন আলোক রশ্মি, নতুন উত্তাপ, নবতর শক্তি, নবতর প্রত্যয়, নতুন কৃষ্টি-সভ্যতা ও নতুন সমাজ দান করলো। তাঁর আগমনে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস এবং মানব জাতির কর্মে নবজীবনের সূত্রপাত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিলেন। তিনি যে বিধান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করলেন, তা বাস্তবে অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা ঈমান আনলো, তাদের স্বভাব-চরিত্রে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হলো এবং এই ঈমানদার লোকগুলোর দ্বারা মানব সমাজে যে বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলো–ইতিহাসের বুকে তা ছিলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

এই বিস্ময়কর বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিলো একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, গভীরতা, বিশালতা ও সার্বজনীনতা, বিস্তৃতি এবং মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া, এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর বিপ্লবের অনন্যদিকসমূহ। রাসূল কর্তৃক সাধিত এই বিপ্লব অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোনো জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য ছিলো না। এটা ছিলো ঈমানী বিপ্লব এবং সেই ঈমান তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্লাবিত করে বাস্তব জীবনের প্রত্যেক দিক ভাসিয়ে দিয়েছিলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং তাঁদেরকে ঈমানের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। এই ঈমানই তাদের দৈহিক পবিত্রতা ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এনেছিলো এবং হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি সৃষ্টি করেছিলো। মহান আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন এবং শুনছেন, তাঁর কাছে পার্থিব জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর হিসাব দিতে হবে, ঈমান এই অনুভূতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো। ফলে তাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর সমীপে ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত অবস্থায় দন্ডায়মান হতেন এবং রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়তেন।

ঈমান তাঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, মনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি এবং নফসের তথা প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। ঈমানই তাঁদের মধ্যে ঊর্ধ্বজগৎ ও যমীনের মালিকের প্রতি প্রেম ও

www.pathagar.com

অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধিই করছিলো এবং তাঁদেরকে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ, ক্ষমাশীলতা ও আত্মসংযমের পথে অগ্রসর করিয়েছিলো। রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও যুদ্ধ মারামারি তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত ছিলো এবং অস্ত্রের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো মজ্জাগত। ঈমান তাদের সেই হিংস্রতা ও সামরিক স্বভাব-প্রকৃতিকে এবং আরবীয় অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলো। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের সামনে তাঁরা মোমের মতোই গলে পড়তেন। সামান্যতম কাপুরুষতা যাদের চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যেতো না, তাঁরাই ঈমানের প্রভাবে অবৈধ কাজ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিতেন। ঈমানের প্রভাবে তাঁরা এমন পরিবেশ পরিস্থিতিকে সহ্য করেছিলেন, পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায় অথবা কোনো জাতি-গোষ্ঠী সহ্য করেনি।

চিন্তার জগতে ঈমানের প্রভাব

পৃথিবীর ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করতে পারবে না, যেখানে কোনো ঈমানদার মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে হিংসা, জিঘাংসা, রক্তপাত, মারামারি বা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিররা মদীনার আনসারদের সাথে গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো, অথচ ঈমান ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো যোগসূত্র ছিলো না। ইতিহাসে আদর্শের শক্তি ও প্রভাবের এটাই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরের প্রাণের দুশমন ছিলো। এক গোত্র অপর গোত্রের পরম আপনজনকে হত্যা করেছিলো। অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও তাদের ভেতরে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ছিলো না এবং মমতার বাগডোরে তাদেরকে বাঁধা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ঈমানই তাদের হৃদয় থেকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে দিয়ে গভীর মমতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলো। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে এবং পরস্পরের প্রতি চরম বৈরীভাবাপন্ন মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ঈমানের কারণে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই শক্তিশালী সম্পর্কের রূপ নিয়েছিলো, যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধুত্বই ম্লান ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিলো। পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান চালালেও এই ধরনের নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

নবোত্থিত ঈমানদারদের এই দলটি ছিলো এক বিশাল ইসলামী উম্মাহ্র ভিত্তি। ঈমানদারদের এই দলের আবির্ভাব এমন এক কঠিন সঙ্কট সন্ধিক্ষণে হয়েছিলো যখন পৃথিবী ধ্বংসের একপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো। ঈমানদারদের দল পৃথিবীকে

www.pathagar.com

ধ্বংসের প্রান্ত থেকে সরিয়ে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলো, যে বিপদ পৃথিবীর সামনে মুখ ব্যাদন করে অপেক্ষা করছিলো। ঈমানদারদের ঐ দলের আবির্ভাব পুনরায় মানব জাতির অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। ঈমানের কারণে তাঁদের ভেতরে দৃঢ়তা ও সংহতি, প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার অভ্যাস, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ, জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল পিপাসা সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহর দ্বীনকে উপলব্ধি করার তৃষ্ণা এবং আত্মজিজ্ঞাসার ন্যায় সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটেছিলো। সুখে দুঃখে যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার অনুপ্রেরণা তাঁদের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিলো। যে অবস্থায়ই তাঁরা থাকুন না কেনো, ঈমান তাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করতো।

ঈমান তাঁদের মধ্যে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীনতা খুবই সহজ-সাধ্য বিষয়ে পরিণত করেছিলো। ফলে পরিবার-পরিজনের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত সহ্য করায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঈমান আনার পূর্বে তাঁরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং আল্লাহর কোরআনের অসংখ্য আদেশ-নিষেধের সাথে তাঁরা পরিচিত ছিলেন না। ব্যক্তিগত বিষয়, নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে ও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা খুব সহজ-সাধ্য বিষয় ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ঈমানই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা তাঁদের অভ্যাসে পরিণত করেছিলো। তাঁরা ঈমান আনার ব্যাপারে শুধু মাত্র কালেমা পাঠের জন্য নিজের কণ্ঠকেই ব্যবহার করেননি, বরং তাঁদের মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা এবং দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঈমানের ছায়াতলে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

ঈমান আনার পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁদের কখনো মানসিক অথবা আত্মিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর রাসূল যা সিদ্ধান্ত দিতেন, সে ব্যাপারে তাঁদের সামান্যতম মতানৈক্যের অবকাশ থাকতো না। একমাত্র ঈমানই তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূলের সামনে তাঁদের গোপন ভুল-ভ্রান্তির কথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য করতো এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাণদন্ড তুল্য সংঘটিত অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে পেশ করতে বাধ্য করতো।

নিজের অজান্তে কোনো সময় পাশবিক শক্তি ও পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটেছে যখন কোনো মানব চক্ষু তা অবলোকন করেনি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে আইনের ধারা-উপধারা গ্রেফতার

www.pathagar.com

করতে অক্ষম হয়েছে, এ অবস্থায় ঈমানই তখন তীব্র ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করেছে। ঈমানের রশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পা এমনভাবে বেঁধেছে যে, সে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

ঈমান তার মন-মস্তিষ্কে প্রবল ঝড় সৃষ্টি করেছে। তার ভেতরে গোনাহর স্মরণ ও পরকালের শাস্তির বিষয়টি এমন পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তার জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য হয়ে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে গোপনে সংঘটিত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে কঠিন দন্ড ভোগের জন্য নিজেকে পেশ করেছে। এরপর নির্ধারিত চরম দন্ড সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে এবং হাসি মুখে দন্ড ভোগ করেছে যেন মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তির মোকাবেলায় পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করে হাশরের ময়দানে অপরাধ মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারে। ঈমানই ছিলো তাঁদের আমানত, সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ।

প্রকাশ্যে-গোপনে, নীরবে-নির্জনে ও জনসমাবেশে ঈমানই ছিলো অতন্দ্র প্রহরী। যেখানে দেখার মতো কেউ থাকতো না, এমন নীরব নির্জন স্থান, যেখানে একজন মানুষের পক্ষে যা খুশী তাই করার পূর্ণ সুযোগ থাকতো, যেখানে কেউ দেখে ফেলবে এই ভয় ছিলো না-সেখানেও একমাত্র ঈমানই তাঁদের নফস তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও নিষ্ঠার এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানবেতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র ঈমানী শক্তির কারণেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছিলো।

তারীখে তাবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাওহীদের বাহিনী পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী মাদায়েনে যখন উপস্থিত হয়েছিলো, তখন সাধারণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারস্য সম্রাটের ধন-রত্ন সংগ্রহ করে একজন হিসাব রক্ষকের কাজে জমা দেয়া হচ্ছিলো। একজন মুসলিম সৈন্য সবথেকে মূল্যবান ধন-রত্নের স্তুপ এনে যখন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দিলো তখন উপস্থিত লোকজন তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'এই লোক যে মূল্যবান ধন-রত্ন এনেছে তা আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের সংগ্রহ করা সম্পদের তুলনায় এই লোকের একার সংগ্রহ করা সম্পদ অধিক মূল্যবান।' এরপর একজন লোক সেই লোককে প্রশ্ন করলো, 'ভাই, তুমি এসব মূল্যবান ধন-রত্ন থেকে কোনো কিছু নিজের জন্য কোথাও সরিয়ে রেখে আসনি তো?'

www.pathagar.com

লোকটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বললো, 'বিষয়টি যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে এসব মূল্যবান ধন-রত্ন সম্পর্কে তোমরা কোনো সংবাদই জানতে পারতে না। সবটাই আমি সরিয়ে ফেলতাম।'

লোকজন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, এই লোক যা বলছে তার একটি শব্দও অসত্য নয়। তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে জানালো, 'আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে–অথচ প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি যদি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কোনো বিনিময় দিতে চান, তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।' কথা শেষ করে লোকটি যখন চলে গেলো, তখন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে লোকটির পরিচয় জানা গেলো যে, লোকটি ছিলো আবদে কায়স গোত্রের লোক এবং তাঁর নাম ছিলো আমের।

ঈমান জাগতিক ভয়-ভীতি দূর করে দিয়েছিলো

তাওহীদের প্রতি ঈমান তাঁদের মাথা করেছিলো উঁচু এবং গর্দান করেছিলো উন্নত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি তথা রাজা-বাদশাহ্, শাসকগোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতৃত্ব বা সমাজের কোনো শক্তিশালী লোকের সামনে তাঁদের মাথা নত হবে–এটা ছিলো তাঁদের কল্পনার অতীত। ঈমানী চেতনা তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'য়ালার মহানত্ব ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো। জাগতিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, পৃথিবীর চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রদর্শনীর কোনো মূল্যই তাঁদের দৃষ্টিতে ছিলো না। তাঁরা যখন পৃথিবীর শাসকগোষ্ঠীর জাঁক জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তাঁরা দেখতেন- এসব শাসকগোষ্ঠী জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পরম তুষ্ট রয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হতো, এসব রাজা-বাদশাহ্ যেন মাটির বানানো পুতুল- যাদেরকে মূল্যবান পোষাকে আবৃত করে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজদরবারে যাতায়াতকারী লোকগুলো যখন রাজা-বাদশাহ্কে সিজ্‌দা দিতে ব্যস্ত, তখন রাজদরবারে দাঁড়িয়ে এক নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষণা করলেন, 'আমাদের মাথা একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয় না।'

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পারস্য সেনাপতি রুস্তমের কাছে দূত হিসাবে হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করলেন। তিনি রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, মহামূল্যবান বস্তু দ্বারা রাজদরবার

সজ্জিত, পায়ের নীচের কার্পেট থেকে শুরু করে রুস্তমের দেহের পোষাক ও বসার আসন মহামূল্যবান মণি-মুক্তা দ্বারা সজ্জিত এবং রুস্তমের মাথায় হিরা-জহরত খচিত মুকুট। অথচ হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পরনে সাধারণ পোষাক, তাঁর সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর বর্শা, মাথায় শিরস্ত্রাণ- দেহ বর্মাবৃত। তিনি রুস্তমের দরবারের সেই মহামূল্যবান গালিচার ওপর দিয়েই নিজের ঘোড়া চালিয়ে রুস্তমের মুখোমুখি হলেন। দরবারের লোকগুলো তাঁকে সামরিক সরঞ্জাম ত্যাগ করে রুস্তমের সামনে যেতে উপদেশ দিলো।

তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'আমি তোমাদের কাছে নিজের ইচ্ছায় আসিনি। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছো। আমার অবস্থা যদি তোমাদের দরবারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা না করো, তাহলে আমি এখনই ফিরে যাবো।' রুস্তম তার দরবারের লোকদের বাধা দিয়ে বললো, 'তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই আসতে দাও।' হযরত রিবঈ বর্শার সূচালু অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দরবারে বিছানো কার্পেট মাড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন আর তার বর্শার অগ্রভাগের চাপে কার্পেট কয়েক স্থানে ছিদ্র হয়ে গেলো। রুস্তমের লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছো?

তিনি ঈমান দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকে সোপর্দ করার জন্যই এসেছি। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে যে জুলুম ও বাড়াবাড়ি চলছে, তা থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে টেনে নেয়ার জন্যই এসেছি।' মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁদের হৃদয়ে এমনই নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো- যা ছিলো বিস্ময়কর! আল্লাহর প্রেমে তাদেরকে মশগুল করেছিলো এবং জান্নাতের প্রতি প্রবল আগ্রহশীল আর পৃথিবীর জীবনের প্রতি চরমভাবে বীতস্পৃহ করেছিলো। আখিরাতের জীবন ও জান্নাতের চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সামনে এমনভাবে ভেসে উঠতো যে, সেই চিরস্থায়ী শান্তির জীবনে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা সামান্য কয়েকটি খেজুর খাওয়ার সময়ও ব্যয় করেননি, দুনিয়ার সমস্ত পিছুটানের প্রতি পদাঘাত করে শত্রু বুহ্যে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছেন।

ওহুদের ময়দানে সেই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে হযরত আনাস ইবনে নযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা প্রবল বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআযের সাথে দেখা হতেই তিনি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই সা'দ, আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ওহুদ পাড়ারের ওপাশ থেকে

www.pathagar.com

আমি জান্নাতের ঘ্রাণ অনুভব করছি।' হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, 'আমরা দেখতে পেলাম আনাস ইবনে নযর শহীদদের মিছিলে শামিল হয়েছেন। তাঁর দেহে ৮০ টিরও অধিক আঘাত ছিলো, প্রত্যেকটি আঘাত ছিলো সামনের দিকে এবং তাঁকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছিলো যে, তাঁকে চেনার কোনো উপায় ছিলো না। তাঁর বোন তাঁর একটি অক্ষত আঙ্গুল দেখে তাঁকে শনাক্ত করেছিলো।

হযরত আবু বকর ইবনে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার আব্বা ছিলেন শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি এবং তিনি ঘোষণা করছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।' তাঁর ঘোষণা শুনে এমন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, যাঁর পরনে ছিলো জীর্ণ পোষাক। লোকটি বললো, হে আবূ মূসা! তুমি কি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলকে এই কথা বলতে শুনেছো?' তিনি জানালেন, 'হ্যাঁ, আমি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে এই কথা শুনেছি।' তখন লোকটি নিজের পরিচিতজনদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'তোমরা আমার জীবনের শেষ সালাম গ্রহণ করো।' এ কথা বলেই সে তাঁর তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে কোষমুক্ত তরবারি হাতে শত্রু বুহ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করলো।

ওহুদের রণপ্রান্তরে ইসলামের শত্রুরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আক্রমন করতে বদ্ধপরিকর। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহক। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাঁর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি রাসূলের দেহে সামান্যতম আঘাত বরদাস্ত করবেন না। আল্লাহর নবীর দিকে কাফের বাহিনী শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে। হযরত মুসআব (রাঃ) এক হাতে পতাকা আরেক হাতে তরবারী নিয়ে রাসূলকে নিজের পেছনে রেখে কাফেরদের আক্রমন প্রতিহত করতে থাকলেন।

কাফেরদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদের সামনে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে ভীতিকর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁর এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো, কাফেরদের দৃষ্টি রাসূলের ওপর থেকে সরিয়ে নিজের ওপরে নিয়ে আসা। রাসূল যেন নিরাপদে থাকতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এভাবে হযরত মুসআব (রাঃ) ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্ত্বাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাফেরদের সামনে ঢালের মতই ভূমিকা পালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর দেহের ওপর দিয়েই আল্লাহর রাসূলকে আক্রমন করছিল।

www.pathagar.com

শত্রুদের তীব্র আক্রমনের মুখে যখন মুসলিম সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো, তখন হযরত মুসআব (রাঃ) একাকী শত্রুর সামনে পাহাড়ের মতই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলকে আঘাতকারী জালিম ইবনে কামিয়াহ এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব তাকে বাধা দিলেন। পাপিষ্ঠ কামিয়াহ তরবারী দিয়ে আঘাত করে হযরত মুসআবের ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সাথে সাথে তিনি বলে উঠলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ–
اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ–

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তার আদর্শের বিপরীত পথে চলবে? (সূরা ইমরান-১৪৪)

কাফেরদের তরবারীর আরেকটি আঘাতে হযরত মুসআবের দ্বিতীয়টি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবারও তিনি পূর্বের মতই ঐ কথাটি উচ্চারণ করলেন। তিনি তাঁর কাটা হাতের বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা জড়িয়ে ধরে উড্ডীন রাখলেন। ইসলামের শত্রুরা এবার তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হেনে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। শাহাদাতের অমিয় সুধা তিনি পান করলেন। তিনি যে মুহূর্তে শাহাদাত বরণ করেন, সে সময়ের সবচেয়ে অলৌকিক ঘটনা হলো, ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে বার বার আঘাত পেয়ে তিনি যে কথাটি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন, সেই কথাটিই পরবর্তীতে হু-বহু কোরআনের আয়াত হিসাবে আল্লাহর রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত পরে তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিবেন, সেই সিদ্ধান্তই তিনি তাঁর এক প্রিয় বান্দার মুখ দিয়ে তাঁর শাহাদাতের মুহূর্তে যেন জানিয়ে দিলেন।

হযরত মুসআব ইসলামের শত্রুদেরকে এবং মুসলমানদেরকে যেন স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল মাত্র। তিনি মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়ে এক সময় এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করবেন। ইতোপূর্বেও নবী রাসূলগণ এভাবে সত্য পৌঁছে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যে সত্য পৃথিবীতে এনেছিলেন তাদের বিদায়ের কারণে সে সত্যর মৃত্যু ঘটবে না। মহাসত্যের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখার মৃত্যু নেই। যে আদর্শের বীজ সত্যের বাহকেরা বপন করে যান, তার অঙ্কুরোদগম সত্যের বাহকদেরকে হত্যা করে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সময়ের ব্যবধানে তা ফলে ফুলে

www.pathagar.com

সুশোভিত হয়ে মহীরুহ ধারণ করবেই। ইসলামী আদর্শবাদী দলকে নিষিদ্ধ করে বা ইসলামী ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে আদর্শকে হত্যা করা যাবে না, এ কথাই যেন শাহাদাতের পূর্বক্ষণে হযরত মুসআব (রাঃ) বলে গেলেন।

দাফন কাফনের সময় হযরত মুসআব (রাঃ) এর লাশ পাওয়া গেল। হাত দুটো নেই। তিনি হাত দুটো দিয়ে মহাসত্যের পতাকা ধারণ করেছিলেন, এ অপরাধে শত্রুরা তাঁর হাত দুটো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাঁর পবিত্র শরীরে রয়েছে জোড়াতালি দেয়া শতছিন্ন পোষাক। সে পোষাকও রক্ত আর বালিতে বিবর্ণ। তবুও তাঁর গোটা মুখমন্ডল দিয়ে যেন জান্নাতের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল হযরত মুসআবের এই করুণ অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

সাহাবায়ে কেরাম নীরবে চোখের পানি ফেলছিলেন, রাসূলের চোখে পানি ঝরতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত ছোট এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে কাপড় দিয়ে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকে, মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকে। তিনি ছিলেন মক্কার ধনীর আদোরের দুলাল। তাঁর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মত জাঁক-জমক পূর্ণ পোষাক আর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করতো না। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আর ধন সম্পদের পাহাড়কে পদাঘাত করে রাসূলের আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

হযরত মুসআব (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূল্যবান পোষাক ব্যবহার করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র আকর্ষণীয় গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতো। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর মা ছিল ইসলামের শত্রুদের দলে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে বন্দী করে রাখতো। অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম দূত হিসাবেই তাঁকে মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দেয়ার একক কৃতিত্ব যেন তাঁরই। একমাত্র ঈমানই তাঁকে এই দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলো।

হযরত হানযালা (রাঃ) ছিলেন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক। সুন্দরী তন্বী তরুণী এক ষোড়শীকে তিনি সবেমাত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। সেদিন

www.pathagar.com

ছিল তাঁর বাসর রাত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাসর রাত অতিবাহিত করেছেন। ফরজ গোছল আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন হযরত হানযালা। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন ওহুদের রণপ্রান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাতিল শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফরজ গোছল উপেক্ষা করে তরবারী হাতে ওহুদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। আল্লাহর এই ব্যঘ্র 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে শত্রুবাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করতে থাকলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। সুন্দরী তন্বী তরুণী স্ত্রীর সাথে বাসর শয্যার কোনো মধুর স্মৃতিই হযরত হানযালা (রাঃ) কে জিহাদের ময়দান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। স্ত্রীর মধুর আলিঙ্গনের চেয়ে তিনি বাতিল শক্তির রক্তলোলুপ তরবারীর নিষ্ঠুর আলিঙ্গনকেই অধিক পছন্দ করেছিলেন। যুদ্ধ অবসানে আল্লাহর রাসূল শহীদদের দাফন করছেন। এমন সময় হযরত হানযালার সদ্য বিবাহিতা-বিধবা স্ত্রী যুদ্ধের ময়দানে এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামীর ওপর গোছল ফরজ ছিল, তাঁকে গোছল ব্যতীত দাফন করবেন না।'

আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের সন্ধান করবেন, এ সময়ে হযরত জিবরাঈল এসে নবীকে অবগত করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! হানযালাকে গোছল দেয়ার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এত খুশী হয়েছেন যে, জান্নাতে তাঁর গোছলের ব্যবস্থা করেছেন।'

আল্লাহর রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে এ কথা জানিয়ে দিলেন। লোকজন হযরত হানযালার লাশের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি থেকে সুগন্ধ যুক্ত পানি ঝরছে। ঈমানের টানে পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মাথায় পদাঘাত করে হযরত হানযালা (রাঃ) ওহুদের রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর এই উত্তম কর্মের পুরস্কার কিভাবে দান করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তা ওহুদের রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিল।

পৃথিবীতে যারা ইসলামের মুজাহিদ নামে পরিচিত, তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত শাহাদাত বরণ করা। সাফল্যের শেষ স্তর হলো শাহাদাত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ দানের মধ্যে যে কি তৃপ্তি তা ভাষায় প্রকাশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইসলামের প্রেমিক যারা তাঁরা শুধু হৃদয়ের সুষমা দিয়েই অনুভব করেছেন। শাহাদাত বরণ করার মধ্যে কি যে অপূর্ব স্বাদ, তা শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না। ঈমানদারদের প্রাণ শাহাদাতের উদগ্র কামনায় ব্যাকুল থাকে। তাদের আত্মা শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী সুধা পান করার আশায়

www.pathagar.com

প্রতীক্ষার প্রহর গুনে। তাদের মন ছুটে চলে যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে এক প্রভাময় পৃথিবীতে। সে পৃথিবীতে তাদের দেহ-মন জান্নাতের সুষমা মন্ডিত স্নিগ্ধ বারিধারায় অবগাহন করে।

ওহুদের রণপ্রান্তরে সত্য আর মিথ্যার মধ্যে রণদামামা বেজে ওঠার শব্দে মদীনার ইসলামী সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছিল শাহাদাতের জান্নাতি আবেশ। মুসলিম সমাজের যুবক, বৃদ্ধ, শিশু আর নারীরা তাদের দেহের তপ্ত রক্ত ইসলামের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। জিহাদের আহ্বান শুনে মদীনা নগরী এমনভাবে সজ্জিত হয়েছিল, যেন নববধু সুসজ্জিতাবস্থায় শরীরে সুগন্ধির প্রলেপ দিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। মুসলমানদের ললাটে নবী প্রেমের দ্যুতি পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। হযরত আমর ইবনে জমুহ্ (রাঃ) ছিলেন পঙ্গু। মসজিদে নববীর অদূরেই তিনি বাস করতেন। নবীর এই সাহাবী ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন তিনি। তবুও তিনি যুদ্ধে যাবেন। পিতার জিদ দেখে সন্তানগণ তাঁকে আটকিয়ে রেখে তাঁর চার সন্তান ওহুদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তানগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে আগ্রহী নয়। আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করে জান্নাতে এভাবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল হযরত আমরের সন্তানদেরকে বললেন, 'তোমাদের পিতা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা দিও না। হয়তো আল্লাহ তাঁকে শাহাদাত নছীব করবেন।'

হযরত আমরের চার সন্তান ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি তাঁর সন্তানদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন, সন্তানদের চেহারায় শাহাদাতের তীব্র আকাংখা। রণসাজে সজ্জিত সন্তানদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের মতই দেখাছিল। হযরত জমুহ (রাঃ) তাঁর সন্তানদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা ওহুদের পথে অদৃশ্য হলেন। তাঁর সন্তানগণ যদি শাহাদাত বরণ করে, তাহলে তাঁর আগেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। পঙ্গু পিতার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দোল খেলো। হযরত আমর (রাঃ) দেখলেন, একজন কিশোর সাহাবী তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে। কিশোর এসে তাঁর কাছে দোয়া কামনা করে ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবীর পঙ্গু সাহাবী হযরত আমর ইবনে জমুহ (রাঃ) ওহুদের রণপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধী বাহিনীর ভেতরে তিনি প্রবেশ করে বীর বিক্রমে আক্রমন করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর আশেপাশেই তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানগণ যুদ্ধ করছে। তাঁর চোখের সামনে একে একে তাঁর চার সন্তান শাহাদাত বরণ করলেন। কাফেরদের শানিত অস্ত্র এক সময় তাঁর পঙ্গু দেহকে দ্বিখন্ডিত করে দিল। তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

হযরত আমর ইবনে জমুহর স্ত্রী স্বামীর এবং সন্তানদের লাশ গ্রহণ করার জন্য উট নিয়ে ওহূদের ময়দানে এলেন। লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে তিনি উটকে বাড়ির দিকে অগ্রসর করাতে চাইলেন। উট স্থির থাকলো। ওহূদের প্রান্তর ত্যাগ করতে উট রাজী হলো না। রাসূলকে এ কথা জানানোর পরে তিনি পঙ্গু সাহাবীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্বামী বাড়ি থেকে আসার সময় কি কিছু বলেছিলো?

স্ত্রী জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল, হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।

এ কথা শোনার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু সজল নয়নে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নবুওয়্যতী দৃষ্টি শুভ্র মেঘমালা পার হয়ে ঐ দূর নীলিমা ভেদ করে সপ্তম আসমানের ওপরে আল্লাহর আরশে আজিমের কাছে গিয়ে পৌছলো। অপূর্ব মধুময় স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দিল রাসূলের পবিত্র অধরে। উন্মুক্ত দক্ষিণা মলয় সমিরণে দোল খাওয়া কচি লতার মতই রাসূলের মাথা মোবারক সামান্য হেলে উঠলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। তাঁকে ওহুদের ময়দানেই অন্তিম শয়নে শুইয়ে দাও।' রাসূলের আদেশ অনুসারে হযরত আমর ইবনে জমুহ (রাঃ) কে ওহুদের রক্তাক্ত উপত্যকায় অন্তিম শয়নে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। ঈমান এভাবেই তাঁর ভেতরে শাহাদাতের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো।

ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর সাথে বেশ কয়েকজন নারীও ছিল। তাঁরা সৈন্যদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদেরকে সেবা-যত্ন করতেন। তাঁরা মশক ভর্তি করে পানি এনে সৈন্যদেরকে পান করাতেন এবং পানি শেষ হয়ে গেলে পুনরায় মশক ভর্তি করে আনতেন। সৈন্যদের ক্ষতস্থানে তাঁরা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন। মুসলিম বাহিনী যখন হঠাৎ শত্রুবাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়ে পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) আহত সৈন্যদের সেবা করায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন শত্রু বাহিনী চিৎকার করে বলছে, 'কোথায় মুহাম্মাদ! তাঁর সন্ধান করতে থাকো, সে জীবিত থাকলে আমরা কেউ বিপদ মুক্ত নই। তাঁকে হত্যা করতেই হবে।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত উম্মে আম্মারা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন আল্লাহর রাসূল যেখানে অবস্থান করছেন, সেদিকে শত্রুবাহিনী শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে যাচ্ছে। তিনি কোমল দেহের অধিকারী একজন নারী, তবুও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। নিজের প্রাণ শেষ হয়ে যায় যাক, কোন আফসোস নেই। তাঁদের মত শত কোটি জীবনের তুলনায় আল্লাহর রাসূলের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। রাসূলকে এবং তাঁর সম্মান-মর্যাদা হেফাজত করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

হযরত উম্মে আম্মারা হাত থেকে পানির পাত্র সজোরে নিক্ষেপ করলেন। যৎ সামান্য যে অস্ত্র হাতের কাছে পেলেন তাই উঠিয়ে নিয়ে উল্কার গতিতে রাসূলের সামনে উপস্থিত হলেন। একটা ঢাল যোগাড় করে তিনি শত্রুর আক্রমন প্রতিরোধ করতে লাগলেন। শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র ছিল যে, অনেক বিখ্যাত মুসলিম বীরও ময়দানে টিকে থাকতে পারেননি। অথচ এ ধরনের মারাত্মক এবং নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত উম্মে আম্মারা অতুলনীয় বিক্রমে শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন।

তিনি তীর বেগে ছুটে একবার ডানে এবং আরেকবার বামে যাচ্ছিলেন, যেন শত্রুবাহিনীর কেউ রাসূলের কাছে যেতে না পারে। তাঁর দুটো সন্তানও ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করছিলেন। শত্রুপক্ষ যখন দেখলো, এই নারীর কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছা যাচ্ছে না, তখন তারা হযরত উম্মে আম্মারার ওপরে আক্রমণ চালালো। একজন কাফির তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তরবারীর আঘাত করলো। হযরত উম্মে আম্মারা সে আঘাত ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন। তারপর তিনি তরবারীর আঘাত করে কাফিরের ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। ঘোড়া মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে শত্রু সৈন্যও মাটিতে পড়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে হযরত উম্মে আম্মারার দুই সন্তানকে তাঁদের মা'কে সাহায্য করার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে শত্রুকে জাহান্নামে প্রেরণ করলো।

এক পর্যায়ে তাঁর সন্তান আহত হলো। কলিজার টুকরা সন্তানের রক্তাক্ত দেহ দেখেও মায়ের মধ্যে সামান্য ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো না। সন্তানকে তিনি কোনো ধরনের সান্ত্বনার বাণীও শোনালেন না। তিনি নির্বিকার চিত্তে সন্তানের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে আদেশ দিলেন, 'দ্রুত ময়দানে গিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

আল্লাহর রাসূল তাঁর এই মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে আম্মারার সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেই তিনি বারবার মহান আল্লাহর কাছে তাঁর

www.pathagar.com

এই মহিলা সাহাবীর জন্য দোয়া করছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে হযরত উম্মে আম্মারার সামনে এলো ঐ ব্যক্তি, যে তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে আঘাত করেছিলো। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করার লক্ষ্যে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁকে সতর্ক করে বললেন, 'হে উম্মে আম্মারা! সতর্ক হও! এই জালিম তোমার সন্তান আব্দুল্লাহকে আহত করেছে।'

নবীর কথা শুনে হযরত উম্মে আম্মারার শরীরে যেন সিংহের শক্তি এসে জমা হলো। তিনি তরবারি দিয়ে পুত্রের ওপর আঘাতকারীর ওপরে এমন শক্তিতে আঘাত হানলেন যে, তাঁর আঘাতে শত্রু সৈন্য দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বীর জাহান্নামী আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়ার সাথেও হযরত উম্মে আম্মারা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে যুদ্ধ করেছিলেন। ইবনে কামিয়াহ বারবার রাসূলকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছিল। সেই কঠিন মুহূর্তে হযরত উম্মে আম্মারার মত একজন কোমল দেহের নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে ইবনে কামিয়াকে প্রতিরোধ করছিলেন। আক্রমনকারী জালিমের দেহ ছিল লৌহ বর্মে আবৃত। হযরত উম্মে আম্মারা জালিমকে হত্যা করার জন্য তরবারির আঘাত করেন। কিন্তু জালিমের দেহে বর্ম থাকার কারণে হযরত উম্মে আম্মারার তরবারি ভেঙ্গে গেল। জালিম এবার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর এই বাঘিনীর ওপর আক্রমন করলো। তিনি ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করতে গিয়েও কাঁধে মারাত্মক আঘাত পেলেন।

কিন্তু রাসূলের এই মহিলা সাহাবী সামান্যতম কাতর হলেন না। আহত দেহ নিয়েই তিনি আল্লাহর দুশমনের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখলেন। তাঁর মোকাবেলায় টিকতে না পেরে জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, ইসলামের এই বঘিনীর কোমল শরীরে ইসলামের শত্রুরা ১২ স্থানে আঘাত করেছে। এতগুলো আঘাত পাওয়ার পরও তিনি যুদ্ধে বিরতি দেননি। আল্লাহর রাসূলকে অক্ষত রাখার জন্য তিনি নিজের প্রাণের কোন পরোয়া করেননি। মৃত্যুকে তাঁরা পায়ের ভৃত্য মনে করতেন। তাঁরা শহীদী মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াতেন।

পৃথিবীর বুকে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধুমাত্র পুরুষই ময়দানে রক্ত দান করেনি। মুসলিম নারীগণ কোন দিক থেকে কোন অংশেই পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা ইসলামের জন্য স্বামীকে, সন্তানকে, ভাইকে, পিতাকে, নির্বিশেষে নিজের প্রিয় প্রাণও উৎসর্গ করেছে। আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সামান্যতম কার্পণ্যতা প্রদর্শন করেনি আর ঈমানী শক্তিই তাঁদেরকে এই পথে অগ্রসর করিয়েছিলো।

www.pathagar.com

মূতার যুদ্ধে ঈমানদারদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিন হাজার। এক সময়ের ক্রীতদাস, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের সন্তানের সতই দেখতেন। সেই শিশুকাল থেকেই তিনি নবীর সাহচর্যে রয়েছেন। তিনি ছিলেন হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা (রাঃ)। তাঁকেই ঈমান দীপ্ত বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই একজন করে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করা হতো। এই যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনাপ্রধান আল্লাহর রাসূল নিযুক্ত করলেন। বিষয়টা ছিল অন্য যুদ্ধের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। দ্বিতীয় প্রধান করা হলো হযরত জাফর (রাঃ) কে। তৃতীয় প্রধান করা হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে (রাঃ) কে।

আল্লাহর নবী ঘোষনা করলেন, 'যায়িদ শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে জাফর, জাফর শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে আব্দুল্লাহ। সে-ও যদি শাহাদাতবরণ করে তাহলে মুসলিম বাহিনী যাকে ইচ্ছা তাকে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করবে।' কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ইহুদী আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে মন্তব্য করেছিলো, 'আল্লাহর শপথ! এই তিনজনই আজ শাহাদাতবরণ করবে।'

মুসলিম বাহিনী সিরিয়া প্রদেশে উপনিত হয়ে জানতে পারলো, তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য শোরহাবিল এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে এবং আরো এক লক্ষ সৈন্য তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। হযরত যায়িদ (রাঃ) দক্ষতার সাথে সৈন্য বিন্যাস করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে এক সময় তিনি শাহাদাতের সুধা পান করলেন। এরপর হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পতাকা হাতে উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একলক্ষ বাহিনীর সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্যর এক অসম যুদ্ধ হচ্ছে। হযরত জাফরের ঘোড়া আহত হলো। শত্রু পক্ষ তাঁর বাম হাত কেটে দিলে তিনি ডান হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ডান হাত কেটে দিলে তিনি কাটা বাহু দিয়ে পতাকা উড্ডীন রাখলেন। এরপর তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মুখ দিয়ে পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। হযরত জাফর (রাঃ) সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাঁকে জান্নাতে এমন দুটো পাখা দান করা হয়েছে যে, সে পাখার সাহায্যে তিনি জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন।'

এবার এগিয়ে এলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তরবারি চালনা করতে করতে তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। একজন সাহাবী তাঁকে এক টুকরা গোস্ত দিয়ে বললেন, 'আপনি বড় ক্ষুধার্ত, এই টুকু খেয়ে তরবারি চালনা করুন।' গোস্তের

টুকরা তিনি মুখে দিয়েছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, একজন মুসলিম সৈন্য বড় বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। তিনি গোস্তের টুকরা ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার জন্য এ পৃথিবীতে খাবারের কোনো প্রয়োজন আর নেই।' হযরত জাফর (রাঃ) এর গোটা দেহ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমি তাঁর শরীরে তরবারী এবং বর্শার ৯০ টি আঘাত দেখেছি। সমস্ত আঘাতগুলো ছিল সামনের দিকে।'

এই যুদ্ধের সংবাদ আল্লাহর নবীকে মদীনাতেই ফেরেশতার মাধ্যমে দেয়া হচ্ছিলো। কে কখন শাহাদাত বরণ করছেন, তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে শোনাচ্ছিলেন। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূলের সামনে যেন মৃতার প্রান্তর তুলে ধরা হয়েছিল। যুদ্ধের দৃশ্য দেখে দেখে তিনি বর্ণনা করছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন হযরত ইয়ালী ইবনে মাম্বাহ (রাঃ)। তিনি সংবাদ বলার আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'তুমিই সংবাদ বলবে না আমি তোমাকে শোনাবো?' তিনি রাসূলের মুখ থেকে যুদ্ধের ঘটনা শুনে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি বাড়িয়েও বলেননি কিছু কমও বলেননি।' ঈমানী চেতনা তাঁদের মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছিলো।

ঈমান জীবনের বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো

একজন বেদুঈন ঈমান এনে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'আমি আপনার সাথে হিজরত করতে আগ্রহী।' খয়বরের যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার সময় আল্লাহর রাসূল সেই বেদুঈনের অংশ পৃথক করে রাখলেন। তাঁকে যখন তাঁর অংশ দেয়া হলো তখন তিনি জানতে চাইলেন, 'এ সম্পদ তাঁকে কেনো দেয়া হচ্ছে?' তাঁকে জানানো হলো, 'এটা তোমার প্রাপ্য অংশ।' সেই বেদুঈন সম্পদের অংশ হাতে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সম্পদের আশায় ঈমান আনিনি। আমি ঈমান এনেছি যেন আমার কণ্ঠে শত্রুর তীর বিদ্ধ হয়, আমি শাহাতাদবরণ করি এবং জান্নাতে যেতে পারি।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তোমার চুক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি তোমার আকাঙ্খা পূরণ করবেন।' যুদ্ধ শেষে সেই বেদুঈনের লাশ যখন পাওয়া গেলো, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তাঁর চুক্তি সঠিক ছিলো, আল্লাহও তাঁর আশা পূরণ করেছেন।' এসব লোকগুলো ঈমান আনার পূর্বে কী

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খল জীবন-যাপনই না করছিলো! তাঁরা কোনো নিয়ম-পদ্ধতি, জীবন বিধানের পরোয়া করতো না এবং কোনো শক্তির আনুগত্যও করতো না। তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করতো, তারা সেদিকেই ছুটে যেতো। ভ্রান্তির বেড়াজালে ছিলো তারা বন্দী। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার পরে তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামীর এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁদের জন্য ঈমান যে বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো, সেই বৃত্তের বাইরে আসা কল্পনারও অতীত হয়ে পড়েছিলো।

তাঁরা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য ও গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করতেন। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমিত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দিয়েছিলো। মহান আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের কামনা-বাসনাকে ঈমানের রঙে রঙিন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা এমনভাবে ঈমান এনেছিলেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের অর্থ সম্পদ, শক্তি-মত্তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতার মালিক মনে করতেন না এবং এগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারও করতেন না। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আত্মীয়তা, অনুরাগ-বিরাগ, লেন-দেন, কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের অধীন করে দিয়েছিলেন।

তাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ঈমানের দাবি অনুসারে স্পন্দিত হতো। তাঁরা নিশ্বাস গ্রহণ করতেন ঈমানের দাবি অনুসারে এবং তা ছাড়তেনও ঈমান নির্দেশিত পন্থায়। ঈমানের বিপরীত জীবনধারা সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, কারণ তাঁরা জাহিলিয়াতের ছায়াতলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা ঈমানের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়া। একদিকে মানুষের প্রভুত্ব ও অন্য দিকে মহান আল্লাহর গোলামী। তাঁরা অুনধাবন করেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামীকে কবুল করতে হবে। আমি যখনই ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখনই আমার আমিত্ব বা মতামত বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোনো কাজ আর করা যাবে না। ঈমান আনার পরে আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলতে আর কিছুই নেই।

www.pathagar.com

ঈমান আনার পরে রাসূলের সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা যাবে না। ঈমানের বিপরীত বিধানের সামনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না বা নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ্‌র বিধানের মোকাবেলায় সমাজ ও দেশে প্রচলিত কোনো প্রথার অনুসরণ করা যাবে না। ঈমান আনার পরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না বা আত্মপূজায় নিমগ্ন থাকা যাবে না। এসব দিক তাঁরা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই যখনই তাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তখনই জাহিলিয়াতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, নীতি-পদ্ধতি ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করেছিলেন–ফলে তাঁদের জীবনে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো। ফুযালা নামক এক ব্যক্তি রাসূলের হাতে হাত দিয়ে ঈমান আনার পরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর সাথে এক মহিলার সম্পর্ক ছিলো। পথে সেই মহিলার সাথে দেখা হলে মহিলা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত ফুযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'এখন আর সেই সুযোগ নেই, আমি ঈমান এনেছি–আমি আল্লাহ্‌র গোলাম, এখন আর তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো অবকাশ নেই।'

ঈমান তাঁদের মধ্যে মানবতার সকল শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও দৃশ্যমান করেছিলো। তাঁরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানে নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তাঁরা শাসক হিসাবেই থাকুন অথবা রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী হিসাবে, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, বিনয়ী, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি হিসাবেই দেখতে পাওয়া যেতো। প্রতিপক্ষ তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো, 'রাতে তাঁদেরকে দেখতে পাবে যেন পৃথিবীর সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো কাজই নেই।

আর দিনের বেলা দেখতে পাবে, রোযাদার হিসাবে ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে। তাঁরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য প্রদান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যে, শত্রুকে পরাজিত করেই যুদ্ধে বিরতি দেয়। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়। দিনের বেলা তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন এবং মনে হবে যে, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করাই যেন তাঁদের একমাত্র কাজ।' ঈমান এভাবেই তাঁদের গোটা জীবনে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধন করেছিলো।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক

মানুষ জানে না, কে সে? কোত্থেকে তার আগমন? কোথায় তাকে পুনরায় যেতে হবে? এই পৃথিবীতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? কে তার মনিব? সে কার দাসত্ব করবে? এসব প্রশ্নের জবাব মানুষের জানা নেই। পরম করুণাময় আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর নবীর মাধ্যমে মানব মনের এসব স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করেছেন। সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মুনিব এবং গোলামের সম্পর্ক। মানুষ আল্লাহর গোলাম–এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়, এই পরিচয় দেয়ার মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তুমি তোমার পরিচয় এভাবে পেশ করো–

ايَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِيْنُ–

আমরা কেবল তোমরাই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

অর্থাৎ সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী তুমি, তোমার একান্ত অনুগ্রহেই তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমাদের জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ তুমিই প্রতি মুহূর্তে সরবরাহ করছো। তুমিই আমাদের রব, তুমি আমাদের মনিব, আমাদের ইলাহ, আমাদের মাবুদ, তুমিই আমাদের শাসক। তুমিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমরা তোমারই গোলাম। আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করি, তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি। কেননা, তুমি ব্যতীত সাহায্য করার কেউ নেই। আমরা অপারগ, আমরা শক্তিহীন, দুর্বল, অসহায়, তোমারই মুখাপেক্ষী। তুমি মহীয়ান, গরীয়ান, সর্বশক্তিমান। তুমি আমাদের মনিব এবং আমরা তোমার গোলাম, এ কারণে আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। যাবতীয় ব্যাপারে আমরা তোমারই মুখাপেক্ষী। আর এটাই হলো আমাদের পরিচয়। বান্দাহ্ এভাবে তাঁর মনিবের কাছে নিজের পরিচয় পেশ করলো, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।' পরিচয়টা এভাবে দেয়া হলো না যে, 'আমরা তোমার দাসত্ব করি।' পরিচয় পেশ করা হলো এভাবে যে, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।' তোমার শব্দটির সাথে 'ই' যোগ করে 'তোমারই' শব্দ ব্যবহার করে একথাই দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হলো যে, আমরা অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করি না, আমরা শুধু তোমরাই গোলামী করি এবং যে কোন প্রয়োজনে আমরা তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

www.pathagar.com

সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ এই কথাটি উচ্চারণ করে সে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি দিয়ে দিল, সে কোরআন- সুন্নাহার সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন আইন মানে না। সে দেশ, জাতি ও সামাজের প্রচলিত প্রথা, পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রচলিত প্রথার আনুগত্য করে না, মানুষের বানানো এমন কোন আইনও সে মানতে বাধ্য নয়, যে আইন মানতে গেলে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে নাফরমানী হয়। কারো বানানো আইনের কাছে সে মাথানত করে না। সে একমাত্র মাথানত করে মহান আল্লাহ্র বিধানের কাছে। এ কথার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে আল্লাহ্র বিধানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলো এবং নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকৃতি দিয়ে নিজের পরিচয় পেশ করলো।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, অনন্ত অসীম মহাশক্তিধর কল্পনাতীত গুণাবলীর অধিকারী আল্লাহর কাছে ক্ষুদ্র এই মানুষের অবস্থান কোথায়? মহান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষের কাছে নিজের যে শক্তি ও গুণাবলীর পরিচয় পেশ করেছেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে মানুষকে কোন ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে? মানুষ সেই আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে একজন মহাবিজ্ঞানী কুশলী স্রষ্টা মান্য করবে, না তাঁকে মানুষ নিজের গোটা জীবনের দাসত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী মাবুদ, আইনদাতা, বিধানদাতা, প্রতিপালক এবং সার্বভৌম প্রভু বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই অবতীর্ণ করা জীবন বিধান অনুসরণ করবে? আল্লাহর প্রশংসা পর্ব শেষ করার পর পরই এ ধরনের নানা প্রশ্ন এসে মানুষের মনকে দোলায়িত করতে থাকে। এসব প্রশ্নের যুক্তি সংগত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তর লাভ না করা পর্যন্ত মানুষের অনুসন্ধানী মন কোন ক্রমেই স্থির হয় না বা হতে পারে না।

এ জন্য মানুষকে সন্দেহ-সংশয়ের আবর্ত থেকে উদ্ধার করে তার মন মানসিকতাকে স্থির করার জন্যই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেয়া হলো, তুমি একমাত্র আল্লাহর গোলাম এবং সেই মহান স্রষ্টার গোলামী করাই তোমার সমগ্র জীবনের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য–যে স্রষ্টার প্রশংসা তুমি করলে, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অসীম দাতা ও দয়ালু এবং বিচার দিবসের অধিপতি, যাঁর কাছে তোমাদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজের চুলচেরা হিসাব দিতে তোমরা বাধ্য।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই–সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এ কথা মানুষকে শিখিয়ে দেয়ার অর্থই হলো, মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হলো যে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কটা কি। মানুষকে

www.pathagar.com

জানিয়ে দেয়া হলো, তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব করবে এবং আমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে–অর্থাৎ তোমরা কেবলমাত্র আমারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। আর এ কথাও পরিষ্কার যে, আমার মুখাপেক্ষী না হয়ে থেকেও তোমাদের কোন গত্যন্তর নেই, বিষয়টি তোমরা ভালোভাবে অবগত আছো। আমার অনুগ্রহ ব্যতিত ক্ষণকালও তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারো না, আমার অনুগ্রহের ওপরেই তোমাদের সার্বিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এ জন্য তোমরা একমাত্র আমারই কাছে সাহায্য কামনা করবে এবং আমারই দাসত্ব করবে, এটাই তোমাদের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বস্তুত মানুষ কোন পশু বা প্রাণীর মতো জীব নয়। যারা পৃথিবীতে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যে, মানুষের পূর্বপুরুষ ছিলো পশু। তারা মূলতঃ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কৌশল অবলম্বন করে গোটা পৃথিবীতে ভোগের এক ঘৃণ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞানবান মানুষই নিজের এই ঘৃণ্য অবস্থান কল্পনাও করতে পারে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এ কথা আল্লাহর কোরআন মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়ে বলেছে, মানুষকে আল্লাহর গোলামী করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ জন্য তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইতর প্রাণীর যেমন কোন ভবিষ্যৎ নেই, মানুষ তেমনি ভবিষ্যৎহীন সৃষ্টি নয়। মানুষকে বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। একটি বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা গোপন রাখা হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ–

আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, শুধুমাত্র এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই দাসত্ব করবে। (সূরা আয-যারিয়াত-৫৬)

বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। আর মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা হতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, মানুষ নিজেকে একমাত্র আল্লাহর মালিকানাধীন সত্তা স্বীকার করে নিবে এবং নিজেকে তাঁরই গোলাম হিসাবে প্রস্তুত করবে।

www.pathagar.com

কারণ মানুষ স্বয়ং নিজে উপাস্য, দাসত্ব লাভের অধিকারী, মনস্কামনা পূরণকারী, আইনদাতা ও বিধানদাতা তথা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোনক্রমেই হতে পারে না। এই অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর। মানুষ যদি আল্লাহর দাসত্ব করা ত্যাগ করে অন্য কোন সত্তার পূজা-উপাসনা করে, মূল সৃষ্টি কাজে অথবা বিশ্ব পরিচালনায়, রিযিকদানে, সৃষ্টি রক্ষায় ও সামঞ্জস্য বিধানে, প্রার্থনা মঞ্জুর করার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কোন শক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে, তাহলে তা আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে শির্ক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পক্ষান্তরে মৌখিকভাবে এসব দিক দিয়ে আল্লাহকে স্বীকার করেও মানুষের ব্যবহারিক জীবন তথা বাস্তব জীবনের প্রতিটি বিভাগে, আইন-বিধান দান এবং সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন শক্তিকে- যেমন রাজনৈতিক নেতা, ওলামা- মাশায়েখ, বিচারক, সমাজপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানকে মেনে নেয়া হয় বা তাদের শর্তহীন আনুগত্য করা হয়, তাহলেও তা মারাত্মক শির্ক হবে। মৌখিকভাবে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে, নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করে সেই সাথে মানুষের বানানো আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দিলে আল্লাহর ইবাদাত করা হয় না।

কারণ মানুষকে যে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র হৃদয়গত বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মাধ্যমে অর্জন হতে পারে না এবং শুধুমাত্র এর নামই ইবাদাত নয়। ইবাদাতের কাজে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে বাস্তবে তা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দু'চারটি দিক পালন করা হলো আর গোটা জীবন বিধানই মসজিদ মাদ্রাসায় বন্দী করে রেখে আল্লাহর ইবাদাত যেমন করা হলো না, তেমনি নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে প্রস্তুত করাও হলো না। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিভাগেই আল্লাহর গোলামী করবে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করবে এবং সে বিধান গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করবে। এ লক্ষ্যেই সূরা ফাতিহায় আল্লাহর শিখানো ভাষায় বান্দাহ্ নিজের পরিচয় পেশ করছে–হে আল্লাহ্ ! আমরা কেবল মাত্র তোমারই গোলাম, আমরা তোমারই দাসত্ব করি।

মহান আল্লাহও তাঁর বান্দাহ্কে জানিয়ে দিলেন, আমি মানুষকে সৃষ্টিই করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্ব করার লক্ষ্যে, মানুষ অন্য কারো দাসত্ব করবে, এ জন্য তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি। মানুষ আমার দাসত্ব করবে এ জন্য যে, আমি তাদের স্রষ্টা। অন্য

www.pathagar.com

কোন শক্তি যখন তাদেরকে সৃষ্টি করেনি, তখন অন্য কোন শক্তির কি অধিকার থাকতে পারে যে, তারা আমার সৃষ্টি করা মানুষের দাসত্ব লাভ করবে? মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমি- আমিই তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আর সেই মানুষ অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করবে, এটা কি করে যুক্তি সংগত ও বৈধ হতে পারে? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমার অন্যান্য সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করেছি, আর মানুষকে কেবলই আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি।

বস্তুতঃ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিজগতের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের খেদমতে নিয়োজিত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا-

তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সককিছু তোমাদের (ব্যবহারের) জন্য তৈরী করেছেন। (সূরা বাকারা- ২৯)

আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিই এই মানুষের সহযোগিতায় নিয়োজিত। মানুষ যাবতীয় বস্তু নিচয়কে যেভাবে খুশী ব্যবহার করছে। কোন বস্তুই মানুষের সাথে বিদ্রোহ পোষণ করছে না। এমনটি কখনো হয়নি যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে অথচ ধাতব পদার্থ গলছে না। কোন বৃক্ষ কর্তন করা হচ্ছে, অথচ তা পূর্বের মতোই তার নিজস্ব অবস্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে থাকলো। আহারের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীকে জবেহ দেয়া হচ্ছে, অথচ উদ্দেশ্যে অর্জন করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ যে বস্তুকে যেভাবেই ব্যবহার করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যাবতীয় বস্তু সেভাবেই সাড়া দিচ্ছে।

কেননা এসব মানুষের খেদমতের লক্ষ্যে সৃষ্টি করে তা মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মানুষের প্রতি এই আদেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে অনুসারে মানুষ পৃথিবীর জীবন অতিবাহিত করবে, যাবতীয় বস্তু নিচয় আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এভাবে মানুষ যদি নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহলে মানুষের জীবন সার্থক হবে, আর যদি সে দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচয় দেয় বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে-এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি–এই কথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা নামাজ আদায় করি, তোমাকে সেজ্‌দা করি, রমজান মাসে রোজা পালন করি, পশু কোরবানী দিয়ে থাকি, সামর্থ হলে হজ্জও আদায় করি, তোমার নামের যিকির করে থাকি অর্থাৎ এভাবেই আমরা ইবাদাত সম্পাদন করে থাকি। আসলে ইসলামে ইবাদাত বলতে যা বোঝানো হয়েছে, সেই ইবাদাত কি–তা না বুঝার কারণেই মাত্র গুটি কয়েক আনুষ্ঠানিক কাজকেই মানুষ ইবাদাত হিসাবে গণ্য করেছে। ইবাদাত শব্দটি 'আব্‌দ' শব্দ থেকে নির্গত। আব্‌দ বলে দাস ও বান্দাহ্‌কে। যেমন কোরআন যে আল্লাহর বাণী এ বিষয়ে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ–

আমি আমার বান্দাহর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না, সেই বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো। (সূরা বাকারা-২৩)

উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত আব্‌দ শব্দ দিয়ে 'বান্দাহ্‌কে' অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনি শুধু রাসূল ও নবীই নন–তিনি আল্লাহর একজন বান্দাও বটে। আরবী আব্‌দ ধাতুর মৌলিক অর্থ হলো, কোন শক্তির প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার মোকাবিলায় নিজের স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করা, নিজের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য নিঃশেষ করে দেয়া, সেই শক্তির ইচ্ছার কাছে অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করা। মূলতঃ দাসত্ব–গোলামী বা বন্দেগী করার মূল বিষয়ই এটি। একজন আরব বা আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই আব্‌দ শব্দ শোনার সাথে সাথে প্রাথমিক যে ধারণা লাভ করে তাহলো, দাসত্ব বা বন্দেগীর ধারণা। দাসের প্রকৃত কাজই হলো নিঃশর্তভাবে স্বীয় মুনিবের আনুগত্য আদেশানুবর্তিতা।

এভাবেই বিষয়টি থেকে আনুগত্যের ধারণা জন্ম নেয়। একজন দাস শুধু নিজের মুনিবের দাসত্ব, আনুগত্য এবং বন্দেগীর ভেতরে নিজেকে সমর্পিতই করে না, তার নিজের সমগ্র সত্তার সবটুকুই সমর্পণ করে দেয়। প্রতি মুহূর্তে সে মুনিবের প্রশংসা করতে থাকে, মুনিবের প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে থাকে। মুনিবের

www.pathagar.com

ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সে সন্তুষ্ট চিত্তে দেহ-মন-মানসিকতা অবনত করে দেয়। মুনিবের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, মুনিবের ইচ্ছার বিপরীত পথে চলে, মুনিবের বিরোধিতা করে, সে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে।

ইবাদাত বলতে আনুগত্য করা, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং বান্দাহ্ হয়ে থাকা বুঝায়। আর যিনি আনুগত্য, পূজা-উপাসনা ও দাসত্বের ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তিনিই হলেন আব্‌দ বা বান্দাহ্। আরবী ভাষায় সাধারণতঃ 'ইবাদাত' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দাসত্ব ও গোলামী, আনুগত্য ও আদেশানুবর্তিতা এবং পূজা-উপাসনা। সূরা ফাতিহার উল্লেখিত আয়াতে 'ইবাদাত' শব্দটি একই সময়ে ঐ তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি-এই বাক্যটি উচ্চারণ করে বান্দাহ্ মহান আল্লাহকে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই পূজা করি। আমরা একমাত্র তোমারই অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু তোমারই আদেশ অনুসরণ করে চলি। আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি, তোমরাই গোলামী করি। আমাদের সাথে তোমার পূজা, দাসত্ব-গোলামী, বন্দেগী, আনুগত্যের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে শুধু তাই নয়-এই সম্পর্ক অন্য কারো সাথে নেই এমনকি এই সম্পর্কের ব্যাপারে অন্য কারো সাথে আমাদের দূরতম সম্পর্কও নেই-একমাত্র তোমারই সাথে আমাদের ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করা, তসবীহ্ ও যিকির করার নামই ইবাদাত নয়-সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন অনুসরণ করার নামই হলো ইবাদাত। মহান আল্লাহ বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষেই একমাত্র আল্লাহরই বান্দাহ্ হয়ে থাকো, তাহলে যে সব পবিত্র দ্রব্য আমি তোমাদের দান করেছি, তা অসংকোচে খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো। (সূরা বাকারা-১৭২)

আরবের ইতিহাসেই শুধু নয়, গোটা পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, মানুষ নানা ধরনের প্রথার অনুসরণ করে আসছে। পূর্বপুরুষগণ যেসব প্রথা অনুসরণ করেছে, সেসব প্রথাসমূহ কোন ধরনের বিচার বিবেচনা ব্যতিতই অন্ধভক্তির সাথে পালন করা হচ্ছে। এই পৃথিবীতে মানুষ কোন কোন দ্রব্য আহার করে জীবন ধারণ করবে, সে ব্যাপারেও মানুষ নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। কোন কোন

জনগোষ্ঠী নির্বিচারে যে কোন পশু-প্রাণী আহার করছে, আবার কোন জনগোষ্ঠী কিছু সংখ্যক পশু-প্রাণীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে তা আহার করা থেকে বিরত থাকছে। এ ধরনের প্রথা সে যুগে আরবেও বিদ্যমান ছিল। ইসলাম কবুল করে মুসলমান হিসাবে নিজেদেরকে দাবী করার পরে কোন ধরনের আইন-বিধান বা প্রথার অনুসরণ করার কোন অবকাশ আর থাকে না।

এ জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ঈমান এনে মানুষ যদি একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে মুখে মুখে সে দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজপতি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে আসা অবাঞ্ছিত প্রথা, আইন-বিধানের যে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যা বৈধ করেছেন, তা অসংকোচে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে অবশ্যই দূরে অবস্থান করতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের হক আদায় হবে এবং মুসলমান হওয়া যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ আদায় করে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ করা জন্তু আহার করে সে মুসলমান।' অর্থাৎ নামাজ আদায় করা ও কিবলার দিকে মুখ করার পরও একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে জাহিলী যুগের সমস্ত বাধা-নিষেধ, পুর্বপুরষদের অবাঞ্ছিত প্রথাসমূহ, মানুষের বানানো আইন বিধানের প্রাচীর চূর্ণ না করবে এবং মানব সৃষ্ট অমূলক ধারণা বিশ্বাস ও কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ইসলামের অমীয় সুধায় সঞ্জীবিত হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বলে দাবী করার পরও মানুষের বানানো বাধা-বন্ধনের প্রভাব যার ভেতরে বর্তমান থাকবে, তাহলে বুঝতে হবে, সে ব্যক্তির শিরা-উপশিরায় মানব সৃষ্ট বিধানের বিষাক্ত ঘৃণিত ভাবধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, তা উল্লেখিত আয়াত স্পষ্ট করে দিল যে, তোমরা যদি সত্যই আমার গোলাম হয়ে থাকো, প্রকৃতপক্ষেই যদি তোমরা নেতা-নেত্রীদের আনুগত্য, আদেশানুবর্তিতা পরিত্যাগ করে আমার আনুগত্য গ্রহণ করে থাকো, তাহলে যে কোন ব্যাপারে নেতা-নেত্রীদের মনগড়া বিধানের পরিবর্তে আমার দেয়া বিধান অনুসরণ করতে হবে।

ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। ইবাদাত বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবনে যদি আমরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখি, তাহলে আমাদের মানব জন্ম বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে

www.pathagar.com

চিরতরে হারিয়ে যাবে। পরিণামে আদালতে আখিরাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো। মানুষের জীবনে সফলতা আর ব্যর্থতা নির্ভর করে এই ইবাদাত করার ওপর। ইবাদাত হলো, মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধার সৃষ্টি করে, সে শক্তিকে কোরআনের ভাষায় তাগুত বলা হয়।

তাগুত হলো সেই শক্তি, যে শক্তি শুধু নিজেই আল্লাহর আইন অমান্য করে না, অন্যদেরকেও অমান্য করতে বাধ্য করে। এই তাগুতকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে ইবাতাদের পরিপূর্ণ হক যেমন আদায় করা যাবে না, তেমনি ইবাদাতও হবে শির্ক মিশ্রিত। আর শির্ক মিশ্রিত ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। তা ধূলার মতোই উড়িয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহর নাজিল করা বিধান পালনের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাকেই তাগুত বলা হয়। আল্লাহর আইন অনুসারে এক ব্যক্তি তার ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন পরিচালিত করতে চায়, এ ক্ষেত্রে যদি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তারা হবে তাগুত। সামাজিক জীবনে সে আল্লাহর বিধান পালন করতে চায় অথচ সমাজপতি এ ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পালন করতে চায়, রাষ্ট্র তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। দলীয়ভাবে সে কোরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে চায়, অথচ সে দল আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে তাকে অগ্রসর করাতে চায়।

এভাবে যে শক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তারাই আল কোরআনের ভাষায় তাগুত হিসাবে চিহ্নিত হবে। এখন আল্লাহর আদেশ অনুসরণ না করে যারা তাগুতের আদেশ অনুসরণ করেছে, তাগুতের ইচ্ছার কাছে মাথানত করেছে, তারা আল্লাহর গোলাম না হয়ে তাগুতের গোলাম হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তারা তাগুতের গোলামী থেকে মানুষকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলাম বানানোর লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ–

www.pathagar.com

তোমার পূর্বে আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁকে আমি ওহীর দ্বারা অবগত করেছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। (সূরা আম্বিয়া-২৫)

যত সংখ্যক নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁরা সবাই মানুষের প্রতি ঐ একই আহ্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন এক আল্লাহ্র ইবাদাত করে। একমাত্র আল্লাহ্কেই ইলাহ্ বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর অনুসরণ করে। সমস্ত নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ জাতির প্রতি এভাবে আহ্বান জানিয়েছেন–

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ–

হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাত করো, তিনি ব্যতিত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। (সূরা আল আরাফ-৮৫)

ইলাহ্ যেমন দু'জন হতে পারে না–তেমনি ইবাদাতও দু'জনের করা যেতে পারে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন–

وَقَالَ اللّٰهُ لاَ تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ، فَاِيَّایَ فَارْهَبُوْنِ، وَلَهٗ مَا فِیْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا، اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ–

আল্লাহ্র আদেশ হলো, দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না, ইলাহ্ তো মাত্র একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো। সমস্ত কিছু তাঁরই, যা আকাশে রয়েছে এবং যা রয়েছে এই পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই নিয়ম-পদ্ধতি সমগ্র বিশ্ব জাহানে চলছে। এরপরও কি তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে? (সূরা আন্ নাহ্ল-৫১-৫২)

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবাদাতের অর্থ হলো–মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করা। কেউ যদি রাজনীতি করতে চায় বা রাজনৈতিক দলের একজন হয়ে কাজ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই কোরআনের বিধান অনুসারে তা করতে হবে। আল্লাহ্ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে তথা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করবে, তারা অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্র দাস হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে তাগুতের গোলাম হিসাবে

www.pathagar.com

চিহ্নিত হবে। জীবনের একটি বিভাগে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে, আর অন্যান্য বিভাগে তাগুতের ইবাদাত করা হবে, এ ধরনের শির্কপূর্ণ ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا–

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের রব-এর সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে, তার উচিত সৎকর্ম করা এবং নিজের রব-এর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো ইবাদাতকে শরীক না করা। (সূরা কাহ্‌ফ- ১১০)

নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ বারবার এই স্বীকৃতিই দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে, আর নামাজ শেষেই সেই ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত করছে আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন দিয়ে, বিচারকের আসনে আসীন হয়ে বিচার কার্য পরিচালিত করছে মানুষের বানানো আইন দিয়ে, রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনীতি করছে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করছে, সঙ্কীর্ণ গোত্রীয় জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে, দেশের জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস, আল্লাহর মোকাবিলায় এ ধরনের শির্কমূলক কথা বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে, এভাবে আল্লাহর সাথে যারা মোনাফেকী করছে, তারা অবশ্যই তাগুতের গোলামী করছে।

ইবাদাতকে সীমিত কোনও একটি অর্থে সীমিত করা মূলতঃ ইসলামকেই সীমিত করার নামান্তর। যারা এই সীমিত ধারণা নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাদের ইবাদাত হবে অসম্পূর্ণ- অসমাপ্ত। মনে রাখতে হবে, এই অসম্পূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার জন্য কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সাহাবাগণ রক্ত দিয়েছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত দিয়েছেন পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার জন্যেই। শির্কপূর্ণ ইবাদাত উৎখাত করে পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

ইবাদাতের ব্যাপক অর্থ ও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি

মিরাজ উপলক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের যে চৌদ্দটি মূলনীতি দান করেছিলেন, তা সূরা বনী ইসরাঈল-এ বর্ণিত হয়েছে। সেই চৌদ্দটি মূলনীতির প্রথম নীতিই হলো–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ–

তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারো ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

অর্থাৎ তোমার রব-এর পক্ষ থেকে এটা চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে গিয়েছে যে- দাসত্ব, গোলামী ও আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর গোলামী ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করা যাবে না। পূজা-উপাসনা করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর, অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন ধরনের গোলামী, দাসত্ব আনুগত্য ও পূজা উপাসনা করার কোন অবকাশ মানুষের জন্য নেই। এখন আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে এই গোলামী, দাসত্ব-আনুগত্য ও পূজা উপাসনা কি জিনিস এবং মানুষকে কেন এটা করতে হবে।

এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মানুষ কারো না কারো আনুগত্য করতে চায়। মানুষ যত বড় শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, একটা অবলম্বন সে চায়। কোন অসহায় দুর্বল মুহূর্তে সে একটা অবলম্বন চায়। মনস্তত্ত্ববিদগণ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিটি মানুষের মনই চেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, এমন একটি শক্তিকে অবলম্বন করতে চায়, যে শক্তির কাছে সে নিজেকে নিবেদন করবে। তার মনের একান্ত কামনা-বাসনাগুলো সে নিবেদন করে নিজেকে ভারমুক্ত করবে। প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণায় মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, সে যন্ত্রণা মানুষ কারো না কারো কাছে নিভৃতে নির্জনে ব্যক্ত করতে চায়। দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এমন একটি অবলম্বন সে পেতে চায়, যার কাছে সে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে, নিজের মনকে হালকা করতে চায়। তার মনের অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলো, অবিকশিত কথাগুলো কারো কাছে ব্যক্ত করে, বিকশিত করে নিজেকে বোঝা মুক্ত করতে চায়। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিগত স্বভাব।

ঠিক তেমনি, মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে স্বাধীন রাখতে পারে না এবং সে ক্ষমতা মানুষের নেই। যেহেতু কোন মানুষই প্রবৃত্তি মুক্ত নয়–প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট করেই মানুষকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। মানুষের এই প্রবৃত্তির মধ্যেই সৃষ্টিগতভাবে নিহিত রয়েছে অন্য কারো আনুগত্য করা। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো, সে কাউকে

www.pathagar.com

অসীম শক্তিধর, ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করবে এবং কারো না কারো আনুগত্য করবে, কাউকে একান্ত আপন ভাববে, কারো কাছে সাহায্য কামনা করবে, কারো আদেশ-নির্দেশের মুখাপেক্ষী হবে, চরম বিপদের মুহূর্তে সে কোন শক্তিকে একমাত্র অবলম্বন মনে করবে। এই স্বভাব মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আনুগত্য করা, কোন প্রয়োজনের সামনে নিজেকে নত করে দেয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়।

খাদ্য গ্রহণ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। ক্ষুধা অনুভূত হলে সে অনুভূতি দূরিভূত করার লক্ষ্যে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করলেই ক্ষুধার অনুভূতি দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হলে মানুষ খাদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ঠান্ডা অনুভূত হলে মানুষ শীতবস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। উষ্ণতা অনুভূত হলে মানুষ শীতলতা অনুসন্ধান করে অর্থাৎ শীতল বাতাস বা পরিবেশের আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃষ্টি তাকে সিক্ত করে দিতে পারে, এ জন্য সে মাথার ওপরে কোন আচ্ছাদনের আশ্রয় গ্রহণ করে।

নিজের মনের কথা ব্যক্ত করার প্রয়োজনে অর্থাৎ ভাবের আদান-প্রদান করার জন্য সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে। ভীতিকর অবস্থা থেকে মানুষ নিরাপত্তার অনুসন্ধান করে। এসব হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাড়িত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে পূজা-উপাসনার প্রেরণা-অনুভূতি প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কারো না কারো সামনে সে মাথানত করে নিজেকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবে, কারো আনুগত্য করবে, এই প্রেরণা মানুষের সমগ্র চেতনার মধ্যে বিরাজ করছে।

বন্দেগী এবং আনুগত্যের মূল বিষয় হচ্ছে, নিজেকে কোন উচ্চতর শক্তি বা সত্তার সামনে মাথানত করে দেয়া। আরবী ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, ইযহারে তাযাল্‌লুল। অর্থাৎ নিজেকে ছোট করা। এই নিজেকে ছোট করার বিষয়টি কিন্তু মোটেও তুচ্ছ করার বিষয় নয়। মাথানত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যেমন শ্রেষ্ঠ, তার মাথাও নত হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির সামনে। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, সুতরাং তাঁর সামনেই কেবল মানুষ মাথানত করতে পারে, অন্য কোন শক্তির সামনে অবশ্যই নয়। পৃথিবীর পশু-প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আহার গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা মাথা নীচু করে খাদ্যের কাছে নিয়ে যায়, তারপর খাদ্য গ্রহণ করে। গরু, ছাগল, উট, ঘোড়া মাথা নীচু করে খাদ্য গ্রহণ করে। হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য পাখী খাদ্যের

www.pathagar.com

সামনে মাথা নীচু করে খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। সে খাদ্যের সামনে মাথা নীচু করবে না, তাকে হাত দেয়া হয়েছে। হাত দিয়ে খাদ্য উঠিয়ে সে মুখে দিবে। এই বিষয়টি থেকে মানুষের জন্য শিক্ষনীয় হলো, মানুষের এই মাথা কারো কাছে নত হবে না। যিনি খাদ্যদান করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরই কাছে মাথানত হবে।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। ১৯৯৬ সনে আমাকে যখন আমার নিজের এলাকা ফিরোজপুর সদর এক নম্বর আসন থেকে এলাকার জনগণ পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদে পাঠালো, তখন পার্লামেন্টে একটি বিষয় আমি অবাক-বিস্ময়ে অবলোকন করলাম। কারণ ইতোপূর্বে আমি কখনো পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে সংসদ ভবনে প্রবেশ করিনি। সংসদ সদস্য হিসাবে জীবনের সর্বপ্রথম আমি সংসদ ভবনে প্রবেশ করার সময় অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্য সংসদে প্রবেশ করার সময় মাথা নীচু করে প্রবেশ করছে এবং বের হবার সময়ও ঐ একই ভঙ্গিতে বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা যেন রুকু সিজদা দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। বিষয়টি আমাকে অবাক করলো। বিস্মিত দৃষ্টিতে বিষয়টি আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। সে মুহূর্তে বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে প্রবীণ একজনকে আমি প্রশ্ন করলাম, লোকজন এভাবে রুকু সিজদা দেয়ার মতো করে আসা-যাওয়া করছে কেনো?

তিনি আমাকে জানালেন, পার্লামেন্টের রুল্স অব প্রসিডিওর-এ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে যে, এভাবে মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে হবে এবং বের হবার সময়ও সেই একই ভঙ্গিতে বের হতে হবে। যে বিধি-বিধান দিয়ে সংসদ পরিচালনা করা হয়, আমি সেই রুল্স অব প্রসিডিওর গ্রহণ করে তা পাঠ করে দেখলাম তার ভেতরে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৭ (২) বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের সংসদে প্রবেশ ও সংসদ থেকে বের হওয়ার সময় মাথা ঝুঁকানোর নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি আমাকে চরমভাবে ব্যথিত করলো। কারণ এই রীতি বা নির্দেশ ইসলামের বিধানের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। একজন মুসলমান একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত আর কারো কাছে মাথানত করতে পারে না। কেউ যদি তা করে তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ শির্ক। এই বিধি কোন মুসলমান অনুসরণ করতে পারে না।

সংসদে কেউ ইচ্ছে করলেই কথা বলতে পারে না। কথা বলতে হলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে কথা বলতে হয়। আমি কার্যপ্রণালী বিধি পড়লাম।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংবিধান পড়লাম। এভাবে বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে কয়েক দিন পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করলাম। আমি স্পীকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললাম, 'এই সংসদের একটি বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে–যা সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে কার্যপ্রণালী বিধিতে যা উল্লেখ রয়েছে, সেটা আবার দেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম ধারায় উল্লেখ রয়েছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সংবিধানে যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি- বলা হয়েছে, সেখানে এই সংসদে তার বিপরীত প্রথা চালু করা হয়েছে। মাথানত করে আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের যে রীতি এই সংসদে প্রচলিত রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এবং শির্ক। কারণ মানুষ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথানত করতে পারে না। মাথানত করে সম্মান প্রদর্শন করার এই প্রথা সম্পূর্ণ শির্ক- আর শির্ক সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ–

নিঃসন্দেহে শির্ক হলো বড় ধরনের জুলুম। (সূরা লুক্মান-১৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমার দেহকে যদি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়, তোমাকে যদি জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেয়া হয়, তবুও তুমি শির্কের প্রতি স্বীকৃতি দিবে না।'

সুতরাং এই সংসদে স্পীকারকে মাথানত করে সম্মান প্রদর্শনের যে প্রথা চালু রয়েছে, তা সম্পূর্ণ শির্ক, এটা কবীরা গোনাহ্ এবং এই প্রথা হারাম। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি থেকে এই প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার প্রতি এটা দায়িত্ব ছিল এই শির্কের প্রতিবাদ করা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। যদি সেই হারাম বিধি বিলুপ্ত করা না হয় তাহলে আপনি এবং এই সংসদে যারা আছেন, যারা এই প্রথা অনুসরণ করবেন- তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আসামী হিসাবে পরিগণিত হবেন।'

তদানীন্তন সরকার মুসলমানদের ঈমানের সাথে সম্পর্কিত আমার এ নোটিশটি তাদের পাঁচ বছরের ক্ষমতার আমলে পুনঃর্বার পার্লামেন্টে উত্থাপনের সুযোগ দেয়নি। পরবর্তী চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বিষয়টি আমি জাতিয় সংসদে

www.pathagar.com

পুনরায় উত্থাপন করে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হলাম। নিয়ম অনুযায়ী সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর কার্য প্রণালী বিধির ২৬৭(২) বিধি সংশোধন করা হয়। আর এভাবে মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে বাংলাদেশের পার্লামেন্ট শির্ক মুক্ত হলো– আল হাম্‌দুলিল্লাহ্।

মানুষ নিজেকে ছোট করবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনে, অন্য কারো সামনে নয়। আর নিজেকে ছোট করে দেখানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো রুকু ও সিজ্‌দা। এ জন্যেই একজন মুসলমান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে মাথানত করতে পারে না। বিভিন্ন দেশের আদালতে আইনজীবীগণ বিচারককে লক্ষ্য করে বলে থাকে, 'মাই লর্ড–My lord অর্থাৎ আমার প্রভু। মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রভু হলেন একমাত্র আল্লাহ। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের প্রভু কোনক্রমেই হতে পারে না। এভাবে কাউকে সম্বোধন করা সম্পূর্ণ হারাম। এসব হারাম প্রথা অমুসলিমগণ চালু করেছে। কোন মুসলমানের জন্য তা অনুসরণ করা বৈধ নয়।

প্রাকৃতিক আইন বনাম ইবাদাত

বন্দেগী বা আনুগত্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন চাকর তার মনিবের আনুগত্য করে। মনিব যা আদেশ করে, চাকর তা নিঃশর্তভাবে পালন করে থাকে। আনুগত্যের বিষয়টিকে আরো বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করতে গেলে বলা যায়, একটি দেশের জনগণ সে দেশের সরকারের আনুগত্য করে থাকে। প্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইনের আনুগত্য জনগণ করে থাকে।

মানুষ চেতনভাবেই হোক বা অবচেতনভাবেই হোক সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে, বিচারালয়ে, স্থলপথে যান-বাহনে, আকাশ যানে, শিক্ষাঙ্গনে, রাজপথে তথা সর্বত্র দেশের সরকারের আনুগত্য করে থাকে। আকাশ যান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আইন প্রচলিত রয়েছে, তার বিপরীত কোন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারে না। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় যাত্রীকে সে আইন অনুসরণ করেই আকাশ যানে পরিভ্রমণ করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, যত সংখ্যক মানুষ যে সরকারের কর্তৃত্ব সীমায় বসবাস করে এবং সরকারী আইনের অনুবর্তন করে, তারা সরকারের আনুগত্য করছে। এ কথাটিকে আরবীতে বলতে গেলে বলতে হবে, জনগণ সরকারের ইবাদাত করছে, আনুগত্য করছে, গোলামী করছে–দাসত্ব করছে।

www.pathagar.com

ইবাদাতের এই ধারণাকে আরো বিস্তৃত অঙ্গনে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সৃষ্টির সর্বত্রই একটি নিয়ম ক্রিয়াশীল। সমস্ত সৃষ্টিই একটি বিশেষ নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃক্ষ, তরু-লতা, সাগর-মহাসাগর, বিশাল জলধী, মৃদু-মন্দ বেগে বা দ্রুত বেগে প্রবাহিত সমীরণ, জীব-জগতের প্রতিটি স্পন্দন, পাহাড়-পর্বত, অটল-অচল হিমাদ্রী, উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বর্ধিতকরণ, সবুজ শ্যামল বনানীতে পাখীর কুঞ্জন, জীবের বংশবৃদ্ধিকরণ ও নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে তার অপসারণ, মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহের নিয়ন্ত্রিত বিচরণ, বায়ুমন্ডলের কার্যকরণ, গ্যাসীয় স্তরসমূহের সতর্ক বিচরণ, তাপের আধার সূর্যতাপের ভূ-পৃষ্ঠে নিয়ন্ত্রিত আগমন–এসবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, তারা নিঃশর্তভাবে কারো আইন অনুসরণ করছে, আইনের আনুগত্য করছে তথা কোন শক্তির ইবাদাত করছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ–

এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্যের পন্থা পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর নির্দেশের অধীন হয়ে আছে। (সূরা আলে ইমরান-৮৩)

মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি আমার দেয়া জীবন ব্যবস্থা ত্যাগ করে অন্যের বানানো জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করো? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, তার সব কিছুই আমার সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছে।

এই ভূ-পৃষ্ঠের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে শুরু করে ঐ বিশাল বিস্তৃত মহাশূন্যে বিচরণশীল দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান গ্রহ-উপগ্রহ-নিহারিকাপুঞ্জ, নক্ষত্র জগৎ অবধি যা কিছু যেখানে রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর নিয়মের আনুগত্য করছে তথা আল্লাহর ইবাদাত করছে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ছুবহানাহু তা'য়ালা যে আইন জারী করেছেন, তার বিপরীত কিছু করা বা তার ব্যতিক্রম করার কোন অবকাশ নেই। এমনটি নয় যে, সৃষ্টির এসব কিছু মানুষের মতো ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর আইন কিছুটা অনুসরণ করছে আবার অন্যের আইনও কিছুটা অনুসরণ করছে। সৃষ্টির এসব বস্তু শির্ক মিশ্রিত ইবাদাত করছে না, তারা পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত রয়েছে। এভাবে গোটা বিশ্বচরাচর ইবাদাত, দাসত্ব, গোলামী,

www.pathagar.com

আনুগত্য, পূজা-উপাসনা করছে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি কারো নেই। এটাকেই ইংরেজী ভাষায় বলা হয় Law of nature। আরবী ভাষায় বলা যেতে পারে 'কানুনে ফিতরাত' আর বাংলায় বলা হয় প্রাকৃতিক আইন। এই আইনকে লংঘন করার ক্ষমতা কারো নেই।

সমগ্র সৃষ্টিজগৎ যে আইন অনুসরণ করে চলেছে অর্থাৎ সৃষ্টি জগতসমূহ ও তার যাবতীয় বস্তু যে বন্দেগী বা ইবাদাত করছে, পবিত্র কোরআন এই ক্রিয়াশীল পদ্ধতিকে তথা বন্দেগী বা ইবাদাতকে নানা শব্দে উপস্থাপন করেছে। কোরআন কোথাও এটাকে সরাসরি 'ইবাদাত' হিসাবে উল্লেখ করেছে, আবার কোথাও 'তাকদীস' বলেছে, কোথাও 'তাস্বীহ' আবার কোথাও 'সুজুদ' শব্দে প্রকাশ করেছে। কোন কোন স্থানে 'কুনুত' শব্দেও বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ফেরেশ্তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুই আল্লাহর এবং যেসব ফেরেশতাগণ তাঁর নিকটে রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করছে। বন্দেগী করার ভেতরে কোন ধরনের ত্রুটি করছে না। তারা রাত দিন তাঁর প্রশংসা কীর্তনে মাথানত করে কোন ধরনের শৈথিল্য ছাড়াই আল্লাহর আনুগত্য করছে।'

ফেরেশ্তাদের মানুষের ন্যায় বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, তারা বিরামহীনভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে যাচ্ছে। কত সংখ্যক ফেরেশ্তা আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন, তার কোন পরিসংখ্যান জানার কোন উপায় মানুষের কাছে বিদ্যমান নেই। অসংখ্য ফেরেশ্তা সেজদায় নিয়োজিত রয়েছেন, রুকু সেজদায় রয়েছেন, দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তারা সে দায়িত্ব কোন ধরনের শৈথিল্য ছাড়াই বিরামহীন গতিতে পালন করে যাচ্ছেন। এভাবে সৃষ্টির সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর আনুগত্য করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে সৃষ্টির সমস্ত কিছুর আনুগত্যকে ইবাদাত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই ঐ মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ মহাপবিত্র শাসকের গুণ কীর্তন করছে।'

সৃষ্টিসমূহ আল্লাহর ইবাদাত করছে

সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছু আল্লাহর আনুগত্য করছে, এ বিষয়টিকে পবিত্র কোরআনে তাস্বীহ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ইউছাব্বিহু লিল্লাহি- আল্লাহর তাস্বীহ পড়ছে, ছাব্বাহা, ইউছাব্বিহু, তাছ্বিহান- অর্থাৎ তাস্বীহ পড়েছে, তাস্বীহ পড়ছে

এবং তাস্‌বীহ্ পড়বে। এই পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আকাশ ও যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই আল্লাহর তাস্‌বীহ্ পড়তে থাকবে। হযরত ইউনুছ আলাইহিস্ সালাম ঘটনাক্রমে মাছের পেটে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জীবিত থাকবেন এমন আশা ছিল না। বিশাল আকৃতির মাছ তাকে পেটে নিয়ে সাগরের অতল তলদেশে অবস্থান করছিল। তিনি মাছের পেটে গভীর অন্ধকারে অবস্থান করে শুনতে পেলেন, সমস্ত দিক থেকে মহান আল্লাহর তাস্‌বীহ্ পাঠ করা হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের ক্ষুদ্র বালুকণা, শৈবালদাম, পাথরের নুড়িসহ সমস্ত কিছু আল্লাহ্ নামের যিকির করছে। এভাবে গোটা সৃষ্টিজগত থেকেই আল্লাহ্ নামের আওয়াজ ভেসে আসছে। এই যিকির শোনর মতো কান যাদের আছে, তাঁরা শুনতে পান। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ-وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ-

সাত আকাশ–যমীন এবং তার মধ্যে যতসব বস্তু আছে–সকলেই আল্লাহর তসবীহ্ পড়ছে। এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রশংসা-স্তুতির সাথে তাঁর তসবীহ্ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পারো না। (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৪)

এ আয়াতেও তসবীহ শব্দ দিয়ে সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু যে ইবাদাতে রত রয়েছে-আনুগত্য করছে, তা বুঝানো হয়েছে। সূর্য-চন্দ্র, বৃক্ষ, তরু-লতা আল্লাহর বন্দেগী, দাসত্ব বা আনুগত্য করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ-وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ-

চন্দ্র-সূর্য সবাই পরিক্রমণে নিয়োজিত। তারকামালা ও বৃক্ষরাজি আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে আছে। (সূরা রাহ্‌মান-৫-৬)

এ আয়াতে ইয়াছজুদান শব্দের মাধ্যমে প্রকৃতির সকল বিষয়ের আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। উদ্ভিদরাজি আল্লাহর তসবীহ্ পাঠ করছে। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অকারণে বৃক্ষের পত্র-পল্লব ছিন্ন করবে না। কারণ বৃক্ষের পত্র-পল্লব আল্লাহর তসবীহ্ পাঠে রত রয়েছে।' প্রয়োজনে গাছ কাটা যেতে পারে, কিন্তু অকারণে তার পাতা ছেঁড়া যাবে না। গোটা প্রকৃতি আল্লাহর আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব, পূজা-উপাসনা করছে এ বিষয়টি পবিত্র কোরআন 'কুনুত' শব্দ দিয়েও উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ্ ছুব্‌হানাহু তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ-

আকাশ ও পৃথিবীতে যতো কিছু রয়েছে, তা সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর সবকিছুই তাঁর আদেশের অনুগত। (সূরা রূম-২৬)

এই পৃথিবী পৃষ্ঠের সামান্য একটি ধূলিকণা থেকে শুরু করে ঐ তুষার আবৃত অটল অচল হিমাদ্রী, মহাশূন্যের কোয়াশার, বিশাল আকৃতির অদৃশ্য দানবীয় ব্লাকহোল, ছায়াপথ আল্লাহর গোলামী করছে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ঐ আল্লাহর নির্দেশেই নিয়মিত হয়ে চলেছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত, জোয়ারের টানে এই লবণাক্ত পানি নদীর মিষ্টি পানির সাথে মিশে যায়। আবার ভাটির টানে নদীর মিষ্টি পানি সমুদ্রের লবণাক্ত পানির সাথে মিশে যায়। এর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অথচ লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির ভেতরে মিশ্রিত হয়ে মিষ্টি পানির মৌলিক গুণাগুণ পরিবর্তন করতে পারে না। আবার মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির মধ্যে মিশ্রিত হয়ে লবণাক্ত পানির মৌলিক গুণাগুণ নষ্ট করে দিতে পারে না। রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে আবর্তিত হচ্ছে। সময়ের যে মুহূর্তে পৃথিবীর যে এলাকায় রাত অবস্থান করে, সেই মুহূর্তে সেখানে দিনের আলো প্রকাশিত হয়না। আবার যেখানে যে মুহূর্তে দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেখানে রাতের ঘন কালো অন্ধকার ছেয়ে যায় না। এসব কিছু আল্লাহর ইবাদাত করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَاَ اَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে অতিক্রম করে, রাতের ক্ষমতা নেই দিনকে অতিক্রম করে; এসব কিছুই মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৪০)

আল্লাহর নিয়ম অপরিবর্তনীয়

আল্লাহ রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্যের প্রতি যে দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তারা কোন ধরনের বিশ্রাম ব্যতীতই পালন করে যাচ্ছে। পবিত্র কোরআন বলছে, ইলা আজালিম্ মুছাম্মা–অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা এভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকবে। তারপর একদিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ যে জিনিসকে যেভাবে ইবাদাত করার আদেশ দিয়েছেন, গোটা প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসই সেভাবেই ইবাদাত করে যাচ্ছে। নারকেল গাছ কখনো তাল দেবে

www.pathagar.com

না, আম গাছ কখনো লিচু দেবে না। কাঁঠাল গাছ কখনো বেল দেবে না। গোটা প্রকৃতি জুড়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তার পরিবর্তন কখনো হবে না−হতে পারে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন−

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً

আল্লাহর নিয়ম−যা পূর্ব থেকেই কার্যকর রয়েছে, আর কখনও আল্লাহর এ নিয়মে কোন ধরনের পরিবর্তন দেখবে না। (সূরা ফাতাহ্)

অর্থাৎ আমার প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে, আমার Law of nature−এর মধ্যে কখনো কোন পরিবর্তন হবে না। এমনটি হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে। কিন্তু সেই ব্যক্তি তার মুখের যে জিহ্বা দিয়ে মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে, সেই জিহ্বাও আল্লাহর ইবাদাত করছে। কিভাবে করছে−জিহ্বার প্রতি মহান আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন, তার কাজ হচ্ছে যে বস্তুর যে স্বাদ তা গ্রহণ করে জিহ্বা ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুভূতির ভেতরে তা সঞ্চারিত করা। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ব্যক্তি যে জিহ্বা ব্যবহার করে উচ্চারিত করলো, 'আল্লাহ নেই' সেই ব্যক্তি যদি তার জিহ্বার ওপরে কোন তিক্ত, কটু বা অম্ল জাতিয় বস্তু রেখে আদেশ দিল, এই বস্তুগুলোর প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করে তা আমার অনুভূতিতে সঞ্চারিত করতে পারবে না।' অথবা বস্তু তার প্রকৃত স্বাদ সঞ্চারিত না করে ভিন্ন স্বাদ তাকে সঞ্চারিত করবে−এ ধরনের কোন আদেশ কি জিহ্বা পালন করবে?

নাস্তিক ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগের স্থলে অর্থাৎ টয়লেটে প্রবেশ করে তার ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় নাসিকার প্রতি লক্ষ্য করে গুরু গম্ভীর স্বরে আদেশ করলো, 'দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি আমার হাত দিয়ে নাক চেপে ধরার মতো কাজটি করতে অস্বস্তি বোধ করছি। সুতরাং তুমি দুর্গন্ধ গ্রহণ করে আমার অনুভূতিতে ছড়িয়ে দিবে না, পারলে তা সুগন্ধিতে পরিণত করে আমার অনুভূতিতে ছড়িয়ে দাও।'

এভাবে দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি যত আদেশই দেয়া হোক না কেন, শরীরের কোন একটি অঙ্গই তাতে সাড়া দেবে না। কারণ তারা শরীরের অধিকারী ব্যক্তির ইবাদাত করে না, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মহান আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রয়েছে। যাকে যে ক্রিয়া সম্পাদনের আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা তাই পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতি যে ইবাদাত করে যাচ্ছে, যে আনুগত্য প্রদর্শন করছে, তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। এভাবে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই মহান আল্লাহর ইবাদাত,

www.pathagar.com

দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা করার মাধ্যমে জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে অঙ্গুলী সংকেত করছে–আল্লাহ্ আছেন এবং আমরা যেভাবে তাঁর গোলামী করছি, তোমরাও সেভাবে আল্লাহ্র গোলামী করো।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কোন শক্তির আনুগত্য করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বা জন্মগত স্বভাব। গোটা সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করে এবং তা একটি নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, আনুগত্য করছে তা অবলোকন করে মানুষের মনে অবচেতনভাবেই সুপ্ত আনুগত্যের প্রবণতা জাগরিত হয়েছে। যারা প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে বা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে, তারা দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান কোন শক্তিকে স্রষ্টা বা স্রষ্টার প্রতিনিধি অনুমান করে তার পূজা-উপাসনায় নিয়োজিত হয়েছে। এভাবে কেউ বিশাল আকৃতির গাছের, অগাধ জলধীর, সূর্য-চন্দ্রের, নিজ হাতে নির্মিত মৃত্তিকা মূর্তির, তারকামালার, পশু-প্রাণীর এবং পৃথিবীর মাটিকে নিজের মা মনে করে পূজা-উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। পূজা-উপাসনা করতে করতে মানুষ এতটা নীচের স্তরে নেমে গিয়েছে যে, দেহের প্রধান প্রজনন অঙ্গকে শক্তির প্রতীক মনে করে সেটারও পূজা মানুষ করছে। মানুষ এসবকে নিজের ইলাহ মনে করে তার পূজা-অর্চনা করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন–

إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ–

আমি-ই আল্লাহ্। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং, তুমি কেবল আমারই ইবাদাত করো। (সুরা ত্বা-হা-১৪)

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি আনুগত্য করা

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি আনুগত্য করা। কিন্তু আনুগত্যের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষ নিজের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এসব প্রাকৃতিক শক্তিকে ইলাহ্ মনে করে তার আনুগত্য, পূজা-উপাসনা করে থাকে। চিন্তা করে দেখে না, এসবের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। তারা যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, যাদেরকে তারা শক্তির উৎস মনে করে পূজা-উপাসনা, আনুগত্য করছে, তারাও তেমনি ঐ আল্লাহরই সৃষ্টি। এসব কিছুই ঐ মহান আল্লাহর আনুগত্য করছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যার পূজা-উপসনা, আনুগত্য করছে, তারাও তাদেরই অনুরূপ আমার গোলাম। (সূরা আল আরাফ-১৯৪)

www.pathagar.com

অর্থাৎ তোমরা যাকে ইলাহ্ মনে তার আনুগত্য করছো, বন্দেগী করছো, ইবাদাত করছো, ওটাও আমারই ইবাদাত করছে এবং তুমি যেমন আমার গোলাম, তুমি যার ইবাদাত করছো, সেটাও আমারই গোলাম। সুতরাং আমার সৃষ্টির গোলামী ত্যাগ করে আমার গোলামী করো। তোমরা যাদেরকে ডাকছো, তারা এ সংবাদ পর্যন্ত জানে না যে, তোমরা তাকে ডাকছো এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা তোমাদের ডাকের সাড়া দিতে পারবে না। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّايَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ–

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে–এ সংবাদ পর্যন্ত যাদের জানা নেই। (সূরা আহ্কাফ-৫)

আনুগত্য প্রবণতার কারণে একশ্রেণীর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের আনুগত্য বা ইবাদাত করে থাকে, তারা মানুষের কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করতে সমর্থ নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ–

এবং তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের কল্যাণ অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। (সূরা ইউনুস-১৮)

একশ্রেণীর নির্বোধ মানুষ যাদের আনুগত্য, ইবাদাত করে থাকে, তারা কোন ক্ষতিও করতে পারে না, আবার কোন উপকারও করতে পারে না। এদের ওপরে যদি একটি মাছিও বসে, এরা সে মাছিকেও তাড়িয়ে দিতে অক্ষম। আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا–

বলো! তোমরা কি আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত পূজা-উপাসনা করছো? যারা না পারে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে, না পারে কোন উপকার করতে। (সূরা মায়েদাহ্-৭৬)

একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারো কোন কল্যাণ-অকল্যাণ সাধিত হতে পারে না। যেহেতু তিনিই মানুষের প্রতিপালক। তাঁরই গোলামী করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

www.pathagar.com

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ–

সে আল্লাহই তোমাদের রব্ব ! তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি সমুদয় বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করো এবং তিনি সব জিনিস সম্পর্কে যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। (সূরা আনআম-১০২)

মানুষ যাদেরকে আনুগত্য, বন্দেগী, গোলামী ও ইবাদাত লাভের যোগ্য মনে করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি হয়ে আরেক সৃষ্টির দাসত্ব-গোলামী করা নির্বুদ্ধিতা বৈ আর কিছু নয়। একশ্রেণীর মানুষ আগুনকে শক্তির প্রতীক মনে করে তার পূজা করে থাকে। অথচ সেই আগুনের ভেতরে যখন মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো তখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিজেকে আগুনে ফেলে দেয়ার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, তিনি যে আল্লাহর গোলামী করেন, এই আগুনও সেই আল্লাহরই গোলাম। আগুনকে যদি আল্লাহ আদেশ করেন, তাহলে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করতে পারে। আর আল্লাহ্ যদি আগুনকে আদেশ না করেন, তাহলে আগুনের ক্ষমতা নেই তার দেহের একটি পশমকে পুড়িয়ে দেয়। সেই চরম মুহূর্তে আল্লাহর ফেরেশ্তাগণ এসে তাঁকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল, এক আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হযরত ইবরাহীম (আঃ) ফেরেশ্তাদের সাহায্য প্রস্তাব বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, আল্লাহ্ আগুনকে আদেশ দিলেন ইবরাহীমের প্রতি আরামদায়ক হয়ে যাওয়ার জন্যে, আগুন আরামদায়ক হয়ে গেল। উত্তপ্ত অগ্নিকুন্ড পরিণত হলো চিত্তাকর্ষক মনোরোম দৃশ্য সম্পন্ন পুষ্প উদ্যানে। বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বিষয়টি এভাবে প্রকাশ করেছেন–

আজ ভি হো যো ইবরাহীম কা ইমাঁ পয়দা
আগ্ কার ছাক্তি হ্যায় এক আন্দাজে গুলিস্তাঁ পয়দা।
ইবরাহীমের ঈমান যদি আজও কোথাও হয় বিদ্যমান
গড়তে পারেন অগ্নিকুন্ডে খুবসুরত এক গুলিস্তান।

অর্থাৎ এখনো যদি ইবরাহীমের মতো ঈমান কারো ভেতরে জাগ্রত হয় এবং তাকে যদি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে অগ্নিকুন্ড পুষ্প কাননে পরিণত হতে পারে। সুতরাং গোলামী করতে হবে মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'য়ালার। একজন গোলাম হয়ে আরেকজন গোলামের কাছে হাত বাড়ালে সে হাত অবশ্যই

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যাত হবে। একজন দাস আরেকজন দাসকে কিছুই দিতে পারে না। একজন পথের ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে কিভাবে ভিক্ষা দিতে পারে? সৃষ্টিজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, একটি পশু আরেকটি পশুর আইন মানে না, আনুগত্য করে না, দাসত্ব করে না, ইবাদাত করে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হয়ে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সামনে কিভাবে মাথানত করতে পারে? কিভাবে মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষের বানানো আইনের গোলামী করতে পারে? সুতরাং, বিশ্বপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ, প্রাকৃতিক আইন মানুষকে যেদিকে, যে শক্তির ইবাদাত করার জন্য নীরব নির্দেশ করছে, মানুষের স্বভাবজাত সেই আনুগত্যকে সেদিকেই প্রদর্শন করতে হবে।

আত্মার বিকাশ ও ইবাদাত

এই পৃথিবী বা সৃষ্টিজগতে ক্রিয়াশীল যে নিয়ম রয়েছে, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এসব কিছু অনুভব করার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের শ্রবণ শক্তি-দর্শন শক্তি দান করেছেন। চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا
وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মায়ের পেট থেকে (এমন এক অবস্থায়) বের করে এনেছেন যে, তোমরা (তার) কিছুই জানতে না, অতপর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও দিল দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো। (সূরা আন্ নাহ্ল- ৭৮)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দান করেছি। তাকে শ্রবণ শক্তি দান করেছি। দৃষ্টি শক্তিদান করেছি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি। যেনো তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় করতে পারো।

জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, চোখ, কান খেল-তামাশার জন্য দেয়া হয়নি। প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি কোন দিকে, কোন মহাশক্তির প্রতি অঙ্গুলি

নির্দেশ করছে, তা অনুধাবন করে তাঁর গোলামী-দাসত্ব করার জন্যই দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়লো, কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টার প্রতি তার দাসত্বের অঙ্গুলি সংকেত ধরা পড়লো না। এই কান দিয়ে মানুষ প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু শুনলো, কিন্তু মহান আল্লাহর আহ্বান সে শুনলো না, তার কানে মহাসত্যের ডাক প্রবেশ করলো না।

যে জ্ঞান মানুষকে দেয়া হলো, সে জ্ঞান প্রয়োগ করে সে দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলো, মানুষ যেন শকুনের থেকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দূর-বহু দূরের বস্তু দর্শন করতে সক্ষম হয়। সে আকাশ যান আবিষ্কার করলো যেন পাখির চেয়ে দ্রুত গতিতে মহাশূন্যে উড়তে পারে। স্থলপথে দ্রুত যান আবিষ্কার করলো যেন সে চিতা বাঘের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে পারে। সে সাবমেরিন আবিষ্কার করলো যেন মহাসাগরের অতল তলদেশে মাছের থেকেও দ্রুত গতিতে চলতে পারে।

মৃত্তিকা গভীরে কোথায় কি অবস্থান করছে, শতকোটি দূরে মহাশূন্যে কোন গ্রহের কি অবস্থা, তা পর্যবেক্ষণ করছে, মহাশূন্যে উড়ন্ত পাখী যেখানে পৌছতে সক্ষম নয়, মানুষ সেখানে তার গর্বিত পদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে–অথচ তার আত্মার বিকাশ সাধনে সে চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে। এক আল্লাহর আনুগত্যের, দাসত্বের, গোলামীর মাধ্যমে মানুষের আত্মার বিকাশ সাধিত হয়, মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় এবং এটাই মানব জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত সাফল্য–এই ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যর্থতার গ্লানী বহন করছে। আল্লাহর গোলামীর মাধ্যমে মানুষের মনুষত্ব বিকশিত হতে না দেখে কবি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

মুঝে ইয়ে ডর হ্যায় কে দিলে জিন্দা তু না মর যা–য়ে
কে জিন্দেগানী ইবারাত হ্যায় তেরে জিনেছে।

হে আমার জাগরিত আত্মা, আমি তোমার অপমৃত্যু ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করছি। সত্যই যদি তোমার অপমৃত্যু ঘটে, তাহলে আমার জীবিত থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই।

বর্তমানে আমরা আমাদের আত্মার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কোন ভূমিকা পালন করছি না। আমাদের অসাবধানতার কারণে, আমাদের অসচেতনতা–অবহেলার কারণে জীবন্ত আত্মার অপমৃত্যু ঘটছে। মানুষ তার দেহের সৌন্দর্য বর্ধিত করার লক্ষ্যে অসংখ্য উপকরণ আবিষ্কার করেছে। পোষাক-পরিচ্ছদের উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিদিন নিত্য-নতুন ফ্যাশন বের করছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকশিত করার লক্ষ্যে আত্মার উন্নতি সাধন করার জন্য কোন ধরনের প্রচেষ্টা নেই। মানুষকে হৃদয় দেয়া হলো, চোখ-কান

www.pathagar.com

দেয়া হলো, চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দেয়া হলো, এসব প্রয়োগ করে তারা বস্তুগত উন্নতি সাধন করলো। অথচ প্রধান যে দিকটির উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে এসব দান করা হয়েছিল, সেদিকে তারা দৃষ্টিপাত করলো না। যারা এ ধরনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, পবিত্র কোরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ -

এরা সব চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। (সূরা আরাফ)

কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব তথা আত্মার বিকাশ সাধিত হলে মানুষ তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজের আত্মার পরিচিতি যখন লাভ করে, তখন সে তার প্রতিপালকের পরিচয়ও অবগত হতে পারে। কিন্তু আত্মাকে চেনা বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে মানুষের কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। এ জন্যই পবিত্র কোরআন এই শ্রেণীর মানুষকে পশুর সাথে তুলনাই শুধু করেনি, পশুর থেকেও অধম হিসাবে উপস্থাপন করেছে। কারণ এক শ্রেণীর মানুষ তার মনিবের পরিচয় না জানলেও পশু তার মনিবের পরিচয় জানে। কুকুর তার মনিবকে চিনে এবং মনিবের আদেশ পালনে তৎপর থাকে। অথচ একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহকে চিনে না, তাঁকে অস্বীকার করে। সুতরাং ঐ অস্বীকারকারী মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণীর সম্মান ও মর্যাদা মনিবের কাছে অনেক বেশী।

মানবাত্মার খাদ্য

মানুষের আত্মা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে বিকশিত হবে, তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ এই আত্মার অবস্থান, তার আকার-আকৃতি সম্পর্কে মানুষ অবগত নয় এবং সে জ্ঞানও মানুষের নেই। সুতরাং যে জিনিস সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক কোন জ্ঞান নেই, সেই জিনিসের উন্নতি ও বিকাশ সাধন মানুষ করবে কিভাবে?

এ জন্য আত্মার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আত্মার যিনি স্রষ্টা–যিনি আত্মার আকার-আকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন, তিনিই পদ্ধতি দান করেছেন। একটি বিষয়ের প্রতি মানুষকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষসহ জীবকুলের জীবিত থাকার প্রয়োজনে, জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অসংখ্য খাদ্য উপকরণের একটিও মহাশূন্যে পাওয়া যাবে না। সমস্ত খাদ্য পাওয়া যায় জল-স্থলে। খাদ্যসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রই হলো পানি আর মাটি। কারণ মানুষের দেহ নির্মিত হয়েছে মাটির সার-নির্যাস থেকে। যা দিয়ে দেহ নির্মিত হয়েছে, দেহের প্রয়োজনে তা থেকেই উৎপাদিত খাদ্য দেহ গ্রহণ করে দেহের উন্নতি সাধিত হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু দেহের চালিকা শক্তি হলো আত্মা বা রুহ্। এই রুহ্ মাটির সার-নির্যাস দিয়ে প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে মাটি থেকে উৎপাদিত কোন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রুহের নেই। মৃত্তিকা থেকে রুহ্ আহরোণ করে দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়নি, এ জন্য মাটিতে উৎপাদিত কোন খাদ্য দ্বারা রুহের বিকাশ সম্ভব নয়। যেখান থেকে রুহ্ মানব দেহে প্রেরণ করা হয়েছে, সেই স্থান থেকেই রুহের খাদ্যও প্রেরণ করা হয়েছে। রুহ্কে এই খাদ্যদান করলেই কেবল রুহ্ বিকশিত হয় তথা মনুষ্যত্বের উন্নতি সাধন হয়। এই রুহ্ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার কোন শেষ নেই। আল্লাহর রাসূলকেও রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবতীর্ণ করলেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ-قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً-

এরা আপনাকে রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দিন, এই রুহ্ আমার রব-এর আদেশে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো। (সূরা বনী ইসরাঈল)

এই রুহ্কে বিকশিত করার জন্য এর খাদ্য প্রয়োজন। রুহ্ আল্লাহর আদেশে আগমন করেছে আলমে আরওয়াহ্ থেকে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার খাদ্যও প্রেরণ করেছেন লৌহ মাহ্ফুজ থেকে। লৌহ মাহ্ফুজ থেকে প্রেরিত রুহের সেই খাদ্যের নাম হলো কোরআন। এই কোরআন সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভরে তেলাওয়াত করতে হবে, এর আদেশ-নিষেধ একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করতে হবে। রুহের খাদ্যই হলো আল্লাহর কোরআন। দেহকে খাদ্যদান না করলে দেহ যেমন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে, কর্মের উপযোগী আর থাকে না, তেমনি আত্মাকেও খাদ্যদান না করলে আত্মা দুর্বল নির্জীব হয়ে পড়ে। বাহন হিসাবে বা কৃষি কাজের জন্য যারা চতুষ্পদ জন্তু ব্যবহার করে, এসব জন্তুকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদান করতে হয়। নতুবা জন্তু কর্ম উপযোগী থাকে না। খাদ্যদান না করে জন্তুকে কর্মে নিয়োগ করলে জন্তু অক্ষমতার পরিচয়ই দিবে।

তেমনিভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও আত্মার উন্নতিকল্পে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য না দিলে সে নিজেকে এবং তার বাহন দেহকে কিভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত করবে? আত্মাকে তার প্রকৃত খাদ্য না দিলে আত্মা কি নিজেকে বিকশিত করতে পারে না? অবশ্যই পারে। মানুষ যেমন তার প্রকৃত খাদ্য না পেলে বা দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার লোকজন অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করে

www.pathagar.com

নিজেদেরকে দুর্বল করে, তেমনি আত্মা তার প্রকৃত খাদ্য লাভ না করলে অখাদ্য কুখাদ্য আহার করবে অর্থাৎ আত্মা কদর্য রূপে গর্হিত পথে ধাবিত হবে। আত্মার প্রকৃত খাদ্য কোরআন যদি সে লাভ করতো, তাহলে সে নিজেকে বিকশিত করতো সুন্দর ও কল্যাণের পথে। সে আত্মার দ্বারায় পৃথিবীতে মানবতার কল্যাণ সাধিত হতো। গোটা পৃথিবী জান্নাতের এক উদ্যানে পরিণত হতো।

কোরআন নামক খাদ্য লাভকারী আত্মা সুন্দর আর কল্যাণের সুষমায় বিকশিত হয়ে শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন মুক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ, ভীতিহীন সুখী সমৃদ্ধশালী এক পৃথিবী মানবতাকে উপহার দিতে সক্ষম হতো। ইসলামের সোনালী যুগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সে সময়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের শাসকগোষ্ঠী পর্যন্ত সবাই দেহকে অতিরিক্ত খাদ্য দিয়ে স্ফিত না করে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্ট করতেন। ফলে তারা পৃথিবীতে সত্য আর কল্যাণের পতাকা উড্ডিন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুদূর অতীতে এবং বর্তমানেও যারা আত্মাতে তার প্রকৃত খাদ্য না দিয়ে দেহকে বৈধ-অবৈধ খাদ্য দিয়ে স্ফিত করেছে বা করছে, তারা সত্য, সুন্দর আর কল্যাণের হন্তারক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপী শোষণ, নির্যাতন আর অশান্তির দাবানল বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এসব আত্মা প্রকৃত খাদ্য যখন লাভ করছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই আত্মা অখাদ্য আর কুখাদ্য লাভ করে অন্যায় অসুন্দরের পথেই ধাবিত হচ্ছে।

এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে আশে-পাশে বিচরণশীল মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে–অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআনের বিধান অনুসারে চলে, তারা সত্য সুন্দর আর কল্যাণ পিয়াসী। আর যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে না–অর্থাৎ কোরআনের বিপরীত পথে চলে, তারা সত্য সুন্দর কল্যাণের হন্তারক, অশান্তি সৃষ্টিকারী, অরাজকতা সৃষ্টিকারী ও মানবতার ধ্বংস সাধনকারী। এই কোরআনই আত্মার একমাত্র উৎকৃষ্ট খাদ্য। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব এনে দিয়েছি যাকে আমি জ্ঞান-তথ্যে সুবিস্তৃত বানিয়েছি এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। (সূরা আল আ'রাফ-৫২)

www.pathagar.com

এই কোরআন মানুষকে নিরাময়তা দান করে। কলুষিত আত্মাকে সুন্দর শুভ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মার কলুষ-কালিমা দূর করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

আমি এই কোরআন নাজিল প্রসঙ্গে এমন কিছু নাজিল করি যা ঈমানদারদের জন্য নিরাময়তা ও রহমত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২)

এই কোরআন মানুষকে সত্য সহজ সরল পথপ্রদর্শন করে। মানুষকে নিরাময়তা দান করে প্রকৃত সত্যে উপনীত করে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ–

এদের বলো, এই কোরআন ঈমানদার লোকদের জন্য তো হেদায়াত ও নিরাময়তা। (সূরা হামীম সিজ্‌দা)

এই কোরআন মানুষের আত্মাকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্যবোধ শিক্ষা দেয়। কোরআন প্রদর্শিত পথে যে আত্মা ধাবিত হয়, সে আত্মার দ্বারাই পৃথিবীতে মানবতা বিকশিত হয়। সুতরাং কোরআন তেলাওয়াত করে এবং এর বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে আত্মাকে বিকশিত করতে হবে, তাহলেই কেবল ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা সম্ভব হবে।

ইবাদাতের তাৎপর্য

ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। এই ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাতের মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ–

(হে রাসূল!) আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাত করো। (সূরা যুমার-২)

এ আয়াতে আল্লাহ্র ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সে ইবাদাত হতে হবে এমন, যা আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ আয়াতে ইবাদাত শব্দের পরে দীন শব্দের ব্যবহার করে এ কথাই দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ইবাদাত বা দাসত্বের সাথে মানুষ যেন আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত না করে, বরং সে যেন একমাত্র আল্লাহ্রই পূজা-উপাসনা,

www.pathagar.com

বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্ব করে। একমাত্র তাঁরই আদেশ অনুসরণ করে। ইবাদাত তো কেবল তারই করা যেতে পারে, যিনি অসীম শক্তিশালী এবং অক্ষয়-চিরঞ্জীব। যা ভঙ্গুর এবং ক্ষণস্থায়ী তার ইবাদাত করা যেতে পারে না। কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (সূরা মুমিন- ৬৫)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহই হলেন বাস্তব ও প্রকৃত সত্য। তিনি অনন্ত এবং অনাদি। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর সত্তা ব্যতিত আর কারো সত্তাই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। সমস্ত কিছুর অস্তিত্বই আল্লাহ প্রদত্ত, মরণশীল ও ধ্বংসশীল। সুতরাং ইবাদাত হতে হবে একমাত্র সেই সত্তার জন্য, যিনি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ তাঁরই ইবাদাত করবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তাঁরই আদেশ অনুসরণ করবে এবং তাঁরই আনুগত্য করবে।

এই ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে বলেই বর্তমানে মানুষ ইবাদাত বলতে শুধু কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মকেই একমাত্র ইবাদাত বলে মনে করেছে। নামাজ আদায় করা যেমন ইবাদাত তেমনি নামাজ আদায় না করাও ইবাদাত। রোজা পালন করাও ইবাদাত এবং রোজা পালন না করাও ইবাদাত। নামাজ সঠিক ওয়াক্তে আদায় করার নাম ইবাদাত। আবার নিষিদ্ধ সময়ে অর্থাৎ সূর্য উদয়ের সময়, অস্তের সময় এবং সূর্য ঠিক যখন মাথার ওপরে অবস্থান করে, এ তিন সময়ে নামাজ আদায় না করাও ইবাদাত। এই তিন সময়ে সিজ্‌দা করা জায়েয নেই, হারাম করা হয়েছে। সক্ষম হলে গোটা বছর রোজা পালন করলে ইবাদাত হবে, কিন্তু বছরে পাঁচ দিন রোজা পালন না করা ইবাদাত। এই পাঁচ দিন রোজা পালন হারাম করা হয়েছে।

মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মই ইবাদাত

মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মকেই ইবাদাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মানুষের চোখের চাওনি-এটাও ইবাদাতে পরিণত হতে পারে। এই চোখের দৃষ্টি দিয়ে কোন সন্তান যদি তাঁর গর্ভধারিণী মাতা ও জন্মদাতা পিতার দিকে পরম মমতাভরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আল্লাহর রাসূল বলেন, সে সন্তানের আমলনামায় একটি কবুল

www.pathagar.com

নফল হজের সওয়াব লেখা হবে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জানতে চেয়েছেন, কোন সন্তান যদি প্রতিদিন একশত বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে কি সে একশত কবুল নফল হজের সওয়াব লাভ করবে?

আল্লাহর রাসূল জবাব দিলেন, তোমরা জেনে রেখো, মহান আল্লাহর রাহমতের ভান্ডার অফুরন্ত। আল্লাহর কোন বান্দাহ্ যদি প্রতিদিন তার মাতা-পিতার দিকে একশত বার মমতা আর শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে বান্দার আমলনামায় প্রতিদিন একশত কবুল নফল হজের সওয়াব লেখা হবে।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মই ইবাদাত। উঠা বসা, হাঁটা-চলা, কথা বলা, কথা শোনা, দাঁড়ানো, ঘুমানো, আহার, বিশ্রাম, মলমূত্র ত্যাগ, স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য ব্যবহার করা, সন্তান প্রতিপালন করা, চাকরী করা, ব্যবসা করা, শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করা, যুদ্ধ করা, যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা, আন্দোলন সংগ্রাম করা, নেতৃত্ব দেয়া, কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করা, বিচার-মীমাংসা করা, দেশ শাসন করা, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা, জনসেবা করা, কল্যাণকর কোন কিছু আবিষ্কার করা তথা যে কোন ধরনের বৈধ কর্মকান্ড করাই হলো ইবাদাত। শর্ত শুধু একটিই যে, সমস্ত কর্ম হতে হবে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়। এ জন্যই সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে, আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব বা ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

আরবী না'বুদু শব্দের মধ্যে দুটো কাল রয়েছে। একটি বর্তমান কাল এবং অন্যটি ভবিষ্যৎ কাল। নামাজের মধ্যে বান্দাহ্ ইয়্যা কানা'বুদু বলে এ কথারই স্বীকারোক্তি করে যে, আমি তোমার আদেশে এখন নামাজ আদায় করছি। ক্ষণপূর্বে আমার জন্য যেসব কাজ হালাল ছিল, নামাজের মধ্যে আমার জন্য সেসব হালাল কাজগুলো হারাম হয়ে গিয়েছে। তোমার দেয়া বৈধ খাদ্যগুলো আমার জন্য আহার করা বৈধ ছিল, নামাজ আদায়ের সময়ে তোমার আদেশে সে বৈধ খাদ্য গ্রহণ করা আমি আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি। তুমি আমাকে বাকশক্তি দান করেছো, আমার জন্য কথা বলা বৈধ ছিল। আমি এইক্ষণে তোমার আদেশ অনুসারে কথা বলা হারাম করে দিয়েছি। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে দৃষ্টিশক্তি দান করেছো। চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করা আমার জন্য বৈধ ছিল। নামাজ আদায়ের এই মুহূর্তে এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা তোমার আদেশে আমি আমার জন্য হারাম ঘোষণা করে তা থেকে বিরত রয়েছি। আমি আমার জন্য চিরস্থায়ী হালাল বিষয়গুলো নামাজ আদায়ের মুহূর্তে স্বল্প সময়ের জন্য যেমন তোমার আদেশে হারাম করেছি, তেমনি তুমি যে বিষয়গুলো চিরস্থায়ীভাবে হারাম করে দিয়েছো, নামাজের বাইরে আমি আমার জীবনে সে বিষয়গুলোও হারাম ঘোষণা করবো।

www.pathagar.com

ইয়্যা কানা'বুদু–বলে বান্দাহ তাঁর আল্লাহর কাছে বর্তমান কালে যা করছে এবং ভবিষ্যতে কি করবে, সে কথারই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। অর্থাৎ যেভাবে তোমার আদেশে নামাজ আদায় করছি, নামাজের বাইরের জীবনও তোমারই আদেশ অনুসারেই পরিচালিত করবো। আল্লাহকে সিজ্‌দা দিলেই সওয়াব লাভ কার যায়। কিন্তু আল্লাহর দেয়া নিয়ম হলো, নামাজের এক রাকাতের মধ্যে সিজদা দিতে হবে দুটো। কোন ব্যক্তি যদি দুটো সিজদার পরিবর্তে অধিক সওয়াবের আশায় পাঁচ ছয়টি সেজদা দেয়, তাহলে তার নামাজই হবে না। ফজরের ফরজ নামাজ দুই রাকাত আদায় করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি দুই রাকাতের স্থলে চার রাকাত আদায় করে তাহলে তা ইবাদাত হবে না।

এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি যদি যোহরের ফরজ নামাজ চার রাকাতের স্থলে ছয় রাকাত আদায় করে, মাগরিবের ফরজ নামাজ তিন রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত আদায় করে, তাহলে সে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর আইন লংঘন করেছে বলে বিবেচিত হবে এবং সে হবে আল্লাহদ্রোহী। যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করাই হলো ইবাদাতের সঠিক তাৎপর্য। এই তাৎপর্য অনুধাবন করেই আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদাত করতে হবে।

মানুষ নামাজ আদায় করে যার আদেশে, সে তার গোটা জীবন পরিচালিত করবে একমাত্র তাঁরই আদেশে। যাঁর আদেশে নামাজ আদায় করা হচ্ছে, তাঁরই আদেশে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত হবে। নামাজে সেজ্‌দা দেয়া হচ্ছে যাঁর আদেশে, একমাত্র তাঁরই আদেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, স্বরাষ্ট্র নীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প-বাণিজ্য নীতি পরিচালিত হবে। নামাজ যাঁর আদেশে আদায় করা হচ্ছে, দেশের সরকার ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট একমাত্র তাঁরই আদেশ অনুসারে পরিচালিত হতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা হবে। এগুলো যদি না হয়, তাহলে এই অসম্পূর্ণ ইবাদাত দিয়ে সফলতা আশা করা বৃথা।

সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে আনুগত্যের মস্তক নত করে দিতে হবে ঐ মহান আল্লাহর সামনে–যিনি সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর পরিচালক, শাসক ও প্রতিপালক। আল্লাহর ওপরে বান্দার যেমন হক রয়েছে, তেমিন রয়েছে বান্দার ওপরে আল্লাহর হক। আল্লাহর রাসূল বলেন, বান্দার ওপরে আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দাহ্ কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব বা ইবাদাত করবে, এই ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাত মিশ্রিত করবে না, ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন শিরক করবে না। গোলামী, বন্দেগী, ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর। এটাই হলো বান্দার ওপরে আল্লাহর হক।

www.pathagar.com

আর আল্লাহর ওপরে বান্দার হক হচ্ছে, সেই ইবাদাতকারী আবেদ বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়ে জান্নাত দান করবেন।

বন্দেগী ও দাসত্বের ক্ষেত্রে ইবাদাত

আল্লাহর বিধান এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করে কোন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, আইনবিদের বিধান ও নেতৃত্ব অনুসরণ করা এবং এসব চিন্তাবিদগণকে বা নেতাদেরকে মৌখিকভাবে আল্লাহর শরীক বলে ঘোষণা না দিলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাদেরকে শরীক করারই শামিল। বরং এসব ব্যক্তিত্বদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেও যদি আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় তাদের বানানো আইন-বিধানের আনুগত্য করা হয়, তাহলেও আনুগত্যকারী শির্কের অপরাধে অভিযুক্ত হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় যেসব মানুষ ভিন্ন বিধান অনুসরণ করতে আদেশ দেয়, অনুপ্রাণিত করে, কোরআন এদেরকে শয়তান হিসাবে ঘোষণা করেছে। অথচ মানুষ শয়তানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে থাকে। এভাবে অভিশাপ দেয়ার পরও যারা এসব মানুষরূপী শয়তানদের অনুসরণ করবে, কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছে—তোমরা শয়তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছো। এই শির্‌ককে বিশ্বাসগত শির্‌ক না বলে বলা হয় কর্মগত শির্‌ক। এই ধরনের কর্মগত শির্‌ক যারা করছে, কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হবে এবং এদের সম্পর্কে কোরআন বলছে—

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا-

যেদিন তিনি (এদের) বলবেন, তোমরা তাদের ডাকো যাদের তোমরা (আমার) শরীক মনে করতে, ওরা তাদের ডাকবে কিন্তু তারা তাদের এ ডাকে কোনোই সাড়া দিবে না, আমি এদের উভয়ের মাঝখানে এক (মরণ) ফাঁদ রেখে দিবো। (সূরা কাহ্‌ফ- ৫২)

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, যেমন প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এই লক্ষ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রণয়ন করে নেতৃবৃন্দ এবং দলের কর্মীরা তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ময়দানে তৎপরতা চালায়। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, কর্মীরা ময়দানে তাই পালন করে। এখন এসব নির্দেশ যদি ইসলামের বিপরীত হয় এবং কর্মীরা যদি তা পালন করে, তাহলে

www.pathagar.com

তারা পরোক্ষভাবে ঐ দলের নেতৃবৃন্দকেই নিজেদের প্রভু বলে মেনে নিল এবং তারা নেতৃবৃন্দের ইবাদাত করলো। অথচ এই কর্মীরা মুখে আল্লাহকেই প্রভু বলে স্বীকার করে। এটাই হলো কর্মগত শির্ক। এই শির্ক থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান যারা দিল, তারাই হলো তাগুত। এদের বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করার জন্যই কোরআন মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। কোরআন বলছে–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِا لطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-لاَ انْفِصَامَ لَهَا-

যারা তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা এমন শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে যে, যা কখনোই ছিঁড়ে যাবার নয়। (সূরা বাকারা-২৫৬)

মুখে মুখে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। প্রথমে অন্যের তথা তাগুতের আনুগত্য অস্বীকার করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে। তারপর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরই নিরঙ্কুশ আনুগত্য–ইবাদাত করতে হবে। আরবী ভাষায় কারো ফরমানের অনুগত হওয়া এবং তার ইবাদাতকারী হওয়া প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কারো বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করে সে যেন তারই ইবাদাত করে।

এভাবে ইবাদাত শব্দটির তাৎপর্যের ওপর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাঁর ছাড়া অন্য সবার ইবাদাত পরিত্যাগ করার যে আদেশ নবী-রাসূলগণ তাঁদের মহান আন্দোলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন, তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ কি ছিল তা অনুধাবন করা যায়। তাঁদের কাছে ইবাদাত নিছক কোন পূজা-উপাসনার অনুষ্ঠান ছিল না। তাঁরা মানুষকে এই আহ্বান জানাননি যে, তোমরা আল্লাহর পূজা-উপাসনা করো এবং দেশ ও জাতির নেতৃবৃন্দের বা অন্য দার্শনিক-চিন্তাবিদ বা ভিন্ন কোন শক্তির বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে থাকো। বরং তাঁরা যেমন মানুষকে আল্লাহর পুজারী হিসাবে গড়তে চাইতেন সেই সাথে সাথে আল্লাহর আদেশের অনুগতও করতে চাইতেন।

ইবাদাত শব্দের এই উভয় অর্থের দিক দিয়ে তাঁরা অন্য কারো ইবাদাত করাকে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্টতা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইবাদাত শব্দের অর্থ দাসত্ব ও আনুগত্য বুঝায় এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদদের কথায়। হযরত মুছা ও হারুন আলাইহিস্ সালামের আহ্বানের জবাবে তারা বলেছিল–

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ–

আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন লোকের প্রতি ঈমান আনবো? আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস। (সূরা মু'মিনুন-৪৭)

অর্থাৎ যে জাতিকে ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদগণ শাসন করতো, সে জাতিকে তারা নিজেদের গোলাম বা দাস মনে করতো। হযরত মুছা ও হারুন আলাহিস্ সালাম ছিলেন ফেরাউনের অধীনস্থ জাতির সন্তান। এ জন্য তারা তাদের কথার মধ্যে উল্লেখ করেছিল, এরা দু'জন নিজেদেরকে নবী হিসাবে দাবী করে নিজেদেরকে আমাদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে, এরা আমাদের মত মানুষই শুধু নয়- যারা আমাদের আইন-বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য, আমাদের আনুগত্য, বন্দেগী, গোলামী ও ইবাদাত করে–অর্থাৎ আমাদের দাস, সেই দাস সম্প্রদায়ের সন্তান এরা। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা গেল, কোন শাসকের শাসনাধীনে বাস করে শাসকের আনুগত্য করাকেও ইবাদাত বলা হয়। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামও তাঁর জাতিকে বলেছিলেন–

اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ–

তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করে চলো এবং আমার আনুগত্য করে কাজ করো। (সূরা নূহ-৩)

তিনি তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন, সমস্ত কিছুর বন্দেগী, দাসত্ব ও গোলামী সম্পূর্ণ পরিহার করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহকেই নিজের একমাত্র মা'বুদ মেনে শুধু তাঁরই পূজা, উপাসনা- আরাধনা করবে। একমাত্র তাঁরই দেয়া আইন-বিধান, আদেশ নিষেধের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো আনুগত্য করবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের ওপরে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও যেসব জাতির কাছে আল্লাহর বিধান নবী-রাসূলদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের প্রতিও একই আদেশ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন–

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ–

আর তাদেরকে এই আদেশ ব্যতীত অন্য কোন আদেশই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করবে নিজেদের দীনকে তাঁরই জন্য খালেছ করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। (সূরা বাইয়্যেনা-৫)

www.pathagar.com

ইবাদাতের পূর্ব শর্ত লক্ষ্য স্থির করা

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, সূরা ফাতিহায় বান্দাহ এ কথাটি আল্লাহর কাছে নিবেদন করলো। কিন্তু বান্দাহ্ জানে না দাসত্ব করা ও সাহায্য প্রার্থনা করার সঠিক পদ্ধতি কোনটি এবং তার ইবাদাতের লক্ষ্য কি। এ জন্য মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে বান্দাহ্কে অনুগ্রহ করে সঠিক পদ্ধতি অবগত করেছেন বান্দার ইবাদাত কাকে লক্ষ্য করে করা হবে, তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ–

তোমরা প্রতিটি ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকো, নিজের দীনকে শুধুমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। (সূরা আল আ'রাফ-২৯)

এ আয়াতে ইবাদাত ও প্রার্থনা সম্পর্কে লক্ষ্য স্থির করতে বলা হয়েছে। ইবাদাতের লক্ষ্য নির্ভুল না হলে সমস্ত ইবাদাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইবাদাতের লক্ষ্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগীর সামান্যতম অংশও যেন আল্লাহর ইবাদাতের সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। প্রকৃত মাবুদ ব্যতিত অন্য কারো প্রতি আনুগত্য, দাসত্ব, বিনয় ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা যেন কোনক্রমেই মনে স্থান লাভ করতে না পারে। পথ-প্রদর্শন, সাহায্য ও মদদ লাভ এবং সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করতে হবে। কিন্তু ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনা করার পূর্ব শর্ত হলো, নিজের দীনকে পরিপূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

জীবনের গোটা ব্যবস্থা চলবে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ অনুসারে, রাজনীতি-অর্থনীতি পরিচালিত হবে ইসলাম বিরোধী শক্তির নির্দেশ অনুসারে, আল্লাহ বিরোধী নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা হবে, আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহের দাসত্বের ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত বিভাগ চলবে আর দোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয়া হবে, এ ধরনের ইবাদাত আর দোয়া-সাহায্য প্রার্থনার সামান্যতম কোন মূল্য নেই। আর এটাই হলো ইবাদাতের লক্ষ্য ভ্রষ্টতা। এ ধরনের দ্বিমুখী ইবাদাত করা আর আল্লাহর কাছে এভাবে সাহায্য চাওয়া, 'রাব্বুল আলামীন, আমরা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, এই যমীন থেকে তোমার ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার কর্মসূচী ঘোষণা করেছি, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো-আমরা যেন আমাদের আন্দোলনে সফল হই'–সমান কথা।

www.pathagar.com

সুতরাং ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহ। তাঁরই ইবাদাত ও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। মানুষ যে কোন কাজে সফল হবার পূর্বে প্রথমে তার টার্গেট বা লক্ষ্য স্থির করে। পৃথিবীতে কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে হলেও সর্বপ্রথমে টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়। টার্গেট নির্ধারণ বা লক্ষ্য স্থির না করলে কোন কাজে সফলতা অর্জন করা যায় না। দাসত্ব, বন্দেগী, আনুগত্য, পূজা-উপাসনা, দোয়া প্রার্থনার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে, আমি কার দাসত্ব করবো এবং কার কাছে সাহায্য চাইবো। মুসলমান নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এ কথারই স্বীকৃতি দেয়, আমি লক্ষ্য স্থির করেছি–আমার দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনা হবে একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আমি একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবো এবং যে কোন প্রয়োজেন একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবো।

নামাজে এভাবে বলা হলো আর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সাহায্যের জন্য, সন্তান ও চাকরী লাভের আশায়, ব্যবসায়ে উন্নতি ও নির্বাচনে বিজয়ের লক্ষ্যে ছুটে গেল মাজারে এবং পীর-মাওলানা, জ্যোতিষী-গণকদের কাছে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, এদের ইবাদাত ও সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে কোন লক্ষ্য স্থির নেই। এরা লক্ষ্যভ্রষ্ট। অর্থাৎ কে যে এদের মাবুদ এরা কার ইবাদাত করবে এবং কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে সে ব্যাপারে এরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এ ধরনের লক্ষ্যহীন লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ–

এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী মনে করো, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না। এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রব-এর নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রাহ্‌মতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৬-৫৭)

ইবাদাত ও দোয়া প্রার্থনার ব্যাপারে মানুষ যখন লক্ষ্য স্থির করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে অসংখ্য মাবুদের গোলামী করতে থাকে। ক্ষণকালের জন্য আল্লাহর গোলামী করে, আবার পীর-অলী, মাজারের গোলামী করে, জ্বিনের গোলামী করে, নেতা-নেত্রীর

www.pathagar.com

গোলামী করে তথা অসংখ্য মাবুদের গোলামী করতে থাকে। এরা যাদের কাছে সাহায্য চায়, যাদেরকে এরা নিজেদের আশাপূরণকারী বলে মনে করে, তারা নিজের অজান্তেই এদেরকে মাবুদ বানিয়ে নেয়। আল্লাহ্ বলেন, এদের এসব মাবুদ কোন ক্ষমতাই রাখে না। এরা নিজেরাই তো আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সত্য পথের সন্ধানে রয়েছে। এরা আমার ভয়ে থরথর করে আর আমার রাহ্মত লাভের প্রত্যাশায় প্রহর অতিবাহিত করছে। সুতরাং একমাত্র আমারই দাসত্ব করো এবং আমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।

অতএব ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করার পূর্বে লক্ষ স্থির করতে হবে যে, প্রকৃতই মাবুদ, ইলাহ ও রব কে? আমি কার ইবাদাত করবো, কে আমার দাসত্ব লাভের অধিকারী, আমার আনুগত্যের লক্ষ্য কোন শক্তি, কে আমার প্রার্থনা কবুল করতে পারে এবং সাহায্য করতে পারে। এভাবে লক্ষ্য স্থির করে তারপর নিজেকে ইবাদাতে নিয়োজিত করতে হবে এবং সাহায্যের আশায় প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে লক্ষ্য স্থির করলেই, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই'–নামাজে সূরা ফাতিহায় বলা কথাটি মুসলমানের জীবনে সফলতা ও সার্থকা বয়ে আনবে।

ইবাদাতের লক্ষ্য হবেন একমাত্র আল্লাহ

মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং তিনিই মানুষের একমাত্র প্রতিপালক। এই মানুষ কার দাসত্ব করবে, কোন শক্তিকে লক্ষ্য করে মানুষ ইবাদাত করবে–এ সিদ্ধান্ত কোন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। যিনি মানুষে স্রষ্টা এবং প্রতিপালক, তিনিই কেবল সিদ্ধান্ত জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করেন, তাঁর সৃষ্টি মানুষ কার আনুগত্য, ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করবে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সে সিদ্ধান্ত অনুগ্রহ করে পবিত্র কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ–

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা। (সূরা আল বাকারা-২১)

দাসত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র লক্ষ্য হবেন আল্লাহ–তাঁর সামনেই মাথানত করতে হবে, আনুগত্যের মস্তক একমাত্র তাঁর সামনেই নত করে দিতে হবে। তাঁর দাসত্ব

www.pathagar.com

করার ব্যাপারে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে কোন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা যাবে না। সূরা নেছায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا–

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

দাসত্ব করার ব্যাপারে যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অকল্যাণের ভয়ে, কল্যাণের আশায় লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষ যাদের আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করে, তাদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَيَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا–

তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই জিনিসের ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করো, যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার? (মায়িদা-৭৬)

সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণ করছেন আল্লাহ্, এ ব্যাপারে অন্য কোন শক্তির সামান্য কোন ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না। তিনিই রব্ব এবং ইলাহ–দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে যে আনুগত্যের প্রবণতা রয়েছে, আল্লাহ্ আনুগত্যের যে স্বভাব মানুষের ভেতরে দান করেছেন, তা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় এবং মানুষ যেন ইবাদাতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই লক্ষ্য স্থির করে, সে জন্য বলে দেয়া হয়েছে–

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ–لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ–

এই হচ্ছেন আল্লাহ–তোমাদের রব–তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা সুতরাং তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। (সূরা আন'আম-১০২)

ইবাদাত বা দাসত্ব করার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষগুলো অসংখ্য কল্পিত মাবুদের বন্দেগী করে থাকে। নির্জীব পদার্থসমূহকে তারা শক্তির প্রতীক কল্পনা করে পূজা আরাধনা করে থাকে। কেউ কল্পনা করেছে স্বয়ং স্রষ্টার সন্তান রয়েছে, ফেরেশতারা তার কন্যা, সৃষ্টি কাজে জ্বিন ও ফেরেশ্তাগণ অংশীদার, অতএব এসবের পূজা অর্চনা করতে হবে। কোরআন অবতীর্ণের পূর্বে অন্যান্য জাতিকে নবী-রাসূলগণ ইবাদাত করার ব্যাপারে যে লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন, তারা কালক্রমে নিজেদের সেই লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে কেউ হযরত

www.pathagar.com

উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে আবার কেউ হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে কল্পনা করেছে। এভাবে তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। এদের ইবাদাতের প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّا حِدًا، لاَاِلٰهَ اِلاَّهُوَ-سُبْحٰنَه عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

অথচ এদেরকে এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কেউ-ই বন্দেহী-দাসত্ব লাভের অধিকারী নয়। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরিকী কথাবার্তা থেকে, যা তারা বলে। (সূরা তাওবা- ৩১)

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। মানব জাতির পিতা প্রথম মানব আদমের মধ্যে ইবাদাত, বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ ছিল না। তিনি তার ইবাদাতের লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। সমগ্র মানবতার জন্যেও সেই একই লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তী কালে এই মানুষ সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ هٰذِه اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً، وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ، وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ-

তোমাদের এই উম্মত প্রকৃত পক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত করো। কিন্তু নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্য লোকজন পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। পরিশেষে সকলকে এক হয়ে আমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা আম্বিয়া- ৯২-৯৩)

এই আয়াতে তোমরা শব্দের মাধ্যমে পৃথিবীর সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মানব গোষ্ঠী! তোমরা সবাই প্রকৃতপক্ষে একই দল ও একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁরা একই আদর্শ ও জীবন বিধানসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদের সবারই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহই মানুষের রব এবং এক আল্লাহরই

www.pathagar.com

ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করতে হবে। পরবর্তী কালে ধর্মের নামে যেসব বিকৃত আদর্শ, মতবাদ ও মতাদর্শ তৈরী হয়েছে, তা সমস্ত নবী-রাসূলদের আনিত অভিন্ন আদর্শকে বিকৃত করে তৈরী করা হয়েছে। কোন চিন্তানায়ক নবীদের আদর্শের একটি দিক মাত্র নিয়েছে, কেউ দুটো দিক গ্রহণ করেছে আবার কেউ গুটিকতক নিয়ে তার সাথে নিজের চিন্তা-চেতনা মিশ্রিত করে কিম্ভুতকিমাকার একটা কিছু নির্মাণ করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে।

এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মমতের এবং মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েছে নানা জনগোষ্ঠীতে। বর্তমানে মানুষের তৈরী করা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের ভিত্তি দান করেছেন এবং নবী-রাসূলগণই মানুষকে নানা ধর্মে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন, এসব কথা ছড়িয়ে মূলতঃ পবিত্র নবী-রাসূলদের ওপরে মারাত্মক অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে।

এসব বিকৃত আদর্শ ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং ইবাদাতের ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করছে বলেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিভিন্নতা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পবিত্র নবী রাসূলদেরই সৃষ্টি। এসব কথা বলা ও এসব কথা বিশ্বাস করা বড় ধরনের অপরাধ। আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ একের অধিক কোন মতবাদ মতাদর্শ প্রচার করেননি এবং ইবাদাত, দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিলেন না। তাঁরা সবাই এক আল্লাহরই ইবাদাত করার আদেশ দান করেছেন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী এই লক্ষ্যেই আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত করেছেন।

একমাত্র আল্লাহ্-ই ইবাদাত লাভের অধিকারী

একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত, দাসত্ব ও বন্দেগী করা জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতিরই দাবী। মানুষের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালনের ব্যাপারে যাদের কোনই ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না, তাদের ইবাদাত করা মূর্খতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এটাই হলো যুক্তি ও বিবেকের দাবী। বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাই হলেন আল্লাহ এবং তিনিই হলেন প্রকৃত মা'বুদ। তিনিই প্রকৃত মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মা'বুদ হওয়া উচিত।

রব অর্থাৎ মালিক, মুনিব, শাসনকর্তা এবং প্রতিপালক হবেন একজন আর ইলাহ্ অর্থাৎ আনুগত্য, বন্দেগী ও দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হবেন অন্যজন, এটা একেবারেই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধির অগম্য যুক্তি। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার

www.pathagar.com

কল্যাণ ও অকল্যাণ, তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া, তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন–তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথানত করা মানুষের প্রকৃতিরই মৌলিক দাবী। এটাই তার ইবাদাত তথা দাসত্বের মৌলিক কারণ। মানুষ যখন একথাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত বা দাসত্ব না করা এবং ক্ষমতাহীনের আনুগত্য বা ইবাদাত করা দুটোই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী।

কর্তৃত্বশালী–ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগকারী আনুগত্য, দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হন। যাদের কোন ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্ব নেই, কোন কিছু করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই, তারা আনুগত্য বা দাসত্ব লাভের অধিকারী হন না। এসব দুর্বল সত্তার দাসত্ব বা আনুগত্য করে এবং তাদের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে শুধু নিরাশই হতে হয়–কিছু পাওয়া যায় না। কারণ একজন ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে পারে না। মানুষের কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ক্ষমতাই দুর্বল সত্তাদের নেই।

এদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহাকরে মাথানত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ, যেমন কোন ব্যক্তি শাসনকর্তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার কাছে আবেদন পেশ করার পরিবর্তে তারই মতো অন্য আবেদনকারীগণ সেখানে আবেদন-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা।

দাসত্ব লাভ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তিনি শুধু পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে। তাঁর প্রতিপালনের কারণেই সমস্ত কিছু বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অসীম কল্যাণে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –

আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। পৃথিবী ও আকাশের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। (সূরা আয যুমার-৬৩)

যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক, প্রতিপালক এবং যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি, তাঁরই ইবাদাত লাভের যোগ্যতা রয়েছে, আর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের

www.pathagar.com

ইবাদাত করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহরই গোলাম। গোলাম হয়ে যারা গোলামদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছে, এদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূর্খ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ–

এদেরকে বলে দিন, হে মূর্খেরা! তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে? (সূরা যুমার-৬৪)

মহান আল্লাহর ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিকারী–প্রার্থনা মঞ্জুরকারী এবং এ জন্যই তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ، اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ–

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যেসব মানুষ অহঙ্কার বশতঃ আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মু'মিন-৬০)

নামাজ আদায় কালে মানুষ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে নিজেকে নিবেদন করে বলে, 'আমরা একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে আমরা তোমারই কাছে দোয়া করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই–অন্য কারো কাছে নয়। আসলে মানুষ দোয়া করে কেবল সেই শক্তিরই কাছে, যে শক্তি সম্পর্কে সে ধারণা করে, 'আমি যার কাছে দোয়া করছি, তিনি সমস্ত কিছুই শোনেন–দেখেন এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী। নীরবে-সরবে, নির্জনে, প্রকাশ্যে, মনে মনে যে কোন অবস্থায়ই দোয়া করি না কেন, তিনি তা দেখছেন এবং শুনছেন।' মূলতঃ মানুষের আভ্যন্তরীণ এই অনুভূতি, এই চেতনাই তাকে দোয়া করতে প্রেরণা যোগায়-উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এই পৃথিবী তথা বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন মানুষের কোন দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট নিবারণ অথবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়ার জন্য মানুষের অবচেতন মন অস্থির হয়ে ওঠে। বিষয়টি সে সময় মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং সেই

www.pathagar.com

অদৃশ্য অথচ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে ডাকতে থাকে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি স্থানে এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। নির্জনে একাকী ডাকে, উচ্চস্বরে ডাকে, নীরবে নিভৃতে ডাকে এবং মনে মনে একান্ত তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষ এভাবে তাঁর স্রষ্টাকে ডাকতে থাকে। সেই বিশ্বাসটি হলো, সে যে সত্তাকে ডাকছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন এবং তাঁর মনের গহীনে যে কথামালার গুঞ্জরণ সৃষ্টি হচ্ছে, সাহায্যের প্রত্যাশায় তার মন যেভাবে আর্তনাদ করছে, মনের জগতের এই আর্তচিৎকার পৃথিবীর কোন কান না শুনলেও তাঁর স্রষ্টার কুদরতী কান অবশ্যই শুনতে পাচ্ছে। সে যে সত্তাকে ডাকছে, তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি তাকে সাহায্য কতে সক্ষম। তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় কল্যাণে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম।

আল্লাহর কাছে দোয়া করার, তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করার এই তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য এ বিষয়টির মধ্যে আর কোন জটিলতা থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া করে বা সাহায্যের আশায় ডাকে, তার নামে মানত করে সে প্রকৃত পক্ষেই নিরেট বোকা এবং সে নির্ভেজাল শির্কে লিপ্ত হয়। কারণ যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে। আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলী নির্দিষ্ট, সে তাদেরকে ঐসব গুনাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করতো না এবং সাহায্য চাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো উদয় হতো না।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই এ কথা মনে করে বসে যে, সে অনেক প্রচন্ড ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক, তাহলে অনিবার্যভাবেই তার কল্পিত ব্যক্তি বা সত্তা ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি অবিচল বাস্তবতা, একটি দৃশ্যমান বাস্তব বিষয় যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রকৃত ক্ষমতার মালিককে কেউ মালিক মনে করুক বা না করুক, স্বীকৃতি দিক বা না দিক–তাতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না, প্রকৃতই যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে মালিক, সে সর্বাবস্থায়ই মালিক থাকবে। আর যে সত্তা কোন ক্ষমতার মালিক নয়, কেউ তাকে ক্ষমতার মালিক মনে করলেও, তার মনে করার কারণে সে সত্তা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতাবান হবে না।

www.pathagar.com

এটাই অটল বাস্তবতা যে, একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বাই সর্বশক্তিমান, গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক, শাসক, প্রতিপালক, সংরক্ষণকারী, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তিনিই সামগ্রিকভাবে যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিপতি। সমগ্র বিশ্ব জগতে দ্বিতীয় এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই, যে সত্তা দোয়া শোনার সামান্য যোগ্যতা রাখে, সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে, বা তা মঞ্জুর করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

মানুষ যদি এই অটল বাস্তবতার পরিপন্থী কোন কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী রাসূল, পীর-দরবেশ, অলী-মাওলানা, জ্বিন-ফেরেশতা, গ্রহ-উপগ্রহ ও মাটির তৈরী দেব-দেবীদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অংশীদার কল্পনা করে, তাহলে প্রকৃত বাস্তবতার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না। ক্ষমতার অধিকারী মালিক যিনি, তিনি মালিকই থাকবেন, তাঁর মালিকানায় এসব ব্যর্থ ও বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। আর নির্বোধদের কল্পনা শক্তি কখনো ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন গোলামকে মালিক বানাতে পারে না, গোলাম গোলামই থাকে।

দোয়া করা ও সাহায্য কামনা করার বিষয়টি সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। মনে করা যাক কোন রাজার দরবার থেকে সাহায্য দান করা হয় এবং রাজা প্রার্থনা শুনে থাকেন। সেখানে প্রজাদের মধ্য থেকে যার যে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে অনেকেই উপস্থিত হয়েছে। এই প্রজাদেরই একজন যদি সাহায্যের আবেদন নিয়ে রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে-সাহায্য প্রত্যাশী অন্য প্রজাদের একজনের সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তার গুণকীর্তন করতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য তার কাছে কাতর কণ্ঠে অনুনয় বিনয় করতে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির এই ধরনের আচরণকে কি বলা যেতে পারে? এর থেকে চরম ধৃষ্টতা কি আর হতে পারে?

বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক, রাজার দরবারে রাজার উপস্থিতিতে তারই একজন প্রজা আরেকজন প্রজাকে রাজা কল্পনা করে তার কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছে, সাহায্য প্রার্থনা করছে, রাজার মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে তা ঐ প্রজা সম্পর্কে উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। আর যে প্রজার কাছে এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, সেই প্রজা বেচারী রাজার সামনে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে, বিব্রতবোধ করছে এবং বারবার নির্বোধ প্রজাকে বলছে, 'তুমি আমার গুণকীর্তন কেন করছো, আমার কাছে কেন দোয়া করছো, কেন আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছো, আমি তো রাজা নই-তোমার মতো আমিও এই রাজার একজন প্রজামাত্র এবং রাজ দরবারে তোমার মতো আমিও একজন সাহায্য প্রার্থী। আমাকে বাদ দিয়ে

www.pathagar.com

তোমার চোখের সামনে যে আসল রাজা দরবারে অধিষ্ঠিত আছেন, সাহায্য তার কাছে চাও।' বেচারী এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজাকে বার বার বুঝাচ্ছে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! হতভাগা তবুও চোখ-কান বন্ধ করে তারই মতো সেই প্রজার কাছে স্বয়ং রাজার সামনে সাহায্য প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়েছে ঐ নির্বোধ হতভাগা প্রজার মতোই। আল্লাহর যেসব বাকহীন গোলামদের দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা এরা করছে, তারা নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে, 'আমরা তোমারই মতো এক গোলাম। আমাদের আনুগত্য না করে, আমাদের কাছে প্রার্থনা না করে, আমরা যার আনুগত্য করছি, যার কাছে সাহায্য কামনা করছি, সেই আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাও।'

দোয়া–দাসত্বের স্বীকৃতি

দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং যে কোন প্রয়োজনে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। দোয়া করতে হবে শুধু তাঁরই কাছে। মনে রাখতে হবে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনারই অনিবার্য দাবী। যারা তাঁর কাছে দোয়া করে না, এর অর্থ হলো–তারা গর্ব আর অহঙ্কারে নিমজ্জিত। এ কারণে তারা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর কাছে দোয়া না করা, সাহায্য না চাওয়া চরম অপরাধ। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়াই ইবাদাত। আরেক হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। (তিরমিজী)

দোয়া ও তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি

দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষের মনে তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, 'কল্যাণ ও অকল্যাণ যাবতীয় কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনিই তাকদীরের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই তো অনিবার্যভাবে মানুষের জীবনে ঘটবেই। অতএব নতুন করে আবার আমরা দোয়া করবো কেন

এবং দোয়া করলে কি আমাদের তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটবে?' মানুষের এই ধারণা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে সাহায্য চাওয়া ও দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে দেয়। এই ভুল ধারণা হৃদয়-মনে পালন করে মানুষ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, দোয়া করে, তাহলে সেসব দোয়ার মধ্যেও যেমন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না তেমনি কোন প্রাণও থাকে না। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন–

وَ قَالَ رَبُّكُمَ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ–

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। (সূরা মুমিন-৬০)

এভাবে পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই বলা হয়েছে, আমি বান্দার অত্যন্ত কাছে অবস্থান করি, বান্দাহ্ যখন আমাকে ডাকে আমি সে ডাকের সাড়া দিয়ে থাকি। কোরআনের এসব ঘোষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার দোয়া ও আবেদন, নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি শুনে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই সংরক্ষণ করেন। এ কথা চিরসত্য যে, বান্দাহ্ আল্লাহ্র সিদ্ধান্তসমূহ এড়িয়ে যেতে পারে না বা তাঁর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

সুতরাং দোয়া কবুল হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় দোয়ার অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কোন দোয়া-ই বৃথা যায় না। একটি না একটি কল্যাণ অবশ্যই লাভ করা যায়। সে কল্যাণের ধরণ হলো, বান্দাহ্ তার মালিক, মনিব, প্রভু, প্রতিপালকের সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে, সাহায্য কামনা করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা, অপারগতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এই স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত বা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দাহ্ যে সাহায্য কামনা করলো বা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক, তার আশা পূরণ হোক বা না হোক, কোন অবস্থায়ই তার দোয়ার প্রতিদান থেকে সে বঞ্চিত হবে না। হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ اِلاَّ الدُّعَاءُ– (رواه الترمذى)

দোয়া ব্যতীত আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোন কিছুর মধ্যেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন, যখন বান্দাহ্ কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছে দোয়া করে, সাহায্য চায়। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلاَّ اَتَاهُ اللّٰهُ مَا سَاَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ–

বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন অথবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন–যদি সে গোনাহের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে। (তিরমিযী)

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِحْدٰى ثَلٰثَ، اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَاِمَّا اَنْ يُدَّخِرَهَا لَهُ فِى الاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا،

একজন মুসলমান যখনই কোন দোয়া করে তা যদি কোন গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তা তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এই পৃথিবীতেই কবুল করা হয়, নয় তো আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোন বিপদ আসা বন্ধ করা হয়। (আহ্মাদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ، اِرْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ–اِرْزُقْنِىْ اِنْ شِئْتَ–وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ–

তোমাদের কোন ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে, হে আল্লাহ আল্লাহ ! আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো। (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এভাবে আদেশ দিয়েছেন–

اُدْعُو اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ–

আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দোয়া করো। (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلُ، قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يُسْتَجَابُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ–

যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তাড়াহুড়োর বিষয়টি কি? তিনি জানালেন, তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু দেখছি আমার কোন দোয়াই কবুল হচ্ছে না। এভাবে সে অবসন্নগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রব-এর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।' (তিরমিযী)

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ–

আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর কিছুই নেই।

হযরত ইবনে উমর ও মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ–

যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য। (তিরমিযী, ইবন মাজাহ্)

হযরত ইবনে মাস্উদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْاَلَ–

আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ্ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন। (তিরমিযী)

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে তা অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এমন অনেক দোয়া রয়েছে। মানুষ যে বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বলে ধারণা করে সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ বা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। কারণ, কোন বিষয়ে মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনা-তদবীরই আল্লাহর রহমত, তাঁর সহযোগিতা ও তাওফিক এবং সাহায্য ব্যতিত সফল হতে পারে না। চেষ্টা-সাধনা শুরু করার পূর্বে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হলো, বান্দাহ্ সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে। সে যে আল্লাহর বান্দাহ্, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করছে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহর কল্পনাতীত ক্ষমতা, সম্মান-মর্যাদার কথা দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই কথাগুলোই সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজে বারবার বিনয়ের সাথে বলতে থাকে, হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

www.pathagar.com

যে কোন ব্যাপারে সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখন মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহকে সেজদা দেয়, তখন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং কোন কিছুর প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। সম্রাট শাহ্‌জাহানের জীবনীর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কোন একজন ভিক্ষুক কিছু পাবার আশায় তার দরবারে আগমন করেছিল।

অভাবী লোকটি সম্রাটকে না পেয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, তিনি মসজিদে নামাজ আদায় করছেন। লোকটি মসজিদের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো, দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক সম্রাট শাহ্‌জাহান নামাজ শেষে দুটো হাত তুলে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করছেন, আর তার দু'চোখের কোণ বেয়ে শ্রাবণের বারি ধারার মতই অশ্রু ঝরছে। অশ্রু ধারায় তার দাড়ি সিক্ত হয়ে বুকের কাছে শরীরের জামাও ভিজে গিয়েছে।

মুনাজাত শেষ করে সম্রাট মসজিদ থেকে বাইরে এলেন। ভিক্ষুক লোকটি সম্রাটকে সালাম জানালো, তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর লোকটি সম্রাটের কাছে কোন কিছু আবেদন না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে যেতে লাগলো। সম্রাট অবাক হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, তার কাছে এসে কেউ তো কোন নিবেদন না করে ফিরে যায় না-কিন্তু এ লোকটিকে দেখতে তো অভাবী মনে হয়। কিন্তু লোকটি কিছু না চেয়ে ফিরে যাচ্ছে কেন? ভিখারী লোকটি চলে যাচ্ছে আর সম্রাট বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্বিৎ ফিরে পেতেই তিনি লোকটিকে ডাক দিলেন। লোকটির কানে সম্রাটের আহ্বান পৌঁছা মাত্র লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে সম্রাটের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষমতাধর সম্রাট লোকটির চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতাভরে প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে এসে কোন ব্যক্তি কিছু না চেয়ে তো চলে যায় না, তোমাকে দেখে তো অভাবী মনে হচ্ছে। তুমি আমার কাছে কিছু না চেয়ে কেন চলে যাচ্ছিলে ?

লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে জানালো, সত্যই আমি অভাবী। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি। আপনার কাছেও এসেছিলাম ভিক্ষার আশায়। আপনার কাছ থেকে বড় রকমের কিছু সাহায্য পাবো, যেন বাকি জীবনে আমাকে আর ভিক্ষা করতে না হয়। কিন্তু আপনার কাছে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম, আপনি আমার থেকে নগণ্য ভিক্ষুকের মতো পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটদের সম্রাটের কাছে দু'হাত তুলে ভিখারীর মতো অনুনয়-বিনয় করে কাঁদছেন। এই দৃশ্য দেখে আমি স্থির সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

গ্রহণ করলাম, সম্রাট কাঁদে যে সম্রাটের কাছে, আমিও তাঁরই কাছে কাঁদবো। আমি বাকি জীবনে ঐ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্ ব্যতিত আর কারো কাছে কখনো কিছুই চাইবো না।

আনুগত্য বনাম ইবাদাত

পবিত্র কোরআনে ইবাদাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। নামাজের মধ্যে বারবার পড়তে হয়, ইয়্যাকা না'বুদু-অর্থাৎ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, এই আয়াতে যে না'বুদু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আনুগত্য অর্থে ইবাদাত শব্দটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এখন আমরা তা দেখার প্রয়াস পাবো। সূরা ইয়াছিনের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ، اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

হে আদম সন্তানেরা ! আমি কি তোমাদের তাগিদ করিনি যে তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াছিন-৬০)

এই পৃথিবীতে বোধহয় এমন একজন মানুষও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি শয়তানকে ভালো বলে। সবাই শয়তানকে গালাগালি দেয়। কোন মানুষের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হলে, অন্য মানুষ তাকে শয়তান বলে গালি দেয়। এভাবে শয়তানের প্রতি সবাই অভিশাপ দিয়ে থাকে। শয়তানকে মানুষ অভিশাপ দেয়-কেউ তার ইবাদাত করে না।

শয়তানের পূজা-উপাসনা, ইবাদাত, বন্দেগী, আনুগত্য করতে কেউ রাজি হয় না, এর পরিবর্তে শয়তানের ওপরে শুধু চারদিক থেকে অগণিত কণ্ঠে অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে। শয়তান নামক এই অশুভ-অপশক্তির প্রতি লা'নত হতে থাকে। মানুষ অপরাধ করে, পাপের সাগরে ডুবে যায়, পাপ-পঙ্কিলতার কদর্যতায় অবগাহন করতে থাকে মানুষ আর দোষ চাপিয়ে দেয় শয়তানের ঘাড়ে। মানুষের এই স্বভাব সম্পর্কে কবি বলেন-

কিয়া হাঁসি আ-তি হায় মুঝে হযরতে ইনসান প্যর
ফে'লে বদ তু খোদ ক্যরে লা'নাত ক্যরে শয়তান প্যর।

বিদ্রুপের হাসি আসে আমার, মানুষের স্বভাব দেখে। এরা নিজেরা অপরাধমূলক কর্ম করে দোষ চাপিয়ে দেয় শয়তানের প্রতি।

www.pathagar.com

এই শয়তান যেন ফুটবলের মতো। ফুটবলের সৃষ্টিই হয়েছে লাথির আঘাত সহ্য করার জন্য, তেমনি এই শয়তানের সৃষ্টিই হয়েছে শুধু অভিশাপ, লা'নত আর গালাগালি শোনার জন্য। অথচ এই মানুষের প্রতি তার স্রষ্টার পক্ষ থেকে বার বার আদেশ দেয়া হয়েছে তোমরা শয়তানের ইবাদাত করবে না। শয়তানের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে, এ কথার অর্থ হলো শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা যাবে না। কোরআন ও হাদীসের আদেশ অনুসরণ করার পরিবর্তে শয়তানের আদেশ অনুসারে জীবন পরিচালিত করা যাবে না। শয়তান মানুষকে যেভাবে প্ররোচনা দেয়, সেই প্ররোচনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করার অর্থই হলো, শয়তানের ইবাদাত করা বা শয়তানের আনুগত্য করা। সূরা ইয়াছিনের উল্লেখিত আয়াতে যে তা'বুদু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো আনুগত্য করা, দাসত্ব করা বা ইবাদাত করা। যারা পৃথিবীতে শয়তানের ইবাদাত করেছে তথা শয়তানের প্ররোচনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলছে,–

أُحْشُرُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ، مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ–

(ফিরিশ্‌তাদের আদেশ দেয়া হবে যাও,) তোমরা যালিমদের এবং তাদের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের (ধরে ধরে) জমা করো, তাদের (দোসরদেরও) যারা তাদের আনুগত্য করতো (এদের সবাইকে এক জায়গায় একত্র করো,) আল্লাহ্ তা'য়ালাকে বাদ দিয়ে (যাদের এরা মাবুদ বানাতো) তাদেরও (এক সাথে) জাহান্নামের রাস্তা দেখিয়ে দাও। (সূরা সাফ্‌ফাত- ২২- ২৩)

আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব, আনুগত্য বা ইবাদাত না করে, শয়তানের আনুগত করেছে, ইবাদাত করেছে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ শয়তানের ইবাদাত বা আনুগত্য করার নির্মম পরিণতি এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এ কারণে যে, মানুষ যেন কোনক্রমেই শয়তানের আনুগত্য না করে। মানুষ আনুগত্য করবে কেবলমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এবং তাঁর প্রেরিত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের। শর্তহীনভাবে কোন নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা যাবে না। কারো আনুগত্য করতে হলে, কারো মতামত গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই কোরআন সুন্নাহ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

www.pathagar.com

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا، لَااِلٰهَ اِلاَّهُوَ، سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

তারা নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ব্যতিত আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, সেই আল্লাহ–যিনি ব্যতীত অন্য কেউ দাসত্ব লাভের অধিকারী নন। (সূরা তওবা-৩১)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদেরকে রব বানিয়ে নেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য না করে তাদের আনুগত্য করা। এসব ব্যক্তিদের আদেশ-নিষেধ নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা। আল্লাহর বিধান অনুসন্ধান না করে, পীর, মাশায়েখ, আলেম-ওলামাদের মতামত অনুসরণ করা। হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টের বিকৃত আদর্শ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহর রাসূলের কাছে কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন। উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে তিনি জানতে চান, 'আমরা খৃষ্টানরা আমাদের আলেম-ওলামা ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিলাম বলে কোরআন যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে, এর প্রকৃত অর্থ কি?' জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'এটা কি সত্য নয় যে, তোমাদের আলেম-ওলামা, দরবেশগণ যে বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা দিত তা তোমরা অবৈধ হিসাবে গণ্য করতে?' হযরত আদী বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা তা করতাম।'

হযরত আদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জবাব শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–এ ধরনের করলেই তো তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়া হলো। উল্লেখিত আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, আল্লাহর কিতাবের সনদ ব্যতিতই যারা মানব জীবনের জন্য হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণ করে, আসলে তারা নিজেদের ধারণা অনুসারে নিজেরাই রব-এর আসন দখল করে বসে।

আর যারা তাদেরকে এভাবে আইন-বিধান রচনা করার অধিকার দেয় বা অধিকার আছে বলে মেনে নেয়, মূলতঃ তারাই তাদেরকে রব্ব বানায়। আলেম-ওলামা, পাদ্রী-পুরোহিতদের রব বানিয়ে নেয়ার মূল অর্থ হলো, তাদেরকে আদেশ-নিষেধকারী হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন ব্যতীতই তাদের কথা শিরোধার্য করে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আলেম-ওলামা, পীর-দরবেশ, ওস্তাদ-মাশায়েখ, নেতা-নেত্রী তথা যে কোন ব্যক্তি হোক না কেন, তিনি যে কথাটি বলবেন সে কথার প্রতি কোরআন ও হাদীস সমর্থন করে কিনা, তা না জেনে কোনক্রমেই গ্রহণ করা যাবে না। পীর সাহেব বা কোন মাওলানা সাহেব যদি বলেন, মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করতে হবে পনের হাত। শুধু পনের হাত কেন, এর অধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে–কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কোন সাহাবা এ ধরনের বিশালাকৃতির কোন পাগড়ী ব্যবহার করেছেন কিনা।

পীর সাহেব শিখিয়ে দিলেন, এই ধরনের পদ্ধতিতে সকাল-সন্ধ্যায় বা গভীর রাতে যিকির করতে হবে। যিকির অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু প্রথমে এটা অনুসন্ধান করতে হবে, পীর সাহেব যে পদ্ধতিতে করতে বললেন, সে পদ্ধতিতে আল্লাহর রাসূল বা তাঁর কোন সাহাবা জীবনে ক্ষণিকের জন্যও যিকির করেছেন কিনা। যদি দেখা যায় তাঁরা করেছেন, তাহলে পীর সাহেবের কথার প্রতি আনুগত্য করা যেতে পারে–তার পূর্বে নয়।

একজন মাওলানা সাহেব ফতোয়া দিলেন, তার সে ফতোয়া কোরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা–এটা সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কোন হুজুর, কোন পীর সাহেব, কোন মুরুব্বী কি বলেছেন, কোন কিতাবে কি লেখা রয়েছে, এসব অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন মুসলমানদের নেই। মুসলমানদের অনুসরণ করার প্রয়োজন, একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ্। এ দুটো ব্যতিত অন্য কোন কিতাবের কথা, কোন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করা যেতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তির কথা ও কিতাবের লেখার সাথে কোরআন-সুন্নার বিধানের সংঘর্ষ না ঘটে, তাহলে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। এর নামই হলো আনুগত্য এবং আল্লাহর ইবাদাত। কোরআন-সুন্নাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোন কিছুর অন্ধ অনুকরণ করা যাবে না- এর নামই হলো ইবাদাত। কেবলমাত্র চোখ বন্ধ করে আল্লাহর বিধানের সামনে মাথানত করতে হবে, আনুগত্য করতে হবে।

পূজা বনাম ইবাদাত

এই পৃথিবীতে কোন মানুষকে বা জড়-অজড় পদার্থকে ক্ষমতার উৎস মনে করে বা ক্ষমতাশালী মনে তার কাছে দোয়া করা, প্রার্থনা করা, নিজের দুঃখমোচনের লক্ষ্যে তাকে ডাকা, যেমনভাবে আল্লাহকে ডাকা উচিত, নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের আশায়, বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায় ডাকা পূজার অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ শিরক। কাউকে সম্মান প্রদর্শের উদ্দেশ্যে রুকু সিজদা করা, তার সামনে দু'হাত বেঁধে

www.pathagar.com

দাঁড়ানো, কোন মাজার বা কবরে তাওয়াফ করা, কোন আস্তানায় চুমো দেয়া, কারো সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন দেয়া, কোরবানী করা এবং এ জাতিয় যে কোন অনুষ্ঠান করা–যা সাধারণতঃ পূজার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, এসবই হলো শির্ক।

কারণ পূজা-উপাসনা লাভের অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। নিজের যে কোন প্রয়োজনের জন্য একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَ نِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ-وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

হে নবী! এসব লোককে বলে দিন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার কাছে আমার রব-এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব-জাহানের রব-এর সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি। (সূরা মুমিন-৬৬)

এ আয়াতে ইবাদাত ও দোয়াকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নবীর মাধ্যমে এ কথা বলে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পূজা করা ত্যাগ করে যাদের পূজা করছো, যাদের সামনে পূজা-উপাসনা করছো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আমি যেন তাদের পূজা-উপাসনা না করি। এ ব্যাপারে আমার কাছে আমার রব-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার মাথা বিনয়ের সাথে একমাত্র তাঁরই সামনে নত করি, যিনি গোটা জাহানের রব্ব এবং তাঁরই সামনে সমস্ত সৃষ্টি আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে, সমগ্র সৃষ্টিলোক তাঁরই পূজা-উপাসনা করছে।

এভাবে যেসব মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যাদের পূজা-উপাসনা করে থাকে, এরা হলো সবচেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّايَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ-وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ-

www.pathagar.com

সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট কে–যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ। যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা নিজেদের আহ্বানকারীর শত্রু হয়ে যাবে এবং ইবাদাতকারীদের অস্বীকার করবে। (সূরা আহ্কাফ-৫-৬)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মানুষ মাজারে গিয়ে মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের কাছে, মূর্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, নানা আশাপূরণ করার জন্য দোয়া করে, এসব লোক হলো পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে অগ্রগামী দল। মাজারে গিয়ে, দরগায় গিয়ে, মন্দিরে মূর্তির কাছে গিয়ে তাদেরকে উপাস্য তথা আশাপূরণকারী, সাহায্যদানকারী মনে করে যেসব নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে অথবা তাদের কাছে দোয়া করে, তারা আবেদনকারীর আবেদনে কোন প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাস্তব তৎপরতা প্রদর্শন করতে সক্ষম নয়। এসব আহ্বানকারীদের আহ্বান আদৌ তাদের কানে পৌঁছে না। এদের নিজের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, এরা নিজের কানে আদেবদনকারীর আবেদন শোনে বা এমন কোন সূত্র নেই, যে সূত্রে তারা অবগত হতে পারে যে, তাদের কাছে কেউ দোয়া করছে বা আবেদন করছে।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্য সত্তার কাছে আবেদন-নিবেদন করে, এসব স্বকপোলকল্পিত সত্তা সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়ে তাকে। প্রথম প্রকার হলো, একশ্রেণীর মানুষ যেসব মূর্তি নিজ হাতে নির্মাণ করে এদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দেয়। এদের কাছে মনের ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা নিবেদন করে। এসব সত্তা প্রাণহীন জড়পদার্থ। স্বাভাবিকভাবেই এদের কোন শক্তিই নেই। আবেদনকারীর কোন আবেদন এদেরকে স্পর্শও করতে পারে না।

দ্বিতীয় যেসব সত্তার পূজা-অর্চনা, উপাসনা একশ্রেণীর মানুষ করে, তারা হলো সেই সব ব্যক্তি–যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা ও বন্দেগী করে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা প্রতি নিয়ত সংগ্রাম-মুখর জীবন অতিবাহিত করতেন। এসব সম্মানিত ও মর্যাদাবান বুযর্গ লোকগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে একশ্রেণীর স্বার্থলোভী মানুষ এদের কবরকে ঘিরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান শুরু করে দিল এবং এসব লোক সম্পর্কে নানা ধরনের কাল্পনিক অলৌকিক ঘটনার কথা অজ্ঞ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলো। যেন লোকজন এসব মাজারে এসে সাহায্য কামনা করে, বিপদ থেকে মুক্তি চায় এবং সেই সাথে উপহার-উপঢৌকন দেয়, অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিতে থাকে। এসব বুযর্গ ব্যক্তিও আবেদনকারীর কোন আবেদন শুনতে পান

www.pathagar.com

না। কারণ তারা মৃত এবং মৃত লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ–

তুমি মৃত লোকদের কখনো কিছু শোনাতে পারবে না, বধিরকেও তোমার আওয়াজ শোনাতে পারবে না। (সূরা আন্ নামল- ৮০)

আল্লাহর ওলীগণ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে আল্লাহর কাছে তারা এমন একটি জগতে অবস্থান করছেন যেখানে কোন মানুষের আওয়াজ সরাসরি পৌছে না। ফেরেশ্তার মাধ্যমে তাদের কাছে এ সংবাদ পৌছানো হয় না যে, 'আপনাদের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বা সেজদায় অবনত হয়ে লোকজন আপনার কাছে দোয়া কামনা করছে।' এসব সংবাদ এজন্য তাদেরকে দেয়া হয় না যে, তারা তাদের গোটা জীবনকাল ব্যাপী আন্দোলন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, মানুষ যেন কেবলমাত্র এক আল্লাহর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করে। এখন যদি তারা জানতে পারেন যে, তিনি যেসব বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, মানুষ উল্টো তারই কবরকে কেন্দ্র করে ঐসব বিষয় অনুষ্ঠিত করছে, তার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছে। তাহলে তারা মনোকষ্ট লাভ করবেন–আর আল্লাহ তাঁর কোন প্রিয় বান্দাকে সামান্য কষ্টেও নিক্ষেপ করেন না।

স্বার্থান্বেষী লোকগণ আল্লাহর ওলীদের মাজারকে কেন্দ্র করে শির্কের উৎসের স্থলে পরিণত করেছে। এসব লোকদের নামের পূর্বে 'পীর-মাওলানা' শব্দও ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই ধরনের পীর ও মাওলানা উপাধিধারী মাজার পূজারী লোকগণ নিজেদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে দল গঠন করেছে। মানুষ যেন এদেরকে নবীর সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারী মনে করে এ জন্য তারা তাদের দলের নাম দিয়েছে, 'আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত।' অর্থাৎ এটা সেই দল, যে দল সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকে।

মানুষের অর্থ-সম্পদ শোষনের লক্ষ্যে এরা সুন্নাতের নামাবলী গায়ে দিয়ে বলে থাকে, 'মাজারে যিনি শুয়ে আছেন তিনি জীবিতকালে যতটা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, ইন্তেকাল করার পরে তার শক্তি অনেক গুণ বৃদ্ধি লাভ করেছে, কারণ এখন তো তারা সরাসরি আল্লাহর দরবারে যাতায়াত করার অনুমতি পত্র লাভ করেছেন।'

এই সব স্বার্থান্বেষী কর্মবিমুখ-বিভ্রান্ত লোকজন, শ্রমলব্ধ উপার্জন কষ্টকর মনে করে অজ্ঞ মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার কৌশল হিসাবে মাজারে বিশালাকৃতির বৃক্ষ তৈরী

করেছে। লোকজনকে বলা হয়েছে, অমুক নির্দিষ্ট দিনে এসে এই বৃক্ষের গোড়ায় অমুক অমুক জিনিস উপহার দিয়ে গেলে মনের আশা পূরণ হবে। বৃক্ষের শাখায় কোন ভারী পাথর বা ইট বেঁধে দিলে গর্ভে সন্তান আসবে। এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে, পাথর বা ইট যেমন ওজনদার, তেমনি সন্তানের ভারে গর্ভ ভারী হবে, গর্ভ স্ফিত হয়ে উঠবে। মাজারের পাশে জলাশয় নির্মাণ করে সেখানে মাছ, কুমির, কাছিম ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বিধান তথা ইবাদাত সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের ভেতরে এই ধারণার জন্ম দেয়া হয়েছে যে, এসব মাছ, কচ্ছপ আর কুমিরকে খাদ্য প্রদান করলে, চুমো দিলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে, মনের আশা পূরণ হবে, নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করবে। এভাবে মানুষকে আল্লাহর পূজা-অর্চনা ও উপাসনা থেকে বিরত রাখা হয়েছে এবং শির্কে নিমজ্জিত করা হয়েছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ্ মুখী না করে মাজার মুখী করা হয়েছে।

মারাত্মক বিভ্রান্তি

মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিরত করে এমন সব শক্তির ইবাদাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যাদের কোনোই শক্তি নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ–

এবং তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। আর বলে, এরা আল্লাহর দরবারে আমাদের সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুস-১৮)

যারা এ ধরনের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত তারা বলে থাকে, আমরা এসব দরগাহ্ আর মাজারে এ জন্য প্রার্থনা করি যে, আল্লাহর এসব ওলীগণ আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন এবং এরা হলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। পৃথিবীতে একটি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন কোন একক ব্যক্তির পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না, সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্য মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওপরে নানা রকম দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে এক একটি শক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আমরা সেসব শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই তাদের পূজা-উপাসনা করি, তাদের দরবারে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করি।

www.pathagar.com

উল্লেখিত ধারণা একটি ভয়ঙ্কর ধারণা। কোন মুসলমান যদি এমন ধারণা পোষণ করে, তাহলে সে আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর একজন থাকবে না। সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে। এরা মানুষের সীমিত ক্ষমতার মতো আল্লাহর ক্ষমতাকেও সীমিত মনে করে। মানুষ দুর্বল, তার ক্ষমতা সীমিত–এ জন্য মানুষ একা দেশের সমস্ত কাজের আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয় বলে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তো অসীম ক্ষমতার অধিকারী–সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর যে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে চান, তাঁর সে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তিনি কুন বললেই তাঁর ইচ্ছা সাথে সাথে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় অন্য কোন শক্তির পূজা-উপাসনা করার কোনই প্রয়োজন নেই। সরাসরি তাঁরই পূজা-উপাসনা, আনুগত্য, বন্দেগী বা ইবাদাত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ কারো কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে না। কোন পীরের এমন ক্ষমতা নেই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে কোন মানুষের দেহের একটি পশমের ক্ষতি করতে পারে। এভাবে কোন দেব-দেবী বা অন্য কোন কল্পিত সত্তারও কোন ক্ষমতা নেই। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ، وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

কোন দুঃখ ও বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর মর্জিতেই হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। (সূরা আনআ'ম-১৭)

মানুষের জীবনে যে কোন বিপদ আসে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং সে বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। যখন কোন কল্যাণ আসে সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এ জন্য পূজা উপাসনা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهٗ اِلاَّ هُوَ، وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهٖ، يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ، وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। (সূরা ইউনুস-১০৭)

পবিত্র কোরআনের এসব আয়াত যেমন মূর্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য তাদের পীর, মাজার-দরগার ব্যাপারে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের জন্য যেসব কাজ নির্দিষ্ট রেখেছেন, সেসব কাজের ব্যাপারে কারো মধ্যে কোন ক্ষমতা বন্টন করেননি। তিনি কাউকে এজেন্সি দান করেননি যে, যে কেউ ইচ্ছা করলেই কোন নিঃসন্তানকে সন্তান দান করতে পারে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারে বা কৃষিতে অধিক উৎপাদন করে দিতে পারে। ইবাদাতের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস এতটা নিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছে যে, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়, সম্মান-মর্যাদা লাভের আশায় পীর সাহেবের পা ধোয়া পানি পর্যন্ত কেউ কেউ পান করে। পীর সাহেব গোসল করলে সেই গোসলের পানিও তারা পানা করে। এমনকি নিজের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে পীর সাহেবের খেদমতে নিয়োজিত করা হয়। পীরের প্রতি এমন সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়, যে সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হলেন আল্লাহ্। পূজার মাধ্যমে পীরকে এরা আল্লাহর আসনে বসিয়েছে।

কোন পীরের এ ক্ষমতা নেই যে, তারা কোন তদবীর দিয়ে কাউকে দশতলার মালিক বনিয়ে দিবে, শিল্প কারখানার মালিক বানাবে। আল্লাহ্ যদি রাজি না থাকেন, তাহলে কারো ভাগ্য কেউ পরিবর্তন করে দিতে পারে না। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় তথাকথিত পীরকে পূজা করা শির্ক। এই শির্ক থেকে নিজেকে হেফাজত করার জন্য একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন–

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ، فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমাকে কোন উপকার করে দিতে পারে না, তোমার কোন ক্ষতি সাধনও করতে পারে না। তুমিও যদি তাই করো তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুস-১০৬)

আল্লাহ্ রাজি না থাকলে কারো দোয়ায় ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। সুতরাং কোন মূর্তি নির্মাণ করে যেমন তার পূজা অর্চনা করা যাবে না, তেমনি কোন পীরের, মাজারের ও দরগারও পূজা করা যাবে না। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যারা পূজা অর্চনা করে, মূর্তির

www.pathagar.com

কাছে যারা নিজেদেরকে নিবেদন করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন–

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَايَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ، وَلَوْسَمِعُوْا مَااسْتَجَابُوْا لَكُمْ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই কাছে দোয়া করো, তাদের কেউ-ই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। এরপরও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো, তাদের কাছেই দোয়া করো, তবুও তারা তোমাদের ডাকও শুনতে পারে না, শুনতে পারে না তোমাদের দোয়া। (সূরা ফাতির-১৪)

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, কিছু সংখ্যক মানুষ পূজা-উপাসনার ব্যাপারে তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে তারা–যারা নিষ্প্রাণ মূর্তির বা জড়পদার্থের পূজা করে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সেসব বুযর্গ, যারা মাজারে শায়িত রয়েছেন। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ঐ সব ব্যক্তি, পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্ বিরোধী মতাবাদ-মতাদর্শ সৃষ্টি করেছে, নেতা হিসাবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এসব চিন্তানায়কগণ বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জীবিত থাকা অবস্থায় কখনো আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি এবং তাদের অনুসারীদেরকেও অনুসরণ করতে বলেনি। আল্লাহ্ বিরোধী চিন্তা-চেতনা অনুসারে তারা পরিচালিত হয়েছে এবং কর্মীদেরকেও পরিচালিত করেছে। এদের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীগণ এদের মূর্তি নির্মাণ করে বা বিশালাকারের ছবি বানিয়ে উপাস্যের আসনে বসিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করে থাকে। এসব ছবিতে বা এদের নামে নির্মিত স্তম্ভে ফুল দেয় এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে থাকে।

এসব আল্লাহ্ বিরোধী প্রয়াত নেতাদের নামে নির্মিত স্তম্ভে, ছবিতে ফুল দিয়ে পূজা করার ব্যাপারে বা কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের মাধ্যমে যে পূজা-উপাসনা করা হলো, এদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলো, এসবের মাধ্যমে তাদের আত্মার তো উপকার হলোই না, এমনকি তারা জানতেও পারে না-তাদেরকে এভাবে তার অনুসারীরা পূজা করছে। এদের ব্যাপারে যে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে সেখানে তাদের সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা করা হলো, এসব সংবাদও তারা জানতে পারে না। কারণ এরা নিজেদের মারাত্মক অপরাধের কারণে আল্লাহর বন্দীশালায় বন্দী রয়েছে। বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে এসব জালিম আত্মাগণ। সেখানে পৃথিবীর কোন আবেদন-নিবেদন পৌঁছে না। আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণও তাদেরকে এ সংবাদ দেন না যে, তোমরা পৃথিবীতে যে ভ্রান্ত চিন্তা চেতনার প্রবর্তন করে এসেছো,

www.pathagar.com

তা খুবই সফলতা লাভ করেছে এবং তোমার অনুসারীরা ফুল দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে, সেমিনারের আয়োজন করে তোমার প্রতি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করছে।'

এ সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছলে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভ্রান্ত চিন্তাধারার প্রবর্তক, আল্লাহ্ বিরোধী নেতাদের কলুষিত আত্মার খুশীর কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন জালিমের কখনো খুশী চান না। এখানে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর ইবাদাতকারী বান্দাদের আত্মার কাছে পৃথিবীর মানুষের প্রেরিত সালাম এবং তাদের রহমত কামনার দোয়া পৌঁছে দেন।

কারণ এসব দোয়া-সালাম তাদের খুশীর কারণ হয়। একই ভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা অপরাধী-জালিমদের আত্মাদেরকে পৃথিবীর মানুষের অভিশাপ, ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেন তাদের মনোকষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং কারো ছবি বা মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, মৃত ব্যক্তিদের সম্মানে কোন স্তম্ভ নির্মাণ করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আশা-আকাংখা পূরণের আশায় কারো প্রতি পূজার অনুরূপ মর্যাদা দেয়াও তাদের ইবাদাত করার শামিল। নামাজের মধ্যে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' এ কথা বলার পরে কোন মুসলমানের এই অধিকার নেই যে, সে অন্য কারো ছবির পূজা করবে, কোন পীরের পূজা করবে, কোন মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেবে। এসব থেকে মুসলমান নিজেকে হেফাজত করবে এবং কেবলমাত্র তার পূজা-উপাসনা, দাসত্ব-বন্দেগী আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে।

আল্লাহর দাসত্ব মানুষের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা

মানুষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার কারণে। শয়তান যেমন ঘৃণিত এবং পৃথিবীর মানুষের অভিশাপই সে প্রতি মুহূর্তে লাভ করছে, তেমিন শয়তানের পদাঙ্ক যারা অনুসরণ করে, তারাও তেমনি ঘৃণিত এবং অভিশাপ লাভের যোগ্য এবং তারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তা এবং আল্লাহর মুমিন বান্দাদের ও সমস্ত সৃষ্টির অভিশাপ লাভ করছে। বিষয়টি বড় আশ্চর্যের যে, সাধারণ মানুষ শয়তানকে গালি দেয় আর শয়তানের অনুসরণ যারা করে, তাদের প্রতি নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করে। হাদীস শরীফে এসেছে, কোন ফাসিকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে।

সুতরাং, শয়তান এবং শয়তানের কোন অনুসারীর আনুগত্য যেমন করা যাবে না, তেমনি তাদের প্রশংসাও করা যাবে না। সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা তো কেবল তারাই

www.pathagar.com

লাভ করতে পারেন, এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন পারিচালিত করে থাকেন তথা আল্লাহর ইবাদাত-দাসত্ব করেন। কোন মুনাফিকও সম্মান-মর্যাদা লাভ করতে পারে না। মুনাফিক শ্রেণীর লোকজন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে আল্লাহর আবেদ বান্দাদের অনুরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিতে থাকে।

নিজের নামের পূর্বে এমন সব বিশেষণ ব্যবহার করে যে, বিশেষণের আধিক্যের কারণে ব্যক্তির আসল নাম যে কি তা খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন হাদীয়ে জামান, কাইয়ূমে জামান, মুজাদ্দেদে জামান, রাহনুমায়ে শরীয়ত, সিরাজুস সালেকিন, মেছবাহুল আরেফিন, আশেকে রাসূল, মাহবুবে খোদা, আশেকে পান্দান, সিয়াহে দান্দান, আশেকে মাওলা- আরো কত কি! এরা শুধু নামের শেষে নবীদের নামের অনুরূপ 'আলাইহিস্ সালাম' লেখাই বাদ দিয়েছে, এ ছাড়া যতগুলো বিশেষণ ব্যবহার করা প্রয়োজন, মনের সুখে তা তারা করে থাকে। এদের ভেতরে আল্লাহ ভীতি যে নেই, তা এদের শান-শওকত পূর্ণ জীবনধারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এরা ভেক্ ধরে মানুষকে ধোকা দিয়ে সম্মানের আসনে আসীন হতে চায় এবং অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়। এদের এই মুনাফেকী চরিত্র সম্পর্কে কবি বলেন–

ইয়ে হাল তেরা জাল হ্যায়, মাক্ছুদ তেরা মাল হ্যায়,
কেয়া আযব তেরা চাল হ্যায়, লাখো কো আন্ধা ক্যর দিয়া

তোমার এই বেশভূষা সম্পূর্ণ নকল, তোমার কর্মকান্ড চাতুরী পূর্ণ। তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো অর্থ-সম্পদ অর্জন করা, এভাবে তুমি অসংখ্য মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছো।

এসব মুনাফিকরা নিজেদের চিন্তার জগতে, মন-মানসিকতায় কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা তথা হৃদয় জগতকে আল্লাহর রঙে রাঙাতে পারেনি। দেহটাকেই শুধু পোষাকের মোড়কে আল্লাহর রঙে রঙিন হিসাবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করে থাকে। নিজেদের কদর্য রূপটাকে সুন্নতী লেবাসের মোড়কে আবৃত করে রেখে সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ায় ব্যস্ত এসব বেদাআত পন্থীরা। এই শ্রেণীর ভন্ডদের সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন–'মন না রাঙায়ে কেন বসন রাঙালে যোগী ?'

সুতরাং সম্মান-মর্যাদার অধিকারী কেবল তারাই, যারা আল্লাহর গোলামী করেন। আর যারা একমাত্র আল্লাহর গোলাম, তারা অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে থাকেন।

www.pathagar.com

হকপন্থী পীর সাহেবগণ অবশ্যই হক কথা বলেন, আল্লাহ বিরোধী কোন কিছু তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার সাথে সাথে প্রতিবাদ করে থাকেন, মানুষকে নিজের গোলাম না বানিয়ে আল্লাহর গোলাম বানানোর চেষ্টা-সাধনা করে থাকেন। তারা রাজা-বাদশাহের মতো চলাফেরা করেন না। এরা সত্যকার অর্থেই আল্লাহভীরু। অর্থ-সম্পদের প্রতি এরা দৃষ্টি দেন না, দৃষ্টি দেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে আর এই ইবাদাতই মানুষের ভেতরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করবে। যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশী ভয় করে। (সূরা হুজুরাত- ১৩)

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর দাসত্ব করার লক্ষ্যে। সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো দাসত্ব করা। দাসত্বের মাধ্যমে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন, তারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত বান্দাহ্ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদাত গুজার কোন বান্দাহ্ সম্পর্কে অনুগ্রহ করে, কিছু বলেছেন–তখন পরম স্নেহের ভাষা, আদরের ভাষা ব্যবহার করেছেন। স্নেহের সেই ভাষাটি হলো, 'আব্দ' অর্থাৎ বান্দাহ্। যারা আল্লাহর দাসত্ব করবে তিনি তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে জান্নাত দান করবেন। সেই জান্নাতীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ মমতার ভাষায় বলেছেন–

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا–

(জান্নাতের) এ পানি হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধার) টা প্রবাহিত করে নিবে। (সূরা আদ্ দাহ্র- ৬)

জান্নাতে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা রয়েছে, এসব ঝর্ণার পানি হবে অত্যন্ত সুস্বাদু। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী করেছে, তারা জান্নাত লাভ করবে এবং সেই ঝর্ণার পানি পান করবে। পানি পান করার জন্য তাদেরকে ঝর্ণার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, তারা শুধু ইশারা করবে আর অমনি ঝর্ণা তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইবাদুল্লাহ বলে, তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কথা উল্লেখ করেছেন। যারা আল্লাহর দাসত্ব করে, তারা তাঁর কাছে কতটা সম্মান ও মর্যাদা ল্যাভ

www.pathagar.com

করবেন, তা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী করে, তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا–

রাহ্মানের বান্দাহ্ যারা তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে যমীনে চলাফেরা করে। (সূরা ফুরকান- ৬৩)

যারা আল্লাহর ইবাদাত করে, আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াতে তাদেরকে অত্যন্ত আদর করে 'রাহ্মানের বান্দাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর ইবাদাত এভাবেই মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করে দেয়। ইবলিস শয়তান আল্লাহর আদেশ অমান্য করার পরে যখন সে অভিশপ্ত হয়ে গেল, তখন সে আল্লাহর সামনে বলেছিল–হে আল্লাহ ! তোমার যে বান্দার কারণে আমি অভিশপ্ত হলাম, আমি সেই বান্দাদেরকে প্রতারণা, প্ররোচনা, লোভ-লালসা, প্রলোভন ইত্যাদির মাধ্যমে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো। তখন আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসকে বলেছিলেন–

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ–

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার প্রকৃত বান্দাহ যারা তাদের ওপর তোর কোন আধিপত্য চলবে না। তোর কর্তৃত্ব তো শুধু সেই বিভ্রান্ত লোকদের ওপরেই চলবে, যারা তোর অনুসরণ ও আনুগত্য করবে। (সূরা হিজর-৪২)

এ আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা পরম স্নেহের সাথে 'আমার বান্দাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহর দাসত্বকারী বান্দাহ্দেরকে এভাবে পবিত্র কোরআনে 'আব্দ' বা বান্দাহ্ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দ দিয়ে তাদের প্রতি সম্মান-মর্যাদা ও আল্লাহর রহমত-করুণার কথাই বলা হয়েছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে একটি মারাত্মক ধারণা পোষণ করে। তারা বলে–

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ–

খৃষ্টানারা বলে মসীহ হলেন আল্লাহর পুত্র। (সূরা তওবা-৩০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই মারাত্মক ধারণার প্রতিবাদ করে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মমতার সাথে জানিয়ে দিলেন–

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ–

www.pathagar.com

(মূলত) সে ছিলো আমারই একজন বান্দাহ্, যার ওপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, তাঁকে বনী ইসরাঈলীদের জন্য আমি (আমার কুদরতের) একটি অনুকরণীয় আদর্শ বানিয়েছিলাম। (সূরা যুখরুফ- ৫৯)

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া লজ্জার কোন বিষয় তো নয়-ই বরং গৌরবের। মানুষ আল্লাহর বান্দাহ্, এটা মানুষের অহঙ্কার। কোন নবী এবং ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ–

মসীহ্ আল্লাহর বান্দাহ্ এবং এ বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে তিনি কখনো লজ্জা অনুভব করেননি, এমনকি আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশ্তাগণও আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে লজ্জানুভব করেন না। (সূরা নেছা-১৭২)

আর যারা আল্লাহর গোলাম হওয়ার ব্যাপারে লজ্জানুভব করে এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করে, তাঁর গোলামী করতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন–

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا،

আল্লাহর দাসত্ব করার ব্যাপারে যারা লজ্জা পোষণ করবে, অহঙ্কার প্রদর্শন করবে, তাহলে তারা সেদিন আত্মরক্ষা করবে কিভাবে, যেদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে? (সূরা নেছা-১৭২)

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করা। এটা মানুষের জন্য সব থেকে বড়, নে'মাত যে, সে আল্লাহর বান্দাহ হতে পেরেছে। কারণ পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রাসূলই আগমন করেছিলেন, মানুষকে আল্লাহর বান্দাহ্ হিসাবে গড়ার জন্য। এই সম্মান ও মর্যাদা বড়ই দুর্লভ। আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে এই দুর্লভ গুণে মানুষকে গুণান্বিত হতে হবে। যারা এই গুণে গুণান্বিত হতে পারবে, তারই কেবল সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে কাছের-জন হলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁর পরম প্রিয় নবী-রাসূলদেরকেও তিনি পরম

www.pathagar.com

স্নেহভরে 'বান্দাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ، اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ-

এরূপই ঘটলো, যাতে আমি অন্যায় পাপ ও নিলর্জতা তার থেকে বিদূরিত করে দিই। প্রকৃত পক্ষে সে আমার নির্বাচিত বান্দাহ্দের একজন ছিল। (সূরা ইউসুফ- ২৪)

এ আয়াতে হযরত ইউসুফ (আঃ) কে মহান আল্লাহ্ আদর করে তাঁর 'বান্দাহ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত নবীদেরকে বিশেষ এলাকার জন্য, বিশেষ জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র পৃথিবীর নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর দরবারে যে কতটা উচ্চে তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর থেকে প্রিয় পাত্র আল্লাহর কাছে আর কেউ নেই। তাঁকেই আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বান্দাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন-

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا-

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। (সূরা বাকারা- ২৩)

সকল নবী-রাসূলকে আল্লাহ্ তা'য়ালা নাম ধরে সম্বোধন করলেও তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো নাম ধরে অর্থাৎ 'হে মুহাম্মাদ' বলে সম্বোধন করেননি। তাঁকে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, সে মর্যাদার কারণে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন না করে নানা ধরনের গুণবাচক নামে আহ্বান জানিয়েছেন। পরম মমত'ভবে 'বান্দাহ' নামে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা নাজ্ম এর ১০ নং আয়াতে বলেছেন-

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى-

অতঃপর তাঁর বান্দার কাছে যা ওহী করার ছিল, তা তিনি পূর্ণ করলেন। (সূরা নাজ্ম)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা আরেক আয়াতে বলেছেন-

www.pathagar.com

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا–

অতীব বরকতপূর্ণ সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার ওপরে ফোরকান অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা ফুরকান- ১)

মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল প্রসঙ্গে বলেছেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا–

পাক-পবিত্রতম সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাহ্কে রাতের একটি অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-১)

এ ধরনের অনেক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবিবকে আব্দ বলে সম্বোধন করেছেন। এই শব্দটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া সবচেয়ে বড় খেতাব। এই খেতাব যারা অর্জন করতে পারবে, তারাই কেবল জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে, অন্য কেউ নয়। এই খেতাব অর্জন করতে হলে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, গোলামী, আনুগত্য, বন্দেগী ও পূজা, উপাসনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন শির্ক এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না।

দাসত্বকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা

যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের লক্ষ্য করে ওয়াদা করেছেন। কর্মের মাধ্যমে যারা আল্লাহ্র 'বান্দাহ্' হওয়ার উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই পুরস্কার দান করবেন। সে পুরস্কার এই পৃথিবীতেও যেমন দেয়া হবে, তেমিন দেয়া হবে আখিরাতে। এটা আল্লাহ্র ওয়াদা–আর আল্লাহ্র ওয়াদার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, তাঁর ওয়াদাই হলো সবেচেয়ে দৃঢ় ওয়াদা। তিনি যে অঙ্গীকার করেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন। একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাতকারী বান্দাদের জন্য আল্লাহ এই পৃথিবীতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَيُمَكِّنَنَّ

لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَيُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا-

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যাকে আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের বর্তমান ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে। (সূরা নূর-৫৫)

আল্লাহর তা'য়ালার পরিষ্কার ওয়াদা, যারা আল্লাহর গোলামী করবে আল্লাহ্ তাদেরকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদেরকে দান করবেন। সেই সাথে যাবতীয় সন্ত্রাস বিদূরিত করে শান্তি দান করবেন। মানুষ যে ভীতিকর অবস্থায় বর্তমানে এই পৃথিবীতে বসবাস করছে, সন্ত্রাস নামক দানব যেভাবে গোটা মানবতাকে গ্রাস করেছে, এ থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করবে। এই বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষমতা ও শান্তি-স্বস্তি লাভ করার শর্ত হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এবং এই দাসত্বের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শির্ক করা যাবে না অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পাশাপাশি কোন মানুষের বানানো বিধানেরও অনুসরণ করা যাবে না। খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করতে হবে।

যারা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী বা দাসত্ব করবে, তারাই হবে এই পৃথিবীর শাসক। এরা শাসিত হবে না, গোটা বিশ্বকে এরা শাসন করবে। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা শাসিত (Dominated) হবে না বরং তোমরাই শাসন (Dominate) করবে। ভীতির পরিবর্তে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করার যে ওয়াদা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসাবে লেখা হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য যারা প্রকৃত ঈমানদার, চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দীয় আদর্শের আনুগত্যকারী এবং সবধরনের শিরক মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী। যাদের ভেতরে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নেই, নিছক মুখে ঈমানের দাবীদার, তারা আল্লাহর এই ওয়াদা লাভের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ ওয়াদা দেয়াও হয়নি। সুতরাং নামাজ-রোজার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে আর

www.pathagar.com

জীবনের অন্য সমস্ত বিভাগে মানুষের বানানো আইন-বিধান অনুসরণকারী তথাকথিত মুসলমানদের এই আশা নেই যে, তারা আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে পৃথিবীতে শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করবে।

আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী, ইবাদাত, পূজা-উপাসনাকারীদের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা যে পুরস্কার দান করবেন তাহলো, তিনি তাদেরকে এই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবেন, তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন, যাবতীয় সন্ত্রাস বিদূরিত করবেন এবং শান্তি ও স্বস্তি দান করবেন। এটা হলো পৃথিবীতে দেয়া পুরস্কার। তারপর তাদের ইন্তেকালের পরে আখিরাতের ময়দানে যে পুরস্কার দেয়া হবে, সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।'

অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা সফল হয়েছে। আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পৃথিবীতে যে দায়িত্ব তাদের ছিল, তারা সে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং দায়িত্ব পালন করেছে। এভাবে তারা সফলকাম হয়েছে অর্থাৎ জান্নাত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا، وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا، وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا–

পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দান করবো যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? (সূরা নিসা-১২২)

ইসলামে ইবাদাতের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইবাদাত যথাযথভাবে করার ওপরেই মানব জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। এ জন্য এই ইবাদাতের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা, যে সূরাটি মুসলমানদেরকে নামাজের মধ্যে বারবার পাঠ করতে হয়, সে সূরায় তা উল্লেখ করেছেন। ইবাদাত করলে আল্লাহ কি পুরস্কার দান করবেন, কোরআনে তাও উল্লেখ করেছেন,

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে এই ইবাদাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদেরকে করায়ত্ব করে পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসের অপশক্তিকে বিদায় করতে হবে। ইসলাম বিরোধী শক্তি পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে গোটা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের দানবকে অর্গল মুক্ত করে দিয়েছে। সন্ত্রাসের চিরাচরিত সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে। নিজেদের সন্ত্রাসী তান্ডবকে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে অবিহিত করছে আর মুসলমানদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাস নামে চিহ্নিত করছে। শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা মুসলিম দেশসমূহে মানবতা বিধ্বংসী ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ব্যবহার করে নারী, শিশু, কিশোর, কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে।

এই অবস্থা থেকে মানবতাকে রক্ষা করার জন্যই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর গোলামী করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে গোলামী করলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবেন, তখন আল্লাহ্ তাঁর গোলামদের মাধ্যমেই এই পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস বিদূরিত করে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত করাবেন।

ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা

এই 'ইবাদাত' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা বর্তমানে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইবাদাতের এই ভুল অর্থ, ভুল ব্যাখ্যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে ছড়িয়ে আছে। সাধারণ মুসলমানগণও যেমন ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে, তেমনি অসাধারণ মনে করা হয় যাদেরকে, তাদের একটি বড় অংশ এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকায় তারা ইবাদাতের প্রকৃত হক আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

সাধারণ মুসলমানগণ ইবাদাতের যে ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে তাহলো–তারা মনে করেছে, নামাজ-রোজা, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তেলাওয়াত করা, যিকির করা, তস্‌বীহ্ জপা ইত্যাদি হলো ইবাদাত। এসব পালন করার অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, তখন তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। এই স্বাধীন জীবনে তারা আল্লাহর বিধানের প্রতিটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে লংঘন করে। যারা রোজা পালন করে তারা বছরে একটি মাস রোজা পালন করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে তারা নামাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মনে করে, ইবাদাতের যাবতীয় হক আদায় হয়ে গেল।

এটাই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়? খুব বেশী হলে দেড় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই নামাজ আদায়ের নামই

www.pathagar.com

যদি ইবাদাত হয়, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, একজন মানুষ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলাম। অবশিষ্ট সাড়ে ২২ ঘন্টার জন্য সে অন্য কারো গোলাম।

এভাবে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলামী যে করলো তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিমাসে মাত্র ৪৫ ঘন্টা আল্লাহর গোলামী করলো। এক বছরে সে ৫৪০ ঘন্টা গোলামী করলো আল্লাহর। মানুষ যদি গড় আয়ূ লাভ করে ৬০ বছর, তাহলে সে গোটা জীবনকালে ৩২৪০০ ঘন্টা গোলামী করলো। ২৪ ঘন্টায় একদিন অনুসারে মানুষ ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ১৩৫০ দিন অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় আল্লাহর গোলামী করলো আর বাকি সাড়ে ৫৬ বছর অন্য কারো গোলামী করলো।

অন্যদিকে একমাস রোজা পালন করার নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে বছরের অবশিষ্ট ১১ মাসের জন্য সে অন্য কারো গোলাম। ৬০ বছরের জীবনকালে নিয়মিতভাবে প্রতি রমজান মাসে রোজা আদায় যদি করা হয়, তাহলে প্রতি বছরে ১ মাস হিসাবে মাত্র ৬০ মাস অর্থাৎ ৫ বছর হয়। মানুষ তার ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ৫ বছরের জন্য আল্লাহর গোলাম হবে আর অবশিষ্ট ৫৫ বছর অন্যের গোলামী করবে?

কোন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি শয়তানের গোলাম বা চাকর হতে প্রস্তুত রয়েছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলমানও স্বীকৃতি দিবে না যে, সে শয়তানের গোলামী করবে। সুতরাং ইবাদাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করার নামই ইবাদাত নয়। এগুলো অবশ্য করণীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, এগুলো তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত হলো ইবাদাতের একটি অংশ। ইবাদাতের যে বিশাল পরিধি রয়েছে, তার কিছু মাত্র অংশ হলো নামাজ-রোজা। এগুলো একমাত্র ইবাদাত নয়।

এই নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এগুলো যারা আদায় করে না, তারা ইবাদাতের যোগ্য কোনক্রমেই হতে পারে না। সৈনিক জীবেন যেমন কুচকাওয়াজ করাই একমাত্র কাজ নয়, যুদ্ধের যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ার লক্ষ্যেই তাদেরকে নানা ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়, কুচকাওয়াজ করানো হয়। তেমনি নামাজ-রোজা নিষ্ঠার সাথে আদায় করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বৃহত্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করতে হবে, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতার সাথে যেন পালন করতে সক্ষম হয়, সেই যোগ্যতা যেন মুসলমান অর্জন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান যেন আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্যই নামাজ-রোজা আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলমানরা কতটা ভুল অর্থ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তা বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিমদের করুণ অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করলে তাদেরকেই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করা হবে। পৃথিবীকে শাসন করবে তারা। এটা আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা। অথচ আমরা দেখছি, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করছে অর্থাৎ তারা নামাজ আদায় করছে, রোজা পালন করছে, হজ্জ পালন করছে, যাকাতও আদায় করছে কিন্তু পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করা তো দূরের বিষয়, গোটা পৃথিবীব্যাপী তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। এই পৃথিবীতে একটি কুকুর-বিড়ালের যে মূল্যায়ন করা হয়, মুসলমানদের ক্ষেত্রে হয় তার ব্যতিক্রম। তাহলে আল্লাহর ওয়াদা কি অসত্য? (নাউযুবিল্লাহ) মুসলমান আল্লাহর ইবাদাত করছে, তাদের এই দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে আল্লাহর ওয়াদা অসত্য বলে বিবেচনা করতে হয়। আল্লাহর ওয়াদা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহলে মুসলমানদের দাবী মিথ্যা বলে বিবেচনা করতে হয়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। তাঁর চেয়ে ওয়াদা রক্ষাকারী কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই। মুসলমানদের এই দাবীই মিথ্যা যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে। মুসলমানরা এই ইবাদাতের খন্ডিত অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ঠাহীনভাবে পালন করে থাকে। তারা নামাজ-রোজা আদায় করে অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন দল করে, যে দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বিপরীত।

ঘুষ গ্রহণ করে, ঘুষ দেয়, মদপান করে, জিনা-ব্যভিচার করে, অশ্লীলতা আর নগ্নতা প্রসার-প্রচার করে, মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে, প্রতিবেশীর হক আদায় করে না, মাতা-পিতার অধিকার ক্ষুন্ন করে, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করে, মিথ্যা মামলা করে, মিথ্যা সাক্ষী দেয়, নারী ধর্ষন করে, নরহত্যা করে, মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেয়, জীবিত ও মৃত মানুষকে শক্তিধর-নিজের প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে। এক টুকরা রুটি, এক পাত্র পানির আশায় আল্লাহর দুশমনদের দরজায় ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এমন কোন অপরাধ নেই যে, মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। অথচ তারা দাবী করছে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে।

হজ্জ আদায় করে মক্কা-মদীনায় দাঁড়িয়ে মুসলমান বলে দাবীদারগণ ওয়াদা করছে, দেশে প্রত্যাবর্তন করেই সেই ওয়াদা ভঙ্গ করছে। ব্যাংকে গিয়ে সুদের মধ্যে

www.pathagar.com

নিমজ্জিত হচ্ছে। সরকারের ট্যাক্স কমানোর জন্য ঘুষ দিয়ে ট্যাক্স কমিয়ে সরকারকে ধোকা দিচ্ছে। ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করছে। নির্বাচনের সময় পেশীশক্তি ব্যবহার করে জনগণের ভোট ছিন্‌তাই করছে। স্ত্রী-কন্যাদেরকে চলচিত্র জগতে পাঠিয়ে, মডেলিংয়ের নামে তাদের রূপ-যৌবন প্রদর্শনী করে দেহপসারিণী-রূপজীবিনীর ভূমিকা পালন করিয়ে অর্থ উপার্জন করছে। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশ-জাতির অর্থ আত্মসাৎ করে সে অর্থের সামান্য অংশ মসজিদ মাদ্রাসায় দান করে, মাজারে-মৃত মানুষের কবর আবৃত করার জন্য মূল্যবান চাদর কিনে দিয়ে ধারণা করছে, ইবাদাতের হক আদায় করা হলো।

এটাই যদি মুসলমানদের ইবাদাতের প্রকৃত স্বরূপ হয়, তাহলে পৃথিবীতে তারা ঘৃণিত লাঞ্ছিত কেন হচ্ছে? সত্যকারের ইবাদাত যদি মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর নেতৃত্ব ঈমানদের হাতে নেই কেন? মুসলমান যদি সত্যই ইবাদাত বুঝে করতো, তাহলে মানবতা আজ এতটা নিম্ন স্তরে নেমে যেতো না। বিশ্বজুড়ে অশান্তির আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তো না। সন্ত্রাস দমনের নামে অমুসলিম শক্তি মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালিয়ে নির্বিচারে গনহত্যা করতো না।

সাধারাণ মুসলমান এভাবে শুধু-নামাজ-রোজা, যাকাত দেয়া আর হজ্জ আদায়কে ইবাদাত মনে করেছে, রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প-সংস্কৃতি, যুদ্ধ,সমরনীতি ইত্যাদিকে ইবাদাত মনে করেনি। ব্যবসা, কৃষিকাজ চাকরীকে ইবাদাত মনে করেনি। মুসলমান চাকরী করে, অথচ সে চাকরীকে সে ইবাদাত মনে করে না বলেই চাকরীতে ফাঁকি দেয়। সুস্থ মানুষ অথচ সে মেডিকেল লিভ নিয়ে নিজেকে অসুস্থ দেখিয়ে ছুটি গ্রহণ করে তাবলিগে চিল্লা দিতে, ইজ্‌তেমায়, ইসালে সওয়াবে, ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেয় সওয়াবের আশায়। এটা স্পষ্ট ধোকাবাজি।

চাকরী জীবনে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা যথারীতি পালন করা অবশ্যকরণীয় তথা ইবাদাত। যারা চাকরী করে তাদের মধ্যে যারা নামাজ আদায় করে, নামাজের সময় হলে ফরজ নামাজ, সুন্নাত নামাজ আদায় করে পুনরায় নিজের কর্মে যোগ দিতে হবে। সময় ক্ষেপণ করার জন্য নফল নামাজ আদায় করা যাবে না। এর নাম ইবাদাত নয়, চাকরী ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা ফরজ। সুতরাং ফরজ ত্যাগ করে নফল আদায় করা যাবে না। একশ্রেণীর মানুষ এ ধরনের কাজ ইবাদাত মনে করেই করে। কিন্তু এসব ইবাদাত নয়। ইবাদাত হলো জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামী করা।

www.pathagar.com

ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ভুল করেছে আর এদের পক্ষে ভুল করাই বর্তমান পরিবেশে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর অসাধারণ মানুষও ইবাদাত সম্পর্কে ভুল করেছে। এরা মসজিদের চার দেয়ালে নিজেকে আবদ্ধ রাখা, খান্‌কায় বসে তস্‌বীহ্ জপ করা, হুজরাখানায় বসে নফলের পর নফল নামাজ আদায় করাকেই ইবাদাত মনে করেছেন। গোটা জাতি যখন জিনা ব্যভিচারে লিপ্ত, ঘৃণ্য সুদ নামক দানব যখন জাতিকে গ্রাস করছে, অশালীন অশ্লীল গান-বাজনার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, সন্ত্রাস জনজীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে, আল্লাহ্‌র আইন-বিধানের পরিবর্তে যখন মানুষের বানানো আইন চলছে, শয়তানি শক্তির সৃষ্ট ঝড় দাপটের সাথে এসে মসজিদের দরজায়, হুজরাখানা-খানকার দরজায় আঘাত করছে, তখনও এসব অসাধারণ মুসলমানগণ চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্ নামের যিকির করছেন, বিশালাকারের তস্‌বীহ্‌র দানা ঘুরিয়ে চলেছেন। এর নাম কি পরহেজগারী আল্লাহ্‌ভীতি বা ইবাদাত করা?

ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যখন সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করছে, দ্বীনি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে, মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে, মুসলিম মা-বোনদেরকে ধর্ষন করা হচ্ছে, মুসলিম শিশুদেরকে পা ধরে তার মাথা পাথরের ওপরে দেয়ালের সাথে আছাড় দিয়ে হত্যা করছে, পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানদেরকে পাখির মতো গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে, বোমার আঘাতে মুসলিম দেশ ধ্বংস হচ্ছে, মসজিদ ধূলার সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে, মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে অগণিত মুসলমানকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে যে মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ শ্রেণীর অসাধারণ মুসলমানগণ হুজরাখানা, খানকা আর মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে তসবীহ্ জপ করতে থাকে, যিকির করতে থাকে, নফল নামাজ আদায় করতে থাকে। এটাকেই কি ইবাদাত বলা হয়? মুসলিম দেশ ও জাতির এই দুর্দিনে যদি এগিয়ে যাওয়া না হয়, আন্তর্জাতিক দস্যুদের বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ না করা হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কণ্ঠ সোচ্চার না হয়, তাহলে যে ইবাদাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা হয়েছে, সেই ইবাদাত কোন কাজে আসবে না এবং এ ধরনের ইবাদাতকারীর জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।

যিকির ও তসবীহ্ তিলাওয়াত করতে হবে, কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে, নফল নামাজ তথা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে হবে, নফল রোজাও রাখতে হবে, সেই সাথে অন্যায়, অবিচার, অনাচার তথা আল্লাহ্ বিরোধী আইন-কানুন বিধান তথা যাবতীয় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ময়দানে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এতে যদি দেহের তপ্ত রক্ত ময়দানে ঢেলে দিতে হয়, তাই দিতে হবে।

www.pathagar.com

অর্থ-সম্পদ অকাতরে দু'হাতে বিলিয়ে দিতে হয় তাই দিতে হবে। যদি কারাগারের অন্ধ কুঠরীতে প্রবেশ করতে হয়, হাসি মুখে প্রবেশ করতে হবে। প্রয়োজনে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। ইবাদাতের এই হক আদায় করার জন্য যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতির মোকাবেলা হাসি মুখে করতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় হবে এবং আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়া যাবে।

হযারত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (রাহ), হযরত শাহ্‌জালাল (রাহ), হযরত খানজাহান আলী (রাহ), হযরত শাহ্ মাখদুম (রাহ), মুজাদ্দেদে আল-ফেছানী (রাহ), শহীদ সাইয়েদ আহ্‌মদ (রাহ), শহীদ ইসমাঈল হোসেন (রাহ), শহীদ মাহ্‌মুদ মোস্তফা আল মাদীন (রাহ)সহ অগণিত অসাধারণ মুসলমান তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেছেন, তসবীহ্ তিলাওয়াত, কোরআন তিলাওয়াত, যিকির, নফল নামাজ আদায় করেছেন। সেই সাথে তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে কোরআন ধারণ করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ভূমিকা পালন করাসহ ময়দানে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন।

নিজেকে রাসূলের আওলাদ বলে দাবী করে, নামের পূর্বে অসংখ্য বিশেষণ জুড়ে দিয়ে ইবাদাতের হক আদায় করা যাবে না। আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ যেভাবে ইবাদাতের হক আদায় করেছেন, সেভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব, বন্দেগী তথা ইবাদাত করতে হবে। সাধারণ এবং অসাধারণ মুসলমানগণ কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত, তসবীহ্, কোরআন তিলাওয়াত করবেন যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে বা তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে, সেই আল্লাহ্‌রই নির্দেশ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে ময়দানে প্রতিবাদী পদক্ষেপে বিচরণ করতে হবে।

সুতরাং ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, পবিত্র কোরআন কোন ধরনের কর্মকান্ডকে ইবাদাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কোন ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিল, এসব দিক বুঝতে হবে। ইবাদাত সম্পর্কে যদি ধারণা অর্জন করা না যায়, তাহলে মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় দেয়াই বৃথা। কারণ মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর ইবাদাত করার জন্য, আল্লাহ্‌র গোলামী করার জন্য।

www.pathagar.com

আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা

আল্লাহর ইবাদাত বা গোলামী কি ধরনের হতে হবে, এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে পেশ করেছেন। কেননা তিনিই আমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান এবং স্বয়ং আল্লাহ তাকে মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সম্পর্কে বলেন–

اِذْ قَالَ لَه رَبُّه اَسْلِمْ، قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

তার অবস্থা এই ছিল যে, তার রব যখন তাকে বললেন, অবনত ও অনুগত হও। তখনি সে বললো, আমি অনুগত হলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে। (সূরা বাকারা- ১৩১)

মহান আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা তিনি প্রদর্শন করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা যখনই তাকে অনুগত হওয়ার আদেশ দিলেন, তিনি তখনই তিনি তার মাথাকে নত করে দিলেন। তিনি যেভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে অবনত করে দিয়েছিলেন, তিনি ইবাদাতের ব্যাপারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেই একই পন্থা অবলম্বন করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন–

وَوَصّى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ-يبَنِىَّ اِنَّ اللّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ–

এ পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এই একই উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। সে বলেছিল, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই জীবন ব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়েই থাকবে। (সূরা বাকারা-১৩২)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা এক আল্লাহর গোলামী করা ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করবে না। শুধুমাত্র আল্লাহর-ই দাসত্ব করবে। হযরত ইয়াকুব (আঃ)ও তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকবে। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন, সে বিধান অনুসারেই জীবন পরিচালিত করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে থাকবে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি তাঁর সন্তানদের ডেকে যেসব কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা এভাবে শুনাচ্ছেন–

www.pathagar.com

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ، اِذْقَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ–

ইয়াকুব যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, হে পুত্রগণ! আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে? (সূরা বাকারা-১৩৩)

পৃথিবী থেকে চির বিদায়ের পূর্বে মুসলিম পিতার যা কর্তব্য, সেই কর্তব্যই তিনি পালন করেছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে সমবেত করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কার দাসত্ব করবে? সন্তানগণ জবাবে বলেছিলেন–

قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا، وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ–

তারা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদাত করবো, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক–ইলাহ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত হয়ে থাকবো। (সূরা বাকারা-১৩৩)

হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর প্রশ্নের জবাব সন্তানদের কাছ থেকে এভাবে পেলেন যে, আমরা ইবাদাত করবো আপনার রব-এর, যাকে আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ) রব হিসাবে, ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করেছিল। দাসত্বের বা গোলামীর পূর্ণাঙ্গ নমুনা হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। গোটা পৃথিবী যখন শির্কের কৃষ্ণ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তিনি তখন তাওহীদের উজ্জ্বল শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। আল্লাহর ইবাদাত করার ব্যাপারে যারা একনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত, নিবেদিত প্রাণ, তাদের নেতা হিসাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মনোনীত করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ–قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا–

স্মরণ করো, যখন ইবরাহীমকে তার রব্ব বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং সে ঐসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের নেতা করতে চাই। (সূরা বাকারা-১২৪)

www.pathagar.com

তার প্রথম পরীক্ষা ছিল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ হওয়া। দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিল, আল্লাহর আদেশে নির্জন মরুপ্রান্তরে নবজাতক সন্তানসহ স্ত্রীকে রেখে আসা। তৃতীয় পরীক্ষা ছিল, নিজের সন্তানকে আল্লাহর আদেশে কোরবানী দেয়া। স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, এসব পরীক্ষা ছিল বড় কঠিন পরীক্ষা। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এসব চরম কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে জানালেন–

سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ–

ইবরাহীমের প্রতি সালাম রইলো। (আল কোরআন)

এভাবে আনুগত্যের তথা ইবাদাতের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত জাতির পিতা হিসাবে নির্বাচিত করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হজ্জ এর ৭৮ নং আয়াতে বলেন–

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ، هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ–

তিনিই তোমাদের জাতির পিতা এবং তিনিই তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান।

ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীবাসীর সামনে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে পেশ করেছেন। তাঁকে মুসলিম জাতির পিতা ও নেতা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীমের মিল্লাত এবং তিনি যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করেছেন, সেটাই একমাত্র সত্য আর ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা যা বলে তা মিথ্যা। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصٰرى تَهْتَدُوْا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ–

ইয়াহুদীরা বলে-ইয়াহুদী হও, তাহলে সত্য পথ লাভ করতে পারবে। খৃষ্টানরা বলে খৃষ্টান হও তবেই সত্য পথের সন্ধান পাবে। (আল্লাহ বলেন) এদের সবাইকে বলে দাও যে, এর কোনটিই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করো। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সূরা বাকারা-১৩৫)

ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের ব্যাপারে স্পষ্ট বলে দেয়া হলো, তোমাদের কোন কথা বা দাবী সত্য নয়। বরং তোমরা তোমাদের ভ্রান্তপথ ত্যাগ করে হযরত ইবরাহীমের আদর্শে

www.pathagar.com

দিক্ষিত হও, তার মিল্লাতের মধ্যে শামিল হয়ে যাও, তাকে অনুসরণ করো আর এটাই হলো মুক্তির একমাত্র পথ তথা আল্লাহর আনুগত্যের পথ। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন–

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ–

অতপর (হে নবী!) আমি আপনার ওপর ওহী পাঠালাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো; আর সে কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলো না। (সূরা আহ্ নাহ্ল- ১২৩)

ইবাদাতের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হবার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন–

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَيْرُالْبَرِيَّا–

ইবরাহীম (আঃ) হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যক্তি। (মুসলিম)

এ জন্য আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব, গোলামী বা ইবাদাতের মানদন্ড হিসাবে আমাদেরকে ইবরাহীম (আঃ) এর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিভাবে তিনি কোন ধরনের প্রশ্ন বা আপত্তি ব্যতীতই আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন। কোরআনে এসব ঘটনা গাল-গল্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। এসব ঘটনা থেকে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করবে এ জন্য এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।

মানুষের জীবনে যতগুলো প্রয়োজন রয়েছে, তার ভেতরে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, খাদ্য এবং নিরাপত্তা। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের অন্যতম অধিকারও এ দুটো বিষয়। মানুষ পেট ভরে আহার করতে চায়, ক্ষুধা মুক্ত থাকতে চায় এবং নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করতে চায়। নির্বাচনের সময় চিহ্নিত কোন সন্ত্রাসীকে মানুষ নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করে না। প্রার্থীদের মধ্য থেকে যার প্রতি এমন আস্থার সৃষ্টি হয় যে, এই লোকটি আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ দান করতে সক্ষম হবে, ভোটাররা তাকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। কিন্তু মানুষের ভাগ্যলিপির নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, মানুষ তারই মতো আরেকজন মানুষকে খাদ্যদাতা, নিরাপত্তা বিধানকারী করে মনে করে চিরকালই ভুল করেছে। উল্লেখিত দুটো জিনিস মানুষ লাভ করতে পারেনি। অথচ আল্লাহ এই মানুষের কাছে ওয়াদা

www.pathagar.com

করেছেন, তোমরা আমার ইবাদাত করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্য ও নিরাপত্তা দান করবো। সূরা কুরাইশে বলা হয়েছে–

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ، الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ، وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ-

সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো এই ঘরের রব-এর ইবাদাত করা, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে দুরে রেখে নিরাপত্তা দান করেছেন। (সূরা কুরাইশ)

জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে একমাত্র আমার গোলামী করো, আমার দাসত্ব করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্যদান করবো, আমিই তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করবো। একনিষ্ঠভাবে আমারই আনুগত্য করো।

আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, যে এলাকার লোকজন একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য, দাসত্ব, গোলামী, পূজা-উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের কোন অভাব থাকবে না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। নানা ধরনের ফসল এমনভাবে উৎপাদিত হবে যে, মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার পরও তা উদ্বৃত্ত রয়ে যাবে। তিনি আকাশ ও যমীনের বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ-

লোকালয়ের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং আমাকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকাশ ও জমিনের বরকতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতাম। (সূরা আ'রাফ-৯৬)

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি মানুষের দাবী

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের সবচেয়ে বড় দাবী কি হতে পারে, এ কথাও মানুষ জানে না। স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তা অনুগ্রহ করে, মেহেরবানী করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষকে এভাবে আল্লাহর কাছে দাবী জানাতে বলেছেন, আমাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করো। মানুষের চাওয়ার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ গোটা ত্রিশপারা কোরআন বান্দার সামনে পেশ করে দিয়ে জানালেন, তোমরা যে সহজ সরল পথের দাবী আমার কাছে পেশ করেছো, এটাই সেই সহজ সরল পথ। একমাত্র আমার দাসত্ব করবে এটাই হলো সবচেয়ে সহজ সরল পথ। সূরা ইয়াছিনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করবে আর এটাই হলো সহজ সরল পথ।

পৃথিবীতে ক্ষুধা মুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা, স্বস্তি, শান্তি অর্থাৎ মানুষের মৌলিক অধিকার লাভ করতে হলে যেমন একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাত তথা দাসত্ব করা প্রয়োজন, তেমনি পরকালে জান্নাত লাভ করতে হলেও আল্লাহর ইবাদাত করা অপরিহার্য।

জান্নাতে কে না যেতে চায়, সবাই জান্নাতের প্রত্যাশা করে থাকে। ইবাদাতের ভুল অর্থ গ্রহণ করে যেসব মানুষ ইবাদাতের ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তারাও কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাঁর জান্নাত লাভের আশাতেই তা করেছে। মুসলমান বলে দাবী করে কিন্তু পাপাচারে নিমজ্জিত থাকে, এ লোকগুলোও আল্লাহর জান্নাত কামনা করে। আল্লাহ্ যেন তাদের ক্ষমা করে দেন, এ কারণে তাদের মৃত্যুর পর কোরআন খানি ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়, দান-খয়রাত করা হয়। লোকজন ভাড়া করে এসব আয়োজন করার মধ্যে কি স্বার্থকতা রয়েছে, তা আয়োজকরা আদৌ জানে কি না সন্দেহ। তবুও মৃত ব্যক্তি যেন জান্নাত লাভ করতে পারে, এ আশাতেই তারা ঐসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর জান্নাত লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো নির্ভেজাল পদ্ধতিতে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাত করা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ، وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ-

আমার ইবাদাতকারী বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। (সূরা ফাজর-৩০)

মহান আল্লাহ বলেন, বান্দাহ্–আমার জান্নাতে যেতে চাও! তাহ্‌লে আমার গোলামীর খাতায় সর্বপ্রথমে নিজের নামটি লিপিবদ্ধ করো, আমার গোলামী, বন্দেগী, দাসত্ব, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা করো। তাহলে তোমরা আমার জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে। জান্নাতীরা আল্লাহ্‌র জান্নাতে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে। সেখানে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো মহান আল্লাহ্‌র দিদার লাভ। কেউ যদি জান্নাতে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সবচেয়ে বড় পাওয়া যদি কেউ পেতে চায় তাহলে তাকেও একমাত্র ঐ আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا–

সুতরাং যে তার রব-এর সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং দাসত্ব করার ক্ষেত্রে নিজের রব-এর সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়। (সূরা কাহ্ফ-১১০)

যদি কেউ প্রশ্ন ওঠায়, আল্লাহ্‌র এই গোলামী করার কি কোন নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে বা জীবনের কতটুকু সময় এই গোলামী করতে হবে? এই প্রশ্নের জবাবও মানুষকে মহান আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন–

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنَ–

যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে নিশ্চিত (মৃত্যুজনিত) ঘটনা না আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মালিকের দাসত্ব করতে থাকো। (সূরা আল হিজর-৯৯))

মানব জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই গোলামী করতে হবে। পৃথিবীর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ্‌র গোলাম হয়ে থাকবে এবং তাঁরই গোলামীর মাধ্যমেই সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে।

পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র

সমস্ত সৃষ্টির মালিক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এসব সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্বও আল্লাহ্‌র। এই দায়িত্ব তিনি অন্য কারো প্রতি অর্পণ করেননি।

www.pathagar.com

স্বয়ং তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ জন্য মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, আমার কাছে এমন একটি পথ তোমরা কামনা করো, যে পথ হবে সত্য, সহজ-সরল। কারণ এই পৃথিবীতে অসংখ্য বাঁকা পথ রয়েছে, এসব পথ তোমাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, এসব পথে চললে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে যেখানে সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই অর্পিত হয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল-৯)

পৃথিবীর মানুষের জন্য চিন্তা-চেতনা ও কর্মের নানা ধরনের পথ হতে পারে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। পৃথিবীতে এই অসংখ্য পথের সবগুলোই তো আর সত্য হতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। যেমন যেসব শিক্ষার্থীগণ যখন অঙ্ক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তখন যারা অঙ্কে ভুল করে, তাদের ফলাফল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর যারা নির্ভুল অঙ্ক করে, তাদের ফলাফল একই রকম হয়। এতে প্রমাণ হলো, সত্য হয় একটি আর মিথ্যা হয় অনেকগুলো।

সুতরাং সত্য পথ হয় একটি এবং যে জীবনাদর্শটি এ সত্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেটিই একমাত্র সত্য জীবনাদর্শ। অন্যদিকে কর্মের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং এ পথগুলোর মধ্যে যেটা সত্য-সঠিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটিই একমাত্র সঠিক পথ। এই সত্য-সঠিক নির্ভুল আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। শুধু বড় প্রয়োজনই নয় বরং মানব জীবনের প্রকৃত মৌলিক প্রয়োজন।

এর কারণ হলো, পৃথিবীর সমস্ত জিনিস তো মানুষের কেবলমাত্র এমন সব প্রয়োজন পূরণ করে যা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। পক্ষান্তরে সহজ-সরল, সত্য পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষ হবার কারণে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়। এই বিষয়টি যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ এটাই হয় যে, মানুষ হিসাবে তার পৃথিবীতে আগমনই ব্যর্থ হয়েছে।

যে আল্লাহ মানুষের অস্তিত্ব দানের পূর্বে মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যিনি মানুষের অস্তিত্ব দান করার পর

www.pathagar.com

জীবন ধারণ করার প্রতিটি প্রয়োজন পূর্ণ করার এমন সুক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করেছেন, সেই আল্লাহ মানুষের মানবিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আসল প্রয়োজন পূরণের তথা পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না, এটা তো হতে পারে না।

এ জন্য বান্দাহ যখন দাবী পেশ করছে, 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য সহজ-সরল পথপ্রদর্শন করো, যে পথ তোমার নে'মাতে পরিপূর্ণ, সে পথ আমাদেরকে দেখাও।' তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হলো, 'আমার দাসত্ব করবে আমার আনুগত্য করবে, এটাই সেই পথ যা তোমরা দাবী করছো।' মহান আল্লাহ রাব্বুল মানব জাতিকে এই হেদায়াত দানের লক্ষ্যেই নবুওয়াতের ব্যবস্থা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি আমার এই নবুওয়াত গ্রহণ না করো, তাহলে বলে দাও তোমাদের ধারণা অনুসারে তোমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আমি অন্য কি পদ্ধতি দান করেছি ? তোমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলো যে, আমি তোমাদেরকে যে চিন্তাশক্তি দিয়েছি, তা প্রয়োগ করে তোমরা নিজেরা পথ আবিষ্কার করে তা অনুসরণ করবে। এ কথা তোমরা বলতে পারো না–কারণ তোমাদের এই মানবিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ইতোপূর্বেই এমন অসংখ্য পথ-মত উদ্ভাবন করেছে যে, তা সবই অসত্য, অনুসরণের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তোমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছো।

এরপর তোমরা আমার ওপর এই অভিযোগও আরোপ করতে পারো না যে, আমি তোমাদেরকে কোন পথই প্রদর্শন করিনি। কারণ, তোমরা মানুষ আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব। আমি তোমাদের প্রতিপালন ও বিকাশ লাভের জন্য এতসব বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে রেখেছি অথচ তোমাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শন না করে একেবারে তিমিরাবৃত পরিবেশে অন্ধকারের বুকে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে বেড়ানোর এবং প্রতি পদে আঘাত পাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি? না, এমন করে তোমাদেরকে আমি ছেড়ে না দিয়ে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমি আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে জন্মগতভাবে, স্বভাবগতভাবে সত্য সঠিক পথে চলার প্রেরণা দান করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টির মতো তিনি সত্য পথে চলার জন্মগত প্রেরণা মানুষের ভেতরেও দান করতে পারতেন। নবী-রাসূল, নবুওয়াত-রেসালাতের কোন প্রয়োজনই তাহলে হতো না। মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই

সত্য পথের অনুসারী হতো। কিন্তু মহান আল্লাহর সেটা আভিপ্রায় নয়। তাঁর অভিপ্রায় হলো, তিনি এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটাবেন যে, যে সৃষ্টি তার নিজের পছন্দ ও বিচার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ভ্রান্ত-অভ্রান্ত তথা যে কোন ধরনের পথে চলার স্বাধীনতা রাখবে।

এই স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জ্ঞানের উপকরণে সজ্জিত করা হবে। বুদ্ধি ও চিন্তার যোগ্যতা এবং ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের শক্তি দান করা হবে। তাকে নিজের দেহের অভ্যন্তরের ও দেহের বাইরের অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। তার ভেতরের ও বাইরের সমস্ত দিকে এমন সব অসংখ্য অগণিত কার্যকারণ ছড়িয়ে রাখা হবে যা তার জন্য সঠিক পথ লাভ করা ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়া–এ দুটোরই কারণ হতে পারে।

যদি মানুষকে স্বভাবগত বা জন্মগতভাবে সঠিক পথের অনুসারী করা হতো, তাহলে এসবই অর্থহীন হয়ে যেতো এবং উন্নতির এমন সব উচ্চতম পর্যায়ে পৌছানো মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। মানুষকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই সে তার চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক পথে পরিচালিত করার নীতি পরিহার করে নবুওয়াত-রিসালাতের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের স্বাধীনতা যেমন অক্ষুন্ন থাকবে তেমনি মানুষের পরীক্ষার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং সত্য সহজ-সরল ও সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে তার সামনে পেশ করে দেয়া হবে। সুতরাং সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজে গ্রহণ করেছেন। মানুষ যখন তাঁর কাছে আবেদন জানালো সত্য পথের জন্য, তখন তাঁর সামনে গোটা কোরআন দিয়ে বলে দেয়া হলো, এই কোরআনের বিধান অনুসরণ করো। তোমরা যে হেদায়াত চাচ্ছো, এই কোরআনই হলো সেই হেদায়াত।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁরই দেয়া হেদায়াত মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাহ্ অনুযায়ী ইবাদাত করার এবং পার্থিব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তা বাস্তবভিত্তিক অনুসরণ করে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন।

www.pathagar.com

ঈমানী জিন্দেগীর সাফল্য ও ব্যর্থতার মানচিত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানব জীবনে সময়ের গুরুত্ব

বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের ত্রিশ পারার ছোট্ট সূরার নাম আল আসর। মাত্র তিন আয়াত বিশিষ্ট এই ছোট্ট সূরার প্রথম আয়াতেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সময়, কাল বা ইতিহাসের শপথ করে বলেছেন যে, সমস্ত মানুষ এক মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। বিশেষ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে এ কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সমস্ত মানব মন্ডলীর কথা। সমস্ত মানুষ ক্রমশঃ মহাক্ষতির দিকে এবং নিরুদ্দেশের পথে অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান। যে ক্ষতিকর পথে মানুষ এগিয়ে চলেছে সে পথের শেষে রয়েছে এক মহাধ্বংস গহ্বর। তবে সেইসব লোকগুলো এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে, যাদের মধ্যে চারটি গুণের সমাহার ঘটেছে। প্রথম গুণটি হলো ঈমান। দ্বিতীয় গুণটি হলো আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ। তৃতীয় গুণটি হলো মহাসত্যের ব্যাপারে একে অপরকে উপদেশ দেয়া বা উৎসাহিত করা। চতুর্থ গুণটি হলো, মহাসত্য গ্রহণ করার পরে যে সব পরীক্ষা আসে, সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া এবং এ ব্যাপারে পরস্পরকে উৎসাহিত করা।

এখানে প্রশ্ন জাগে, এই কথাগুলো বলার জন্য কেনো সময়ের শপথ করা হয়েছে? পৃথিবীতে মানুষ কোন বিষয়ের বা কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অথবা নিশ্চিত করে বলার জন্য মহান আল্লাহর নামে শপথ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ যখন কোন বিষয়ের শপথ করে যে কথা বলতে চান, শপথকৃত বিষয়ের সাথে মূল কথার এক অপূর্ব সামঞ্জস্য থাকে। যে কথাটি তিনি বলতে চান, শপথকৃত উক্ত জিনিস তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তিনি সে বিষয়ের শপথ করেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা আসরে কালের শপথ করেছেন। কাল বা সময় অত্যন্ত তীব্র গতিতে মানব জীবনকে জীবনের শেষ প্রান্তে অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে। এ জন্য সময় মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে যতটুকু সময়কাল নির্ধারণ করেছেন, তার অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও কারো পক্ষে এখানে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে মানুষ সময়ের যে হিসাব করে, সেই সময় অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যদি ৮০ বছর তিনদিন তিন ঘন্টা তেত্রিশ সেকেন্ড নির্ধারণ করে রাখেন, তাহলে সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যাবতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে চৌত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করতে পারবে না। মানব সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সময়কাল থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নির্ধারিত এই সময়ের খুব কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। মানব

www.pathagar.com

সন্তান শৈশব অতিক্রম করে কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের কোঠা ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে, এর অর্থ হলো বদ্ধ কলি থেকে ফুল যেন প্রস্ফুটিত হলো। আর ফুল প্রস্ফুটিত হবার অর্থই হলো এখন সে যে কোন মুহূর্তে ঝরে যাবে। রোদ, বৃষ্টি-ঝড়ে ফুল ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। মানুষ যৌবনে পদার্পণ করার অর্থই হলো সে এখন ক্রমশ প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের সোনালী যৌবনের সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, মহাকাল সেই সৌরভ ক্রমশ নিঃশেষে চুষে নেয়। যৌবনের সুষমা, লাবণ্য আর মাধুরীময় আভা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায়। যে সময় মানব জীবন থেকে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, সে সময় প্রাণান্তকর সাধনার পরেও আর ফিরে পাওয়া যায় না। মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে মহামূল্য সময়। এই সময়ই মানুষকে পরিপক্ক করে, কোনো মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্মলাভ করে না। নদীর স্রোত আর কালের স্রোতের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, নদীর স্রোত ইচ্ছে করলে থামিয়ে দেয়া বা তার গতি পরিবর্তনও করা যায়, কিন্তু কালের স্রোতের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। অর্থের অপব্যবহার করলে তাকে অমিতব্যায়ী বলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় অমিতব্যায়ী হলো সময়ের অপব্যবহার যে করে। কারণ সময় হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর মানুষ এই বড় সম্পদই সবচেয়ে বেশী অপচয় করে থাকে।

আজকের এই নবীন উষা কিছুকাল পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। অর্থ সম্পদ হারালে তা ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। জ্ঞানের অভাব হলে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সংযম বা ওষুধের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়। বর্তমান বলে কিছুই নেই, যে মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যায়, অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ–আর তাদের মধ্যে হাইফেন হয়ে আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান, যা থেকেও নেই, যা এক মুহূর্তে থেকে সেই মুহূর্তেই নেই হয়ে যায়, এরই নাম সময়। যে ফুল গভীর নিশীথে ঝরে পড়েছে, তা আর কখনোই ফুটবে না। যে সময় চলে যাচ্ছে মানব জীবনের ওপর দিয়ে, তা আর ফিরে আসবে না।

এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা সময়ের শপথ করেছেন, কারণ এই জীবনের সময়কাল অতিদ্রুত ফুরিয়ে আসছে, অথচ সেই সময়কে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করা হচ্ছে না। এই জন্যই বলা হয়েছে, সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, ব্যতিক্রম শুধু তারাই–যারা জীবনকালকে সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণে গুণান্বিত করে অতিবাহিত করছে।

www.pathagar.com

এখানে বর্তমান বলে কিছুই নেই–এই মুহূর্তটি পর মুহূর্তেই অতীতের গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। প্রতিটি অনাগত মুহূর্ত এসে ভবিষ্যতকে বর্তমানে রূপান্তরিত করছে এবং বর্তমান মুহূর্ত চোখের পলকে অতিবাহিত হয়ে কালের গর্ভে প্রবেশ করে বর্তমানকে অতীতে রূপান্তরিত করছে। বাড়ির ঘড়িটি সেকেন্ডের স্তর পার হয়ে মিনিট অতিক্রম করে ঘন্টা চিহ্নিত স্থানে গিয়ে শব্দ করে বাড়ির মালিককে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'ওহে গৃহকর্তা! এখনো সাবধান হও, তোমার জন্য নির্দিষ্ট জীবনকাল থেকে একটি ঘন্টা পুনরায় কোনদিন ফিরে না আসার জন্য মহাকালের বিবরে গিয়ে প্রবেশ করলো।' মানুষ তার জীবনকাল সম্পর্কে দীর্ঘ আশা পোষণ করে অথচ ক্ষণপরে কি ঘটবে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। কবি বলেছেন–

اگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہی

سامان سو برس کے ہیں پل کی خبر نہی

আগাহ্ আপনি মওত সে কো-ই বাশার নেহি

সামান সও বরস্ কে হেঁ হ্যায় পল কি খবর নেহি।

মানুষ সজাগ সচেতন নয়, মৃত্যুর ভয়শূন্য তার হৃদয়। মুহূর্ত পরে কি ঘটবে তা তার জানা নেই অথচ সে শত বছরের জীবন-যাপনের উপায়-উপকরণ যোগাড়ে ব্যস্ত।

মানব জীবন নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ

পৃথিবীর শিক্ষাঙ্গনসমূহে যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রশ্ন পত্রের ওপরে লেখা থাকে, 'সময়–৩ ঘন্টা।' অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলা হয়েছে, তা তিন ঘন্টার মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে। শুধু লিখলেই চলবে না, সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রশ্নের সঠিক উত্তর যথাযথভাবে লিখতে হবে। তাহলেই কেবল পরীক্ষায় যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। নির্দিষ্ট এই সময় অতিক্রান্ত হলে পরীক্ষার্থীকে সময় দেয়া হয় না। পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষার স্থানে প্রশ্নের উত্তর না লিখে সময় ক্ষেপণ করে, তাহলে সে কোনভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরে পরীক্ষার্থী যত অনুরোধই করুক না কেন, তাকে কিছুতেই সময় দেয়া হয় না।

মানব জীবনের বিষয়টিও ঠিক এমনি। এই পৃথিবীতে তাকে নির্দিষ্ট সময়কাল দেয়া হয়েছে এবং তাকে এখানে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এখানে তার কাজ হলো সে আঁকা-বাঁকা পথ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ যে পথ তাকে প্রদর্শন করেছেন, সেই পথে সে তার জীবনকাল অতিবাহিত করবে। সময় মানব জীবনের প্রকৃত

www.pathagar.com

মূলধন। এই মূলধন তাকে যথার্থ পন্থায় ব্যয় করতে হবে। যে কাজের জন্য বরফ নিয়ে আসা হলো, সেই কাজে বরফ ব্যবহার না করে তা যদি ফেলে রাখা হয়, তাহলে সে বরফ তো অত্যন্ত দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তা কোনো কাজেই লাগবে না।

মানুষের জীবনও বরফের মতোই। তাকে যে নির্ধারিত জীবনকাল দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কালের কালো গহ্বরে প্রবেশ করছে। মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়কে যদি অপচয় করা হয় বা সৃষ্টি জগতের প্রতি পালক মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে তা ব্যয় করা হয়, তাহলে এ কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, সে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সে স্বয়ং নিজের যে ক্ষতি করছে, সেই ক্ষতি কখনো পুষিয়ে নেয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ জন্য কালের শপথ করে বলেছেন, মহাকালের তীব্র গতিশীল স্রোতই জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, চারটি গুণ বিবর্জিত মানুষ অর্থহীন কাজে নিজের মহামূল্যবান জীবনকাল ক্ষয় করছে, তা সবই অকল্পনীয় ক্ষতিকর বিষয়। এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে কেবলমাত্র মুক্ত থাকতে পারবে তারাই, যারা নিজের জীবনে সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণ অর্জন করেছে তথা নিজেকে উক্ত চারটি গুণে গুণান্বিত করেছে। সূরা আসরে যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়-ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দল, গোষ্ঠী তথা পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। বিষাক্ত পানীয় যদি কোনো ব্যক্তি পান করে, তাহলে তার ওপর যেমন বিষের প্রতিক্রিয়া হবে, তেমনি সমাজের সকল ব্যক্তি বা একটি দেশের সকল জনগণ যদি তা পান করে, তাহলে এক ব্যক্তির ওপরে তা যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, গোটা দেশের জনগণের উপরও সেই একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

সূরা আসরে আল্লাহ তা'য়ালা চারটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। সে চারটি গুণ হলো– ঈমান, আমলে সালেহ তথা সৎকাজ, মহাসত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান তথা হকের দাওয়াত এবং এ কাজ করতে গিয়ে যে ধৈর্যের প্রয়োজন, সেই ধৈর্য নামক মহান দুর্লভ গুণ। এই চারটি গুণ সম্পর্কে তাফসীরে সাঈদী-সূরা আল আসরের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই চারটি গুণের অভাবে যেমন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা মানব সভ্যতা। এই সূরায় উদ্ধৃত চারটি মৌলিক গুণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি ও জাতি এক মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এটা এমনই এক ক্ষতি যে, এই ক্ষতি কোনভাবেই পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হতে পারে, ক্ষতির ধরনটা কেমন? কারণ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তারা যে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত-সেটা তেমন একটা বুঝা যায় না। কারণ তারা একের পর এক আবিষ্কার করে গোটা পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে অবাক করে দিচ্ছে। তাদের জীবন যাত্রার মান ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমরাস্ত্র ইত্যাদি-দিক থেকে ক্রমশঃ উন্নতিই করছে। অর্থাৎ এই দৃশ্যই সর্বত্র দেখা যাচ্ছে যে, সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণ ব্যতীতই তারা সফলতা ও কল্যাণ লাভ করছে। এসব প্রশ্নের জবাব কি?

ক্ষতির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য

এ কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর কোরআন আলমে আখিরাতে মানুষের সাফল্য লাভকেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ এবং সেই জগতে তার ব্যর্থতাকেই প্রকৃত ব্যর্থতা বা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই পৃথিবীতে এক ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাঙ্গন থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করলো, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের মূল কর্ণধারের পদটি তাকে দেয়া হলো এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ তাকে নেতা হিসাবে অনুসরণ করলো, ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপায়-উপকরণ তার পদানত হলো, কোন কিছুর অভাব এবং দৈন্যতার সাথে তার কখনো পরিচয় ঘটলো না, গোটা বিশ্বের ওপরে তার একচ্ছত্র ক্ষমতা পাকাপোক্ত হলো, মানুষের দৃষ্টিতে এই লোকটিই হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সফলতার অধিকারী এবং তার মাতা-পিতা একজন সফল সন্তানের অধিকারী হিসাবে মানুষের কাছে বিবেচিত হলো।

পক্ষান্তরে মানুষের দৃষ্টিতে সেই সফল ব্যক্তি তার জীবনে মুহূর্ত কালের জন্যও তার আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি আদেশও মানলো না, বরং তার গোটা জীবনকাল ব্যাপী লোকটি পৃথিবী থেকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী দল ও লোকগুলোর প্রতি জুলুম অত্যাচার চালালো, আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে কারারুদ্ধ করলো। এই ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জগতে সবথেকে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে এবং সবার তুলনায় এই ব্যক্তিই ব্যর্থতার মুখোমুখি হবে। পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহ বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, হাশরের ময়দানে তাদের সৎকর্মের পাল্লা ভারী হবে এবং এরাই সফলতা অর্জন করবে। আর যারা মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, তাদের পাল্লা হাল্কা হবে এবং এরাই হবে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

www.pathagar.com

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِايٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ-

যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কারণ তারা আমার বিধানের সাথে জালিমদের অনুরূপ আচরণ করছিলো। (সূরা আ'রাফ-৮-৯)

আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ব্যর্থ হবে

মানুষ মূলতঃ সৃষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহর গোলামী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করার পরপরই তাদেরকে আপন স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আমি কি তোমাদের রব নই? সমস্ত মানুষ সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি-নিশ্চয়ই আপনিই আমাদের রব।' অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনারই আইন-কানুন ও বিধান অনুসরণ করবো এবং আপনারই দাসত্ব করবো। আপনার দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করবো। এভাবে মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আনুগত্যের স্বীকৃতি (Oath of allegiance) দিয়েছে।

সমস্ত সৃষ্টিলোকও সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষকে একমাত্র ঐ রব-এরই গোলামী করতে হবে, যিনি তাকে অনুগ্রহ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন ধারণের জন্য যাবতীয় কিছু তার অনুকূল করে দিয়েছেন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে মানুষ তার আপন রব-এর কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, সে তাঁরই গোলামী করবে। এরপর পৃথিবীতে এসে যারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে অথবা মানুষের বানানো বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তারাই মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ্ বলেন-

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِه، وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَاللّٰهُ بِه اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যাকে যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা বাকারা-২৭)

এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষ যতক্ষণ একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই আইনদাতা, বিধানদাতা হিসাবে অনুসরণ করে, ততক্ষণ সে নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। আর যখনই মানুষ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ত্যাগ করে ভিন্ন কোন বিধান অনুসরণ করে, তখনই সে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় নিমজ্জিত হয় এবং গোটা পৃথিবীব্যাপী ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেয়। সুতরাং যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে তারাই সফল আর যারা এই বিধান ত্যাগ করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَنْ يَّكْفُرْبِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ–

যারা এর সাথে (আল্লাহর বিধানের সাথে) কুফরী আচরণ করে মূলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা বাকারা-১২১)

প্রকৃত দেউলিয়া কোন্ ব্যক্তি

এই পৃথিবীতে মানুষ পরকাল ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হলেই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কারণ একমাত্র পরকালের ভয় তথা পৃথিবীর যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতিসম্পন্ন লোকদের পক্ষেই এই পৃথিবীকে একটি শান্তির নীড় হিসাবে গড়া সম্ভব। আর যাদের ভেতরে সেই অনুভূতিই নেই, তারাই মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং এরাই হলো সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَدْ خَسِرَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ–

ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেসব লোক, যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার খবরকে মিথ্যা মনে করেছে। (সূরা আনআ'ম–৩১)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিই সবথেকে সফলতা অর্জন করলো, যে ব্যক্তি তার গোটা জীবনকাল ব্যাপী আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে নিজের জীবন পরিচালিত করলো তথা সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করলো। যদিও সে ব্যক্তি পৃথিবীতে চরম অভাবের ভেতরে জীবন

www.pathagar.com

অতিবাহিত করেছে–তবুও সে তাঁর স্রষ্টা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সফলতা ও কল্যাণ অর্জন করেছে। মোট কথা, পরকালে যারা সফলতা অর্জন করতে পারবে কেবলমাত্র তারাই সফল হবে আর পরকালে যারা ব্যর্থ হবে, তারাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এবং এটাই স্পষ্ট দেউলিয়াপনা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، اَلَاذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ–

বলো প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার, পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা। (সূরা আয্ যুমার-১৫)

কোন মানুষের ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত সমস্ত পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যবসার অঙ্গনে তার পাওনাদারের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, নিজের যাবতীয় কিছু দিয়েও সে দেনামুক্ত হতে পারে না তাহলে এই অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়া (Bankrupt) বলে। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম বিরোধিদেরকে লক্ষ্য করে এই রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। মানুষ এই পৃথিবীতে জীবন, আয়ু, জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি, মেধা, দেহ, শক্তি, যোগ্যতা, যাবতীয় উপায়-উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধাসহ যত জিনিস মানুষ লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পৃথিবীর জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যয় করে।

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর দেয়া এ পুঁজির সবটুকু এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ব্যয় করে যে, এমন কোন শক্তি নেই যার আইন তাকে মেনে চলতে হবে এবং পরকালে একমাত্র তাঁর কাছেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অথবা পৃথিবীতে যেসব কৃত্রিম শক্তি রয়েছে সে তার গোলাম এবং এসব শক্তির আইন তাকে মেনে চলতে হবে এবং মাথানত করতে হবে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সমস্ত কিছুই হারিয়ে ফেললো। এটা হলো প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষতি হলো, এই ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করলো সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকেসহ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং মহান আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর গোটা জীবনকালব্যাপী না-ইনসাফী করলো।

সুতরাং এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবীদার আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছুই নেই যে, সে এসব দাবী পূরণ করতে সক্ষম। এ ছাড়া আরো ক্ষতি হচ্ছে, সে ব্যক্তি নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, বরং নিজের সন্তান-সন্ততি, নিকট আত্মীয়, প্রিয়জন ও পরিচিত মহল এবং নিজের জাতিকেও তার ভ্রান্ত চিন্তাধারা,

www.pathagar.com

প্রভাব, শিক্ষা ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এ গুলো মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি। সুতরাং পরকালের সফলতাই প্রকৃত সফলতা এবং পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। (সূরাআশ শূরা-৪৫)

ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে

পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং কোরআন ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজেদের শারীরিক শক্তি, মেধা, অর্জিত অর্থ-সম্পদসহ যাবতীয় যোগ্যতা ব্যয় করেছে, এই লোকগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং নেক আমলসহ দ্বীনি আন্দোলন করেছে, আল্লাহর কোরআন এসব লোকদেরকে 'পবিত্র' হিসাবে চিত্রিত করেছে। আর যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে কদর্যতায় নিমজ্জিত থাকে, এদেরকে 'অপবিত্র' হিসাবে চিত্রিত করেছে। দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকগুলো এবং দ্বীনি আন্দোলন বিরোধী লোকগুলো এই পৃথিবীতে একই সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং ক্ষেত্র বিশেষে একই পরিবারে অবস্থান করে থাকে। কিয়ামতের দিন এই পবিত্র লোকগুলোকে অপবিত্র লোকদের থেকে পৃথক করা হবে এবং অপবিত্র লোকগুলোকে তথা অপরাধীদের একত্রিত করে ঘেরাও অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ–وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ– لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ– اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ–

www.pathagar.com

যেসব লোক পরম সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির কাজে ব্যয় করে, ভবিষ্যতে আরো ব্যয় করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাজিত ও পরাভূত হবে, তারপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ্ অপবিত্রতাকে বেছে নিয়ে পৃথক করবেন এবং সব ধরনের অপবিত্রতাকে মিলিয়ে একত্রিত করবেন। অবশেষে এই সমষ্টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মূলত এই লোকেরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আনফাল-৩৬, ৩৭)

মানুষ যে পথে যে উদ্দেশ্যে নিজের যাবতীয় শ্রম, মেধা, অর্থ ও যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা নিয়োজিত করে, পরিণামে যখন জানতে পারে যে, সেই পথ তাকে সোজা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে–যে পথে সে তার যাবতীয় মূলধন ও যোগ্যতা নিয়োজিত করেছে। এ পথে সে কোনক্রমেই লাভবান হতে পারবে না বরং উল্টো তাকে মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাহলে এই ধরনের ব্যক্তির তুলনায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত আর কে হতে পারে? বর্তমানে যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে কৃত্রিতম সফলতা অর্জনের পথে যাবতীয় কিছু বিনিয়োগ করছে, তাদের অবস্থাও অনুরূপ। পরকাল হবে না এবং পৃথিবীর জীবনের কোন কর্মের হিসাব কারো কাছে কখনোই দিতে হবে না। এই চিন্তা-বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করেছেন, বৈধ-অবৈধের কোন সীমা এরা মানেনি। যে কোন পথে ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় করেছে, জীবন-যৌবনকে দ্বিধাহীন চিত্তে আকণ্ঠ ভোগ করেছে। এসব লোকই পরকালীন জীবনে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَاكَانُوْا مُهْتَدِيْنَ–

প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেসব লোকেরা, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভাবনাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। (সূরা ইউনুস-৪৫)

ইসলামের দাওয়াত যারা গ্রহণ করবে না, কোরআন নির্দেশিত পথে আমলে সালেহ্ করবে না, পৃথিবী থেকে অনাচার-অবিচার দূর করার লক্ষ্যে কোরআনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলন যারা করবে না, আল্লাহ্র দেয়া বিধানকে যারা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনে করে এড়িয়ে চলবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। যারা আল্লাহ্র বিধানকে অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ, সেকেলে, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি অভিধায় অভিযুক্ত করে এবং মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করে এবং সেই আন্দোলনের

www.pathagar.com

প্রতি যারা সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়, তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ–

আর তাদের মধ্যে তুমি শামিল হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। অনথ্যায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস-৯৫)

পরকালকে মিথ্যা মনে করে এই পৃথিবীর জীবনকে যারা কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে নানা ধরনের পথ ও মত রচনা করেছে, ভোগ-বিলাসের নানা ধরনের উপকরণ তৈরী করেছে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি, দল বা কোন বুযর্গকে বিশাল শক্তির অধিকারী মনে করে তার আনুগত্য করেছে, কিয়ামতের ময়দানে এসব কোন কিছুই তাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহর দাসত্ব না করে যারা ভিন্ন কিছুর দাসত্ব করতো, তাদের সামনে মাথানত করতো, শক্তিমান লোকদের রচনা করা বিধান অনুসরণ করতো, কিয়ামতের দিন এসব কিছুই তাদের কাছ থেকে সট্‌কে পড়বে। নিজের রচনা করা বিধান, দেব-দেবী ও কল্পিত শক্তির অধিকারী কোন কিছুরই অস্তিত্ব সেদিন থাকবে না। সেদিন এসব লোকদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ، لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ–

এরা সেই লোক, যারা নিজেরাই নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর তারা যা কিছু রচনা করেছিল, তার সবকিছু তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। অনিবার্যভাবে তারাই পরকালে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা হূদ-২১-২২)

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করাকে যারা কঠিন মনে করেছে, রাসূলের আনুগত্য করাকে যারা কষ্টকর বলে চিন্তা করেছে, ইসলাম বিরোধী শক্তির দাপট দেখে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে, কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, অবৈধ ভোগ-বিলাস থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে, সময়ের কোরবানী দিতে হবে, অর্থ সম্পদের কোরবানী দিতে হবে, ইসলাম বিরোধিদের কোপানলে পড়তে হবে, লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত হতে হবে, কারাগারের অন্ধকার জীবনকে মেনে নিতে হবে। এসব দিক চিন্তা করে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেয়নি, দ্বীনি আন্দোলনকে

www.pathagar.com

সাহায্য-সহযোগিতা করেনি, সমর্থন দেয়নি, সুবিধাবাদী দুনিয়া পুজারী এই গাফিল লোকগুলোও কিয়ামতের ময়দানে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ، لاَجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ–

এরা গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত, নিঃসন্দেহে আখিরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা আন নাহ্‌ল-১০৮, ১০৯)

দুনিয়া পূজারী ব্যক্তি ব্যর্থ হবে

মুসলিম পরিচয় দানকারী একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা নিজের মুসলিম পরিচয়ও বজায় রাখতে চায় এবং ভোগবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতিরও অনুসরণ করে। অর্থাৎ এরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে মোটেই রাজী নয়। অপরদিকে নিজেদের মুসলিম পরিচয় মুছে দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার সবটুকু গ্রহণ করতেও রাজী নয়। ইসলামের দুই একটি সহজ নিয়ম-নীতি ইচ্ছানুসারে অনুসরণ করবে এবং ভোগবাদী পশ্চিমা সভ্যতাও অনুসরণ করবে। এরা দুনিয়া পূজারী এবং এদের মানসিক গঠন অপরিপক্ক, এদের আকীদা বিশ্বাস অত্যন্ত নড়বড়ে, এরা প্রবৃত্তির পুজা করে। এসব লোক পার্থিব স্বার্থের কারণে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়।

এদের ঈমানের সাথে এই শর্ত জড়িত যে, এদের যাবতীয় আশা-আকাংখা পূর্ণ হতে হবে, সব ধরনের নিশ্চিন্ততা অর্জিত হতে হবে, আল্লাহর দেয়া বিধান তাদের কাছে কোন ধরনের স্বার্থ ত্যাগ দাবী করতে পারবে না এবং পৃথিবীতে তাদের কোন ইচ্ছা ও আশা-আকাংখা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। আল্লাহ্‌র বিধান যদি এদের মনের চিন্তা-চেতনা ও চাওয়া-পাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে তাহলে ইসলাম তাদের কাছে সবথেকে ভালো আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যখনই ইসলাম এদের অবৈধ কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে অগ্রসর হবে, তখনই এরা বলে উঠবে ইসলাম সেকেলে, পশ্চাৎপদ, প্রগতি বিরোধী, মৌলবাদ। আর মুসলিম হওয়ার কারণে যদি কখনো এদের ওপরে কোন আপন-বিপদ নিপতিত হয়, কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় অথবা এদের কোন আশা-আকাংখা পূরণের পথে ইসলাম অর্গল তুলে দেয়, তাহলে এরা আল্লাহ্ তা'য়ালার সার্বভৌমত্বের কোন তোয়াক্কা করে না, রাসূলের রিসালাতের প্রতি ও কোরআনের সত্যতার প্রতি এরা সংশয়িত হয়ে পড়ে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি এদের বিশ্বাসের ভিত্তি কেঁপে ওঠে।

www.pathagar.com

এই অবস্থায় দুনিয়া পুজারী এ লোকগুলো এসকল স্থানে মাথানত করে, এসব ঠুনকো শক্তির দাসত্ব করতে থাকে, যেখানে তাদের পার্থিব স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তারা পার্থিব জীবনে লাভবান হতে পারবে। এসব লোকই হলো দ্বৈত ইবাদাতকারী। এদের আপদ-মস্তক শয়তানের গোলামীতে নিমজ্জিত থাকার পরও এরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয় এবং মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য মাঝে মধ্যে ইসলামের কিছু নিয়ম-নীতি প্রদর্শনীমূলকভাবে পালন করে থাকে।

দ্বৈত-ইবাদাতকারী এসব নামধারী মুসলিমদের অবস্থা সব থেকে খারাপ। কাফির, মুরতাদ ও নাস্তিকরা নিজের রব-এর মুখাপেক্ষী না হয়ে এবং মন-মস্তিষ্ককে পরকালের ভীতিশূন্য করে ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে বস্তুগত স্বার্থের পেছনে ছুটতে থাকে তখন সে নিজের পরকাল বরবাদ করলেও পার্থিব স্বার্থ কিছু না কিছু অর্জন করে থাকে। অপরদিকে মু'মিন যখন পূর্ণ ধৈর্য, অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প সহকারে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে থাকে, তখন যদিও পার্থিব সাফল্য শেষ পর্যন্ত তার পদ-চুম্বন করেই থাকে, যদি পৃথিবীর স্বার্থ একেবারেই তার নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে, তবুও আখিরাতে তার সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে দ্বৈত-ইবাদাতকারী মুসলমান নিজের পৃথিবীর স্বার্থও লাভ করতে সক্ষম হয় না এবং আখিরাতেও তার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তার মন-মস্তিষ্কের কোন এক প্রকোষ্ঠে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের অস্তিত্বের যে ধারণা রয়েছে এবং আল্লাহর বিধানের সাথে সম্পর্ক তার মধ্যে নৈতিক সীমারেখা কিছু না কিছু মেনে চলার যে ভাব-প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীর স্বার্থের পেছনে ছুটতে থাকলেও এগুলো তাকে পেছন থেকে টেনে ধরে। ফলে নিছক বস্তগত স্বার্থ ও বৈষয়িক স্বার্থ অন্বেষার জন্য যে ধরনের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা একজন কাফির-নাস্তিক ও পরকালের ভীতিহীন লোকদের মতো তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না– এটা বাস্তব সত্য।

আখিরাতের কথা চিন্তা করলে পৃথিবীর লাভ ও স্বার্থের লোভ, ক্ষতির ভয় এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বিধি-নিষেধের শৃংখলে বেঁধে রাখার ব্যাপারে মানসিক অস্বীকৃতি সেদিকে যেতে দেয় না বরং বৈষয়িক স্বার্থ পূজা তার বিশ্বাস ও কর্মকে এমনভাবে বিকৃত করে দেয় যে, আখিরাতে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে এসব দ্বৈত-ইবাদাতকারী লোকগুলো পৃথিবী ও আখিরাত-দুটোই হারিয়ে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ এসব লোকদের সম্পর্কে বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ، فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ

www.pathagar.com

اطْمَانَّ بِه، وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِه، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالاخِرَةَ، ذٰلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ–

আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ রয়েছে, যে এক প্রান্তে অবস্থান করে আল্লাহর দাসত্ব করে, যদি তাতে তার উপকার হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি কোন বিপদ আসে তাহলে পেছনের দিকে ফিরে যায়। তার দুনিয়াও গেলো এবং আখিরাতও। আর এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হজ্জ-১১)

মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে কারা

আল্লাহর নাযিল করা জীবন বিধান ব্যতীত পৃথিবীতে প্রচলিত ও আবিষ্কৃত যত মত ও পথ রয়েছে, নিয়ম-নীতি, প্রথা, আইন-কানুন রয়েছে তা সবই বাতিল। এই বাতিল মতাদর্শ-মতবাদ যারা অনুসরণ করবে, তারাই মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ، اُولٰئِكَ هُمُ الْخسِرِيْنَ–

যারা বাতিলের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই হচ্ছে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আনকাবুত- ৫২)

মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শের অনুসারীরা মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধানকে মসজিদ-মাদ্রাসার চার দেয়ালে আবদ্ধ রাখতে চায়। মানব জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অঙ্গনে আল্লাহর বিধানের পদচারণা বরদাশ্ত করতে এরা রাজী নয়। আল্লাহ তা'য়ালাকে এরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিতে চায় না। এরা বলে থাকে, দেশের জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এরাই হলো বাতিল পথ ও মতের অনুসারী এবং এরা হাশরের ময়দানে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ-وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ–

যমীন এবং আসমানের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আর যেদিন কিয়ামতের সময় এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা জাসিয়া-২৭)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শুধু এই পৃথিবীই সৃষ্টি করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে রয়েছে, তাঁর প্রতিপালনের কারণেই বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কল্যাণের তা সক্রিয় রয়েছে। সুতরাং একমাত্র সেই আল্লাহ্‌রই দাসত্ব করতে হবে এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরই মুখাপেক্ষী হতে হবে।

দ্বৈত-ইবাদাতকারী লোকগুলো পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা, শক্তি ও ধন-সম্পদের আশায় অন্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য ধর্ণা দেয়। এই ধরনের অবস্থা যাদের তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা যাবতীয় কিছু দেয়ার মালিক তিনি এবং সমস্ত কিছুর চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। মহান আল্লাহ্ বলেন–

لَه مَقَالِيْدُ السَّموتِ وَالاَرْضِ–وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِايتِ اللّهِ اُولئِكَ هُمُ الْخسِرُوْنَ–

আল্লাহ্ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। যমীন ও আসমানের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (সূরা যুমার-৬৩)

উল্লেখিত আয়াতে 'আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে' এ কথার অর্থ হলো মহান আল্লাহকে সর্বশক্তির অধিকারী মনে না করা। অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে যে, একমাত্র তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র তিনিই ধনীকে নির্ধন ও গরীবকে ধনী বানিয়ে দিতে পারেন। যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে তিনিই হেফাজত করতে পারেন এবং মনের আশা-আকাংখা তিনিই বাস্তবায়ন করতে পারেন। তিনিই একমাত্র দোয়া কবুলকারী। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা সাহায্যের আশায় মাজার আর দরগায় গিয়ে ধর্ণা দেয়, তারাই আল্লাহ্‌র আয়াতের সাথে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধানের সাথে কুফরী করে এবং এরাও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সাহায্যকারী, আশা পূরণকারী, দোয়া কবুলকারী, ধন-সম্পদ দানকারী, রোগ থেকে আরোগ্যকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ইত্যাদী মনে করা হয়, তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট শিরক।

একশ্রেণীর মানুষ দরগাহ, মাজার ও একশ্রেণীর পীরদেরকে এসব গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদের কাছে সাহায্য কামনা করতে থাকে এবং মনে মনে ধারণা পোষণ করে যে, তারা নেক কাজ করছে। কোরআনের ভাষায় এসবই হলো

www.pathagar.com

শিরক। এদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানে এসব লোকদের আমলনামা ধূলার মতোই উড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ-لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ-

তোমার কাছে এবং ইতোপূর্বেকার সমস্ত নবীর কাছে এই ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার-৬৫)

মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার মূল কারণ

প্রত্যেক নবী-রাসূলই পরকালে আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা বলেছেন এবং মানুষের মনে পরকালের ভীতি সঞ্চার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তার সিংহভাগ জুড়ে থেকেছে পরকাল সম্পর্কিত আলোচনা। সর্বশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানব জাতির জন্য যে সর্বশেষ জীবন বিধান–আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভেতরেও পরকালের বিষয়টিই সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে।

গোটা ত্রিশপারা কোরআনে পরকাল সম্পর্কিত যে আলোচনা এসেছে, তা একত্রিত করলে প্রায় দশ পারার সমান হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বিশাল আলোচনা কেন করা হয়েছে? আমরা তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে এবং আমপারার তাফসীরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে সংক্ষেপে বিষয়টি এভাবে পেশ করছি যে, পরকালে জবাবদিহির ভীতি ব্যতীত কোনক্রমেই মানুষের মন-মস্তিষ্ক অপরাধের চেতনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সর্বাধিক কঠোর আইন প্রয়োগ করেও মানুষকে অপরাধ মুক্ত সৎ জীবনের অধিকারী বানানো যায় না। কারণ অপরাধীর প্রতি শাস্তির দন্ড প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন হবে সাক্ষ্য প্রমাণের। পক্ষান্তরে যে অপরাধী কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ না রেখে অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করে, সে থাকে আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং তার প্রতি পৃথিবীতে দন্ডও প্রয়োগ করা যায় না।

সুতরাং পৃথিবীতে এমন কোন আইন-কানুনের অস্তিত্ব নেই, যে আইন মানুষকে নির্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে একাকী অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

এই অবস্থায় মানুষকে অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে পারে কেবল পরকাল ভীতি তথা আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতি। এ কারণেই মানব মন্ডলীর জন্য প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআনে পরকালের বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে।

অপরদিকে প্রত্যেক যুগেই একশ্রেণীর মানুষ পরকালের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করেছে এবং পরকালের স্বপক্ষে যারা কথা বলেছে, তাদের বিরোধিতা করেছে। এই শ্রেণীর লোকগুলো কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে চায়নি যে, মৃত্যুর পরে মানুষ পুনরায় পুনর্জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহর আদালতে যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে। এই শ্রেণীর মানুষদের একজন স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তাঁর গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট।

এ জন্য তারা কোনভাবেই মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনকে বিশ্বাস করতে চায়নি। মৃত্যুর পরে মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি, চর্ম, গোস্ত এবং প্রতিটি অণু পরমাণু ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মাটি সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলে। এরপরে কিভাবে পূর্বের ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ জীবন লাভ করবে? এই বিষয়টি হলো পরকাল সম্পর্কে সংশয়িত লোকদের চিন্তা-চেতনার অতীত।

প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীরা যখন পরকালের কথা বলে মানুষের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছেন এবং মানুষের ভেতরে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, তখন পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী লোকগুলো নবী-রাসূলদেরকে পাগল হিসাবে চিহ্নিত করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। পরকাল সম্পর্কে কোন মতবাদ তারা গ্রহণ করতে চায়নি বরং পরকাল বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করেছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, যারা পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির কথা বলেছে, তাদের প্রতি একশ্রেণীর মানুষ কেন মারমুখী আচরণ করেছে এবং কেনই বা তাদেরকে নির্যাতন করেছে? পরকাল বিরোধিদের এমন কি ক্ষতি হচ্ছিলো যে, তারা পরকাল বিশ্বাসীদেরকে বরদাশ্‌ত করেনি?

আসলে পরকাল বিরোধিতার পেছনে এক মনস্তাত্বিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সেই কারণ হলো, যেসব লোক পরকালে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে–এ কথা বিশ্বাস করে, তাদের চরিত্র, আচার-আচরণ, মননশীলতা ও রুচি, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি হয় এক ধরনের। আর পরকাল অবিশ্বাসীদের উল্লেখিত যাবতীয় বিষয় হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, এ কথা আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে সত্য বলেই প্রমাণিত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি পরকাল বিশ্বাস করে, তার এমন এক মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে যে, সে প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখে যে, তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কর্মকান্ড রেকর্ড হচ্ছে এবং মৃত্যুর পরের জগতে এ সম্পর্কে তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। মহান স্রষ্টা তার ওপরে যে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন, তার দৃষ্টি থেকে কোন কিছুই গোপন করা যাবে না। সে যদি কোন অপরাধমূলক কর্ম করে থাকে তাহলে এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে–এ বিশ্বাস তার ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলেই সে যে কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

আর যারা পরকাল অবিশ্বাস করে অথবা পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, তাদের চরিত্র হয় পরকাল বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, পরকাল বলে কিছুই নেই সুতরাং তাদের কোন কর্মের ব্যাপারে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। পৃথিবীর জীবনে তারা যদি অবৈধভাবে জীবন-যৌবনকে ভোগ করে, অপরের অধিকার খর্ব করে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়ে, দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের জন্য দেশ ও জাতির ক্ষতি করে, জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে, ক্ষমতার বলে অধীনস্থদের অপরাধমূলক কর্মে জড়িত হতে বাধ্য করে, স্বৈরাচারী নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে দেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করে, সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে তাদেরকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করে–তবুও তারা ভয়ের কোন কারণ অনুভব করে না। কারণ তারা এ বিশ্বাসে অটল যে, মৃত্যুর পরে তাদের এসব হীন কর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

কারণ পরকাল বিশ্বাস করলেই নিজের প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিতে হবে, যে কোন ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতা বন্ধ করতে হবে, অন্যায় ও অবৈধ পথে নিজের জীবন-যৌবনকে ভোগ করা যাবে না, অন্যায় পথে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়া যাবে না, ক্ষমতার মসনদে বসে দেশ ও জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, নিজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল করতে হবে, নির্দিষ্ট একটি গন্ডির ভেতরে নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। আর এসব করলে তো জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা যাবে না। পরকালের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণের পেছনে এটাই হলো মনস্তাত্ত্বিক কারণ।

এই ধরনের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা গঠিত হয় পরকাল অবিশ্বাস করার কারণে। নৈতিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা, সুবিচার, দুর্বল, নির্যাতিত-নিপীড়িত ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন ইত্যাদি সৎ গুণাবলীতে তারা বিশ্বাসী নয়। অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, অনাচার, হত্যা-সন্ত্রাস, অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা এদের কাছে কোন অপরাধ বা নৈতিকতার লংঘন বলে বিবেচিত

www.pathagar.com

হয় না। নিজের যৌন কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নারী জাতিকে এরা ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। ব্যক্তি স্বার্থ, জাতিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য একটি মানুষকেই শুধু নয়, গোটা একটি দেশ বা জাতিকে নিজেদের গোলামে পরিণত করতে বা ধ্বংস করে দিতেই এরা কুণ্ঠাবোধ করে না। পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সাক্ষী, এই পৃথিবীর বুকে এমন বহু জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করার পরও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকার কারণে তারা নিমজ্জিত হয়েছে নৈতিক অধঃপতনের অতল তলদেশে।

পরকাল অবিশ্বাসের কারণে তারা নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার বিবরে প্রবেশ করে ন্যায়ের শেষ সীমা যখন অতিক্রম করেছে, তখনই তারা আল্লাহ তা'য়ালার গযবে নিপতিত এই পৃথিবী থেকে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। অধিকাংশ মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবার এটাই হলো মূল কারণ যে, তাদের অন্তরে পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই। পরকাল বিশ্বাস অন্যায়কারীর কণ্ঠে জিঞ্জির পরিয়ে দেয়, ফলে সে অন্যায় পথে অগ্রসর হতে পারে বিধায় অন্যায় পথ অবলম্বনকারীরা নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে করেছে অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত এবং আঘাতে আঘাতে তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে, ফাঁসির রশি তাদের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়েছে এবং বর্তমানেও তাদের উত্তরসূরিদের আচরণে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এই শ্রেণীর লোক পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে তাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত, সুশৃংখল এবং উদগ্র কামনা-বাসনাকে দমন করতে অতীতে যেমন রাজী ছিল না বর্তমানেও রাজী নয়। নিজ দেশের জনগণ বা ভিন্ন দেশের জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে তাদের ওপরে প্রভুত্ব করার কলুষিত কামনাকে এরা নিবৃত্ত করতে আগ্রহী নয়। নিজের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও পরকালের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই হলো মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার মূল কারণ। এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوْابِالْحَيوةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ ايتِنَا غفِلُوْنَ–اُولئِكَ
مَاْوهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ–

প্রকৃত বিষয় এই যে, যারা আমার সাথে আখিরাতে মিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং পৃথিবীর জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐসব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি অনুসারে করেছে। (সূরা ইউনুস-৭-৮)

এসব লোক পৃথিবীর জীবন নিয়েই নিশ্চিন্ত থেকেছে এবং কখনো এ চিন্তা তাদের মনে উদয় হয়নি যে, তাদের একজন স্রষ্টা এবং প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি তাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিপালন করছেন এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে যাচ্ছেন। সেই আল্লাহ্ তা'য়ালা যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দেখছেন এবং তাঁর কাছে সমস্ত কিছুর হিসাব দিতে হবে, এই বিশ্বাস তাদের নেই। এ কথা তারা বিশ্বাস করে না যে, এমন একটি সময় আসবে, সে সময়ে তাদের নিজেদের দেহের চামড়া, চোখ, কান, হাত-পা ইত্যাদি স্বয়ং তারই বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবে। এই বিশ্বাস না থাকার কারণেই তারা পৃথিবীতে যা খুশী করছে এবং মারাত্মক ক্ষতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। আখিরাতের দিন এসব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বলা হবে–

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ-وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ-

পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় যখন তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের সংবাদ আল্লাহও রাখেন না। তোমাদের এই ধারণা, যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে, তোমাদের সর্বনাশ করেছে এবং এর বিনিময়েই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো। (সূরা হামীম সিজ্‌দা- ২২-২৩)

পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী ও অবিশ্বাসী লোকগুলো এই পৃথিবীতে আপাদ-মস্তক নোংরামীতে নিমজ্জিত থেকেছে, নিজের দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

www.pathagar.com

অন্যায় কাজে ব্যবহার করেছে কিন্তু নিজের অজান্তেও এ কথা তারা কল্পনা করেনি যে, তার দেহের যে অঙ্গগুলোর প্রতি সে এত যত্নশীল এবং এসব অঙ্গের শোভাবর্ধন করার লক্ষ্যে সে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, এসব অঙ্গ-ই একদিন তার বিরুদ্ধে তার অন্যায় কাজের সাক্ষী দেবে। এসব লোক বিশ্বাস করেছে স্রষ্টা বলে কেউ নেই এবং কোন কর্মের হিসাবও কারো কাছে দিতে হবে না, তাদের এই বিশ্বাসই তাদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে হাশরের ময়দানে।

ভ্রান্ত এই বিশ্বাস অনুসারে এসব লোক পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালিত করেছে এবং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, প্রভাবাধীন আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় লোকজন এবং নিজের অধীনস্থদের পরিচালিত করে তাদেরকেও মহাক্ষতির দিকে নিক্ষেপ করেছে। কিয়ামতের দিন এসব লোকদেরকে যখন গ্রেফতার করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকগুলো ঐ লোকগুলো সম্পর্কে বলবে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

যারা ঈমান এনেছিলো সেই সময় তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা শূরা-৪৫)

ঐ শ্রেণীর মানুষগুলোই সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে পৃথিবীতে যাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং এরা মনে করতো, তারা যা করছে তা সঠিক কাজই করছে। এরা লেখা-পড়া করেছে, বিদ্যা অর্জন করেছে, সমাজ কল্যাণমূলক কোন কাজ করেছে, রাজনীতি করেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, মিছিল-মিটিং ধর্মঘটসহ যা কিছুই করেছে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে করেছে। কারণ এরা ভেবেছে এই পৃথিবীর জীবনই আসল জীবন, মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই। সুতরাং কারো কাছে নিজের কাজের কোন হিসাব দিতে হবে না। এসব লোক পৃথিবীর জীবনে সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে।

এই শ্রেণীর লোকগুলো মহান আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও সেই আল্লাহ কোন্ কাজে সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট হবেন, তাঁর সামনে গিয়ে

www.pathagar.com

একদিন উপস্থিত হতে হবে এবং নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এ চিন্তা তারা কখনো করেনি। পক্ষান্তরে এসব লোকগুলো পৃথিবীতে নিজেদেরকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করতো। তারা ধারণা করতো, তারা যা করছে তা অবশ্যই সঠিক পথেই পরিচালিত হচ্ছে। দেশ ও জনগণের কল্যাণের দোহাই দিয়ে আন্দোলন মিছিল-মিটিং, হরতাল করছে, সন্ত্রাস করে দেশ ও জনগণের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি করছে, দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে, তবুও এরা জোর গলায় প্রচার করছে, তারা যা কিছুই করছে তা মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই করছে। এসব লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً–اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا–

হে রাসূল! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক পথেই করে যাচ্ছে। (সূরা কাহ্ফ-১০৩-১০৪)

আমলে সালেহ্ ও নিয়্যতের বিশুদ্ধতা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকাই হলো আমলে সালেহ। সুতরাং কোন্ ধরনের কর্ম আমলে সালেহ্ এবং কোন্ ধরনের কর্ম আমলে গায়ের সালেহ, এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। সফলতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানকে যদি গণিত শাস্ত্রের (এক-এর) ১–এর সাথে তুলনা করা যায় তাহলে আমলে সালেহ্কে (শূন্য-এর) ০–এর সাথে তুলনা করতে হয়। ১–এই অঙ্কটির সাথে একটি ০–জুড়ে দিলে হবে ১০ এবং আরেকটি ০–জুড়ে দিলে হবে একশত। এভাবে একটির পরে আরেকটি ০–জুড়ে দিতে থাকলে ঐ প্রথম ১–এর মান ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। অনুরূপভাবে ঈমান আনার পরে একটির পর আরেকটি আমলে সালেহ্ করতে থাকলে ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে অর্থাৎ ঈমান শক্তিশালী-মজবুত হবে।

১–এর সাথে ০–জুড়ে দিলেই ঐ ১–এর মান বৃদ্ধি পাবে না। ০–জুড়তে হবে ১–এর ডান দিকে। ডান দিকে ০–জুড়ে না দিয়ে বাম দিকে যতগুলোই ০–জুড়ে

www.pathagar.com

দেয়া হোক না কোনো, ঐ প্রথম ১–এর মান ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে। ঐ ১–এর কোনো মূল্যই থাকবে না। অর্থাৎ আমলে সালেহ্ করতে হবে ঈমানের সাথে। আর ডান পাশে ০–জুড়ে না দিয়ে যদি বাম পাশে দেয়া হয়, তাহলে ঐ ১–এর কোনো মূল্য থাকবে না। অর্থাৎ বামপন্থী যারা, মহান আল্লাহর দরবারে তাদের কোনো ধরনের কর্মকান্ড গ্রহণ যোগ্য হবে না। আল্লাহ্র দরবারে সফলতা অর্জন করবে কেবলমাত্র ডানপন্থী লোকেরা। পৃথিবীতে ডানপন্থী বলতে যাদেরকেই বুঝানো হোক না কোনো, আল্লাহ্র কোরআনে ডানপন্থী (আস্হাবুল ইয়ামিন) বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা মহান আল্লাহ্র বিধানের অনুসারী। আর বামপন্থী (আস্হাবুশ্ শিমাল) বলতে কোরআনের তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা মানুষের বানানো আদর্শ তথা শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ-মতাদর্শের অনুসারী। ডানপন্থী ও বামপন্থীদের পরিচয় পবিত্র কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

অতপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে এবং একে অপরকে ধৈর্য্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দিবে, (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে ডান দিকের (সৌভাগ্যবান লোক), আর যারা অস্বীকার করেছে তারা হচ্ছে বাম দিকের ব্যর্থ লোক। (সূরা আল বালাদ- ১৭, ১৯)

বামপন্থীরা হলো কাফির এবং এদের নেতা হলো স্বয়ং শয়তান, মৃত্যুর পরের জগতে তারা শয়তানের নেতৃত্বেই জান্নামে প্রবেশ করবে। সূরা ওয়াকেয়ায় বলা হয়েছে, এই বামপন্থীরা কিয়ামতের ময়দানে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। বামপন্থীরা শয়তান কর্তৃক প্রভাবিত, শয়তান এদেরকে মহান আল্লাহ্র পথ থেকে গাফিল করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ، اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ–

শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছে এবং সে তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলভুক্ত লোক। জেনে রাখো, শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুজাদালা-১৯)

আর ডানপন্থীরা হলো মহান আল্লাহর মুমিন বান্দাহ্ আর তাদের নেতা হলো নবী ও রাসূলগণ। আদালতে আখিরাতে ডানপন্থীরা নবী-রাসূলদের নেতৃত্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সূরা ওয়াকেয়ায় ডানপন্থীদের সৌভাগ্যের কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ডানপন্থীরাই হলো ঈমানদার এবং এদের আমলে সালেহ্ মহান আল্লাহ

www.pathagar.com

কবুল করবেন। এদের প্রতি মহান আল্লাহও সন্তুষ্ট এবং এরাও আল্লাহর তা'য়ালার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ، اُوْلٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ، اَلاَ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহর প্রতি। এরা আল্লাহর দলভুক্ত লোক। জেনে রেখো, আল্লাহর দলভুক্ত লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। (সূরা মুজাদালা- ২২)

সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে দুটো শর্ত

সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে আমলে সালেহ্ করা অর্থাৎ নেক কাজ করা একান্ত জরুরী এবং 'আমলে সালেহ্' এর জন্যে দুটো শর্ত রয়েছে। এর প্রথম শর্ত হলো, আমলে সালেহ্ হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, আমলে সালেহ্ হতে হবে সুন্নতে নববী প্রদর্শিত পন্থানুসারে। অর্থাৎ যেভাবে মহান আল্লাহর রাসূল আমলে সালেহ্ করেছেন, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম করেছেন সেইভাবে নেক কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

যে কোনো সৎকাজই করতে হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। নিয়্যত হবে হবে সহীহ-শুদ্ধ। সৎকাজ কবুল হওয়ার প্রথম শর্তই হলো নিয়্যতের বিশুদ্ধতা। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সমস্ত কাজই নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।' এটা একটি বড় হাদীসের ক্ষুদ্র অংশ এবং হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)। হাদীসটির এতই গুরুত্ব যে এটি বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস এবং মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খন্ডে কিতাবুল জিহাদ, আবু দাউদ শরীফে তালাক অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহ্ শরীফে জুহুদ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসনাদে আহ্মাদ, দারেকুতনী, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখও হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অতএব সৎকাজের বা আমলে সালেহ্র পেছনে নিয়্যত থাকতে হবে মহান আল্লাহকে খুশী করা। আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ব্যতীত ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করলে আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হবে না। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

www.pathagar.com

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ-

বলো, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সমস্ত কিছুই আল্লাহর জন্য নিবেদিত যিনি সারা সৃষ্টিলোকের রব। (সূরা আনআ'ম)

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। এসবের ভেতরে যদি প্রদর্শনীমূলক মনোভাব থেকে থাকে যে, নামায-রোজা আদায় করলে সমাজের লোকজন ভালো বলবে এবং নির্বাচনের সময় লোকজন তাকেই সমর্থন করবে। হজ্জ করলে লোকেরা নামের পূর্বে 'হাজী' শব্দ সহযোগে সম্বোধন করবে, দান-খয়রাত করলে লোকজন 'দানবীর' উপাধিতে ভূষিত করবে, এই যদি নিয়্যত হয়, তাহলে আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না। কাজগুলো নিঃসন্দেহে আমলে সালেহ্-কিন্তু তা সম্পাদন করা হয়েছে বৈষয়িক উদ্দেশ্যে, এসব মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিবেদিত ছিল না। কিয়ামতের দিন এসব লোকদেরকে বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময় পৃথিবীতে দেয়া হয়েছে। লোকজন তোমাদেরকে পরহেজগার, হাজী সাহেব, দানবীর, মহৎ, মহানুভব ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছে, সমাজের লোকজন তোমাদেরকে সমর্থন করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ করেছিলে, পৃথিবীতে তার বিনিময় লাভ করেছো, আজকের দিনে আমার কাছে তোমাদের আর কিছুই পাওনা নেই। আজকের দিনে কেবলমাত্র তারাই বিনিময় লাভ করবে, যারা একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ করেছে।

একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা ব্যাপক প্রচার করে তারপর যাকাতের নামে বস্ত্র বিতরণ করে থাকে। নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থ-সম্পদ দান করে। এসবের পেছনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য থাকে না। ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে পত্র-পত্রিকা, স্মরণিকা প্রকাশ হবে, তাতে তার নাম উল্লেখ থাকবে, প্রতিষ্ঠানে দানকারীদের নামের যে তালিকা থাকবে, তাতে তার নাম উল্লেখ থাকবে, লোকজন তার দানের ভূয়সী প্রশংসা করবে, এই উদ্দেশ্যেই দান করে থাকে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, রাস্তা-পথ ইত্যাদি নির্মাণ করে দিয়ে তার নামকরণ করা হয় নিজের নামে। এর পেছনে উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে নিজের কীর্তি ও নামকে অক্ষয়-অমর করা। এদের এসব কাজ নিঃসন্দেহে আমলে সালেহ্ কিন্তু এর পেছনের উদ্দেশ্য সৎ নয়। এদের এসব সৎকাজ কিভাবে বরবাদ হবে, মহান আল্লাহ তা শোনাচ্ছেন-

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِي هٰـذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে, তা সেই প্রবল বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'শৈত্য' রয়েছে এবং তা যে-জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং একে একেবারে বরবাদ করে দেয়। (সূরা ইমরান-১১৭)

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, এই পৃথিবী হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত স্বরূপ, এখানে যা বপন করা হবে, আখিরাতে তার ফসল লাভ করবে। উল্লেখিত আয়াতে 'শস্যক্ষেতের' যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, সেই 'শস্যক্ষেত' বলতে মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকে বুঝানো হয়েছে, যার বিনিময় মানুষ আখিরাতে লাভ করবে। আয়াতে 'প্রবল বাতাস' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই বাহ্যিক ও স্থূল কল্যাণ-স্পৃহাকে যার দরুণ দুনিয়া পূজারি লোকজন জনকল্যাণ ও সাধারণ উপকারের কাজকর্মে অর্থ ব্যয় করে থাকে। আয়াতে উল্লেখিত 'শৈত্য বা শীত' অর্থ প্রকৃত ঈমান এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভাব বুঝানো হয়েছে, যার ফলে তাদের গোটা জীবনকাল একেবারে ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছে।

এই উপমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, বাতাস শস্য ক্ষেতের জন্য উপকারী এবং তা শস্য উৎপাদনে সহায়ক। কিন্তু এই বাতাসই যদি 'তীব্র শৈত্য প্রবাহ' হয়, তাহলে তা শস্য ক্ষেতের উপকার ও উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক না হয়ে চরম ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বাতাস যদি শস্যের পক্ষে সহনশীল না হয়ে ক্ষতিকর হয়, তাহলে শস্য উৎপাদিত হবে না। ঠিক একইভাবে জনকল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিবির স্থাপন করে জনগণের সেবা-যত্ন করা, চিকিৎসা প্রদান করা বা অন্য কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করার কাজও মানুষের পরকালের ক্ষেতকে লালন পালন ও শক্তি দান করে, একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এসব কাজের পেছনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহলে এসব মহান কাজ কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে আখিরাতের ময়দানে প্রমাণিত হবে।

www.pathagar.com

আখিরাতে যেসব সৎ কাজের বিনিময় দেয়া হবে না

এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মানুষের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আর মানুষের ধন-সম্পদের মালিকও তিনি, যদিও এসব ধন-সম্পদ মানুষই ব্যবহার করে থাকে। অনুরূপভাবে এই মহাবিশ্ব, রাষ্ট্র, রাজত্ব ও রাজ্যেরও একচ্ছত্র প্রভু হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা, যদিও মানুষই এর মধ্যে বসবাস করে। এখন আল্লাহর কোনো বান্দাহ্ যদি তার প্রকৃত মালিকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার না করে, অথবা তাঁর দাসত্ব করার সাথে সাথে অন্য কারো অসংগত দাসত্ব করে এবং আল্লাহ্র দেয়া ধন সম্পদ ব্যবহার ও তাঁর রাজ্য-সাম্রাজ্যে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে একমাত্র তাঁরই আইন-কানুন অনুসরণ না করে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে না করে, তাহলে তার গোটা জীবনকালে সম্পাদিত যাবতীয় সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ একটি বিরাট অপরাধের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এসব কাজের সওয়াব বা বিনিময় আখিরাতে পাওয়া তো দূরের কথা, গোনাহের বোঝা মাথা নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে।

মহান আল্লাহ্র কাছে মানুষের চেষ্টা ও কর্মের বিনিময় লাভ করা নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপর। প্রথম হলো, মানুষের সমস্ত চেষ্টা-সংগ্রাম ও কর্ম-সাধনা হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান অনুসারে। আর দ্বিতীয়টি হলো, এই চেষ্টা সংগ্রাম ও কর্ম-প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে পৃথিবীর পরিবর্তে আখিরাতের সাফল্যই হতে হবে প্রধান ও চরমতম লক্ষ্য। যেসব সৎকাজে এ দুটো শর্ত পূরণ করা হবে না, সেখানে সমস্ত সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ বরবাদ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِايـٰتِنَا وَلِقَاءِ الاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ، هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

আমার নিদর্শনসমূহকে যে কেউ মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। লোকেরা যেমন করবে, তেমন ফলই পাবে, এটা ছাড়া আর কি প্রতিফল পেতে পারে? (সূরা আরাফ-১৪৭)

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করে, কোরআনের হেদায়াত অনুসরণ না করে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বা আল্লাহ্র প্রতি বিদ্রোহাত্মক নীতিতে পৃথিবীতে যতো সৎকাজই করা হোক না কেনো, এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কোনো ধরনের ফল লাভ করার আশা পোষণ করা যায় না বা এই আশা পোষণ করার কোনো অধিকারই থাকে না। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র পৃথিবীতে

www.pathagar.com

স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই সৎকাজ করলো, পরকালে এসব কাজের কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-.

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَانُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ-اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ-وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

যেসব লোক শুধু এই পৃথিবীর জীবন এবং এর চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজ-কর্মের যাবতীয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দান করি আর সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনরূপ কম করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ব্যতীত আর কিছুই নেই। (সেখানে তারা জানতে পারবে যে) তারা পৃথিবীতে যা কিছুই বানিয়েছে, তা সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়েছে। (সূরা হূদ-১৫-১৬)

পৃথিবীতে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, নিজের রব মহান আল্লাহর বিধানের কোনো পরোয়া যারা করে না, মৃত্যুর পরে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে, এ বিষয়টির প্রতি যারা সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে দোলায়িত হয় বা অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা অস্বীকার করে, বৈধ-অবৈধ তথা উপার্জনের ব্যাপারে কোনো সীমারেখা মানে না, এই শ্রেণীর লোকগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ-বিত্তের ও ধন-সম্পদের অধিকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মান, মর্যাদাকর পদসমূহ এই শ্রেণীর লোকদের অধিকারে থাকে। এরাই দেশের বুকে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। পৃথিবীর আরাম আয়েশ এদের দখলে, ভোগ-বিলাসে এদের জীবন অতিবাহিত হয়। সর্বত্র এদেরকেই গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া হয় এবং সাধারণ মানুষও এদেরকেই বরণ করে। গাড়ি-বাড়ি ও ইন্ডাষ্ট্রী কোনো কিছুরই অভাব এদের থাকে না।

দান-দক্ষিণার ক্ষেত্রেও এরাই অগ্রগামী। এরা জনকল্যাণমূলক কাজ করে কিন্তু তাদের এসব কাজের ফলাফল পরকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে না। কারণ তাদের কর্মকান্ড পরকাল অর্জনের জন্য ছিল না। পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা, নাম-যশ ইত্যাদি অর্জন ছিল এসব কাজের উদ্দেশ্য। এরাও দুনিয়া কামনা করে, মহান আল্লাহও তাদের যাবতীয় কাজ-কর্মের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। যে উদ্দেশ্যে কর্ম পরিচালিত হয়, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল করে দেন এবং দেয়ার

www.pathagar.com

ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা কোনোরূপ কৃপণতা করেন না। এসব সৎকাজ কেউ করে গুণ-কীর্তন ও প্রশংসা লাভের আশায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা এসব কাজের বিনিময় এই পৃথিবীতে দিয়ে দেন। সাধারণ লোকজনের সমর্থনে তারা ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে। অথবা তারা প্রশংসা লাভ করে, লোকজন তাদের গুণ-কীর্তন করতে থাকে। মৃত্যুর পর প্রশংসা করে তাদের জীবনী রচিত হয়, তাদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়। তাকে উপলক্ষ্য করে প্রশংসামূলক গীত কবিতা, সাহিত্য রচিত হয়, পত্র-পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। সুতরাং তাদের যা কাম্য ছিল, আল্লাহ্ পৃথিবীতেই তা দিয়ে দেন।

কিন্তু পরকালে তারা দেখতে পাবে, পৃথিবীতে তারা যতো সৎকাজ করে এসেছে, তা সবই ব্যর্থ হয়েছে ও নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا، اُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِايتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنًا–

হে রাসূল! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক পথেই করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রব-এর নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হবার বিষয়টি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হবে না। (সূরা কাহ্ফ- ১০৩, ১০৪)

অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকজন যেসব আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করেছে তা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে করেছে, মহান আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন ও আখিরাতের চিন্তা না করেই শুধুমাত্র পৃথিবীতে স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে করেছে। পৃথিবীর জীবনকেই তারা প্রকৃত জীবন মনে করে করেছে। পৃথিবীর সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই

www.pathagar.com

নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও সেই স্রষ্টা কিসে সন্তুষ্ট আর কিসে অসন্তুষ্ট এবং তাঁর আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে হিসাবের জন্য পেশ করতে হবে, এই চিন্তা করে সে কোনো ধরনের আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজসমূহ করেনি। এসব লোক নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও আপন স্রষ্টার প্রতি দায়িত্বহীন অথচ বুদ্ধিমান জীব মনে করতো, যে জীবের একমাত্র করণীয় কাজ হলো, এই পৃথিবী নামক চারণ ভূমি থেকে যতোটা পারা যায়, ততোটা হাতিয়ে নেয়া–এটাই তারা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতো। এসব লোকজন পৃথিবীতে যতো বড় কৃতিত্বমূলক কাজ সম্পাদন করুক না কেনো, পৃথিবী ধ্বংস হবার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় কর্ম-কীর্তি ও কৃতিত্বও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিজেদের অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত সেবাকর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও ভবনসমূহ, রাস্তা-পথ, আসবাব-পত্র, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, আবিষ্কারসমূহ, দাতব্যালয়-বিদ্যালয় সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব সৎকর্ম নিয়ে তারা কখনো মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে পারবে না। সেখানে থাকবে শুধু কর্মের উদ্দেশ্য ও ফলাফল। যদি কারো সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য পৃথিবীর জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে এবং কাজের ফলাফলও পৃথিবীতেই কামনা করে থাকে, পৃথিবীতেই যদি নিজের কাজের সৎকাজের ফলও দেখে থাকে, তারপরেও তার সমস্ত আমল বা কাজই এই নশ্বর পৃথিবীর সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই শ্রেণীর লোকদের মনে আল্লাহ, রাসূল ও পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় ছিল। অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে এদের মন-মানসিকতা সন্দেহে পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্য তারা পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কর্ম করেছে। এদের কোনো সৎকর্মই আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করবেন না, যাবতীয় কর্ম তাদের মুখের ওপরে ছুড়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا–

এবং তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিয়ে আমি ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবো। (সূরা ফুরকান-২৩)

ঈমানের দাবি যারা পূরণ করবে না, ঈমানের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মতবাদ-মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হবে, তাদের যাবতীয় সৎকাজও ধ্বংস হয়ে যাবে, কিয়ামতের দিন এসবের কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه، وَهُوَ فِى الاخِرَةِ مِنَ الْخسِرِيْنَ–

যে ব্যক্তি ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে। (সূরা মায়িদা-৫)

যারা ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নীতি পদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধানাবলী অনুসরণ করবে, তারা পৃথিবীতে যতোই অর্থ-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদার অধিকারী হোক না কেনো, তাদের যাবতীয় সৎকর্মসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের দান-দক্ষিণা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ প্রদান করা, কোনোই কিছুই তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مِّنَ اللّهِ شَيْئًا، وَاُولئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خلِدُوْنَ–

যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে আল্লাহর সাথে মোকাবেলায় না তাদের ধন সম্পদ তাদের কোনো উপকারে আসবে, না তাদের সন্তানাদি। এরা তো জাহান্নামে যাবে এবং চিরদিন সেখানেই থাকবে। (সূরা ইমরান-১১৬)

মুসলিম দাবিদার একশ্রেণীর লোক রয়েছে, আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের প্রতি তাদের দৃঢ় ঈমান নেই। পরকালের প্রতি তাদের মন-মানসিকতা সংশয়ে দোদুল্যমান। এ জন্য এসব লোক পৃথিবীতে অবৈধ ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থাকে, আবার এই উদ্দেশ্যেও মাঝে মধ্যে নামায-রোযা করে, সুযোগ বুঝে হজ্জও করে আসে এবং দান-খয়রাতও করে, কি জানি–পরকাল যদি সংঘটিত হয়েই যায়, তাহলে এসব কাজ তখন কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। এই শ্রেণীর লোকদের যাবতীয় সৎকর্ম তথা আমলে সালেহ্ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এর কোনো প্রতিদান তাদেরকে দেয়া হবে না। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এসব লোকদের নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ م بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَاءً–حَتّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّهَ عِنْدَه فَوَفّهُ حِسَابَه–وَاللّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ–

www.pathagar.com

এবং যারা কুফরী করে তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরুপ্রান্তরে মরীচিকা, পিপাসার্ত পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌছলো কিছুই পেলো না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসাব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসাব নিতে দেরী হয় না। (সূরা নূর-৩৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসারে ও প্রদর্শনীমূলকভাবে আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করে এবং মনে মনে ধারণা করে যে, আখিরাত যদি হয়েই যায় তাহলে সেদিন এসব কাজের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাদের এই ধারণা মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মরুভূমিতে দূর থেকে চিকচিক করা বালুকারাশি দেখে যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি তা একটি তরঙ্গায়িত পানির ধারা মনে করে নিজের পিপসা মিটানোর জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটতে থাকে, ঠিক তেমনি ঐ শ্রেণীর লোকগুলো ধর্মনিরপেক্ষ আমলে সালেহ্র ওপর মিথ্যা ভরসা করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়।

কিন্তু মরীচিকার দিকে ছুটে চলা ব্যক্তি যেমন যে স্থানে পানির ধারা রয়েছে মনে করে ছুটে গিয়েছিল, তারপর সেখানে পৌছে বালু ছাড়া আর কিছুই পায় না, ঠিক তেমনি ঐসব লোক আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করে দেখতে পাবে সেখানে তাদের জন্য কিছুই নেই। মৃত্যুর পরের জীবনে যে কাজের মাধ্যমে তারা লাভবান হবে বলে আশা পোষণ করেছিল, সে কাজ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, এটা দেখে তারা হতাশ হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তারা দেখতে পাবে, যেখানে তারা পৌছেছে, সেখানে তাদের যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপস্থিত রয়েছেন।

মুসলিম দাবিদার আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে সব ধরনের লোকদের সাথে কপট সম্পর্ক বজায় রেখে জীবন পরিচালিত করে। যখন যে ব্যক্তি ও দলকে শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী দেখতে পায়, সেদিকেই তারা ঝুঁকে পড়ে। অর্থ ও কর্মতৎপরতা দিয়ে সহযোগিতা করে এবং বলে যে, 'আমরা আপনাদেরই সমর্থক, আপনাদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য আমরা নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছি।' এভাবে শক্তিশালী প্রত্যেক দল প্রভাব বিস্তারকারী লোকদের সাথে সম্পর্ক রেখে এরা নিজেদেরকে ঝামেলা মুক্ত রাখতে চায়।

যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, নিজেকে তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হিসাবে উপস্থাপন করে নানাভাবে স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে। ইসলামপন্থীদেরকে শক্তিশালী

www.pathagar.com

দেখলে তারা এদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য নামায-রোযা আদায় করতে থাকে। অর্থ ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এ কথাই প্রমাণ করে যে, 'আমরা মনে প্রাণে কামনা করি, আল্লাহর বিধান অনুসারে দেশ ও জাতি পরিচালিত হোক।'

কিয়ামতের ময়দানে এসব লোকদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্‌রা এদের করুণ অবস্থা দেখে বলবে–

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ امَنُوْا اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْاخٰسِرِيْنَ–

ঈমানদার লোকেরা বলবে, 'এরা কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে এই বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করতো যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি।' তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেলো। (সূরা মায়িদা-৫৩)

আরেক শ্রেণীর লোকজন রয়েছে যারা দান-খয়রাত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করে সে কথা লোকদের মধ্যে গর্বভরে প্রচার করতে থাকে। দান করে খোঁটা দেয়, দান গ্রহণকারীকে নিজের অনুগ্রহের দাস মনে করে। বার বার এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, 'আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম বলেই তুমি বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলে বা আমি নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলাম বলেই তুমি আজ খেয়ে-পরে বাঁচতে পারছো।' এই শ্রেণীর লোকদের অন্তরে মহান আল্লাহর বিশ্বাস নেই এবং পরকালের ভয়ও তারা করে না। এদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى، كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَه رِئَاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، فَمَثَلُه كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَه وَابِلٌ فَتَرَكَه صَلْدًا، لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু

www.pathagar.com

লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আর না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না পরকালের প্রতি। তার খরচের দৃষ্টান্ত এমন যে, যেমন একটি পাথুরে চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তরণ পড়ে ছিল। এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে পানির স্রোতের সাথে মুছে গেলো এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে থাকলো। এসব লোক দান-সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। (সূরা বাকারা-২৬৪)

উল্লেখিত আয়াতে 'বৃষ্টি' বলতে দান-সদকাকে বুঝানো হয়েছে আর পাথুরে 'চাতাল' বলতে হীন উদ্দেশ্য ও দুষ্ট মনোভাব তথা খারাপ নিয়্যতকে বুঝানো হয়েছে। যমীনের বুকে বৃষ্টি বর্ষিত হলে সেই যমীনে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়, ফসল উৎপাদন হয়। সর্বোৎকৃষ্ট সার হলো বৃষ্টির পানি। এই পানি শস্য ক্ষেতের জন্য বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু যে পাথুরে চাতালের ওপরে মাটির কয়েক ইঞ্চি আস্তরণ পড়ে থাকে, কঠিন পাথরের ওপরে মৃত্তিকার লেয়ার জমে থাকে। মাটির এই আস্তরণের ওপরে বীজ বপন করা হলে বা কোনো উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়ার পরে যখন প্রবল বেগে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে, তখন মহাকল্যাণকর সেই বৃষ্টির পানি কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডেকে আনে। কারণ পানির স্রোতে পাথরের ওপর থেকে মৃত্তিকার আস্তরণ ক্রমশ মুছে গিয়ে উদ্ভিদ ও বপনকৃত বীজ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মৃত্তিকার আস্তরণের নীচ থেকে কঠিন পাথর উদ্ভাসিত হয়ে বীজ বপনকারীকে উপহাসই করতে থাকে।

তেমনি যাদের দান-সদকার পেছনে পরকালে বিনিময় লাভের উদ্দেশ্য থাকে না, মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে সন্তুষ্ট এবং নিজেকে দানবীর-দানশীল হিসাবে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। দানের পেছনে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। বৃষ্টির পানি যেমন পাথরের ওপর থেকে মাটির আস্তরণ সরিয়ে দেয়, তেমনি খারাপ নিয়্যাত তাদের যাবতীয় সৎকাজকে তথা আমলে সালেহ্‌কে ধ্বংস করে দেবে। দান-সদকা মানুষের মধ্যে কল্যাণময় ভাবধারার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাশীল, কিন্তু তা উপকারী বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রকৃত সৎ উদ্দেশ্য, ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা থাকতে হবে। উদ্দেশ্য যদি সৎ না হয়, তাহলে অনুগ্রহ, দয়া ও করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করে অর্থ-সম্পদের অপচয় করা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

আখিরাতে যারা সফলতা অর্জন করবে

যারা ঈমান এনেছে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে আমলে সালেহ্ করেছে, একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই মালিক ও মুনিব হিসাবে মেনে নিয়েছে, রাসূলকে একমাত্র নেতা হিসাবে অনুসরণ করেছে, নামায-রোযা আদায় করেছে, সাধ্যানুসারে যাকাত দিয়েছে, দ্বীনি আন্দোলন করেছে এবং মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেছে, তারাই হলো মহান আল্লাহর দল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ، وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ–

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোক, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত হয়। আর যে ব্যক্তি বস্তুতই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে, তার এই কথা জানা দরকার যে, কেবলমাত্র আল্লাহর দলই জয়ী হবে। (সূরা মায়িদা-৫৫-৫৬)

মহান আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে–এ কথার অর্থ এটা নয় যে, যারা ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ করবে, এই পৃথিবীতে তারা বিপুল ধন-সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি, কলকারখানার মালিক হবে, বৈষয়িক দিক থেকে এদের কোনো অভাব থাকবে না। বরং এ কথার অর্থ হলো, কিয়ামতের ময়দানে এরা এদের ঈমান ও আমলের বিনিময়ে বিজয়ী হবে। মহাক্ষতি থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। অনেকে এই ধারণা পোষণ করে যে, পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের তো কোনো অভাব থাকার কথা নয়। তারা অভাবহীন স্বচ্ছল জীবন-যাপন করবে। লোক সমাজে তারা বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে।

কিন্তু বাস্তবে এই ধারণার বিপরীত অবস্থাই পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈমানদার লোকজন গরীব–অভাবী। বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, কলকারখানা নেই, লোক সমাজে প্রভাব–প্রতিপত্তি নেই। অর্থের অভাবে সন্তান সন্ততিকে ভালো খাধ্য দিতে পারে না, উত্তম পোষাক দিতে পারে না, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করাতে পারে না।

www.pathagar.com

অপরদিকে যাদের জীবনে নামায-রোযা নেই, পরকালের চিন্তা-চেতনা নেই। আল্লাহর অপছন্দনীয় পথই তাদের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। সেই লোকগুলোর এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদের কোনো অভাব নেই। বিপুল ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব তাদের পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে। আপন রব-এর প্রতি অকৃতজ্ঞ এই অপরাধী লোকগুলো পৃথিবীতে অঢেল ধন-সম্পদ লাভ করে ধারণা করে যে, তারা যে সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসারে জীবন পরিচালিত করছে, তার ওপরে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন বলেই তাদেরকে বিপুল ঐশ্বর্য দান করেছেন।

এদের অবস্থা হলো সেই গাধা আর খাসীর গল্পের মতো। এই দুটো পশুর যিনি মালিক তিনি খাসীটির প্রতি ছিলেন অধিক যত্নবান। এই অবস্থা দেখে খাসীটি একদিন গাধাটিকে ডেকে বললো, 'ব্যাটা গাধা! তুই তো আসলেই একটি গাধা!'

খাসীর কথা শুনে গাধাটি মনোক্ষুন্ন হয়ে খাসীটিকে বললো, 'আমি তো আসলেই গাধা, সুতরাং আমাকে এভাবে তাচ্ছিল্যভরে গাধা বলছো কেনো?'

খাসীটি বললো, 'বলছি এই জন্য যে মালিক আমার প্রতি কতটা যত্নশীল তা লক্ষ্য করেছো! তোমার প্রতি মালিকের কোনো যত্নই নেই। বরং তিনি বাইরে থেকে এসেই তোমাকে এক থাপ্পড় মারে আর যাবার সময়ও লাথি মারে।'

খাসীর কথা শুনে গাধা মুচ্কি হেসে বললো, 'খাসী! তোমার মালিক তোমার প্রতি এত যত্নশীল কেনো তা কি তুমি জানো? চেয়ে দেখো কোরবানীর চাঁদ উঠেছে, এই জন্যই তোমার প্রতি মালিক এত যত্নবান।'

সুতরাং পৃথিবীতে ঈমানহীন পরকালের ভীতিশূন্য অপরাধী লোকদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অঢেল ধন-সম্পদ দান করেন, এর অর্থ এটা নয় যে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন। বরং পৃথিবীতে এরা ঈমানহীন যে আমলে সালেহ্ করে, তার বিনিময়েই এদেরকে ধন-সম্পদ দান করা হয়। আল্লাহর দেয়া এই বিনিময় পরকাল পর্যন্ত দীর্ঘ হবে না। এই পৃথিবীতেই তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয় এবং এরাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। এরা জাহান্নামের জ্বালানী হবে বলেই পৃথিবীর জীবনে এদের বল্লাহারা ভোগ-বিলাস আর আপাদ-মস্তক নোংরামীতে পরিপূর্ণ জীবন-যাপন। এসব লোকের সম্পদ আছে কিন্তু শান্তি নেই। শান্তি নামক শব্দটিই এদের জীবনের পাতা থেকে মুছে গিয়েছে। শান্তির আশায় হন্য হয়ে এরা নানা ধরনের নাচ-গান, পার্টি-ক্লাব আর শরাবের স্রোতধারায় নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেয়, তবুও শান্তির স্পর্শ এরা পায় না।

অনিয়ন্ত্রিত বল্লাহারা জীবন-যাপনের কারণে এদের দেহে নানা ধরনের দূরারোগ্য রোগ বাসা বাঁধে। এক পর্যায়ে চিকিৎসক এদের রিয্ক নিয়ন্ত্রন করে। চিকিৎসকের

www.pathagar.com

দেয়া তালিকা ও পরিমাপের বাইরে কোনো খাদ্য গ্রহণ করার অধিকার এদের থাকে না। চোখের সামনে স্ত্রী আরেক জনের হাত ধরে ক্লাব-পার্টিতে চলে যায়। মেয়ে রাতের পর রাত বয়ফ্রেন্ডদের সাথে রাত কাটায়, মেয়ের ভ্যানেটি ব্যাগ থাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। তারপরেও অসতর্ক মুহূর্তে মেয়ে কুমারী মাতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ছেলে মাতা-পিতার কথা শোনে না। এক পর্যায়ে ছেলে অন্ধকার জগতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়।

ঈমান ও পরকালের ভীতিশূন্য নারী-পুরুষ, এদের দাম্পত্য জীবনও স্থায়ী হয় না। এই শ্রেণীর শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, গায়ক-গায়িকা, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাসহ নানা পেশায় নিযুক্ত নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে শান্তি নেই। পুরুষ একটির পর আরেকটি স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে, নারীও একটির পর আরেকটি স্বামী পরিবর্তন করছে। ফলে সন্তান-সন্ততির জীবনে নেমে আসছে অন্ধকারের ঘোর অমানিশা। সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই ঈমান ও পরকালের ভীতিহীন নারী-পুরুষদের একই অবস্থা। শান্তির আশায় এরা উন্মাদ, অর্থ-বিত্ত, সহায় সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা সবকিছুই আছে, কিন্তু শান্তি এদের জীবনে সোনার হরিণের মতোই। রাতে ঘুম হয় না, ঘুম নামক নে'মাত এদের জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, ফলে নানা ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে ঘুমের জগতে প্রবেশ করতে হয়।

অপরদিকে যারা ঈমানদার এবং পরকালকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করে, তাদের তেমন অর্থ-সম্পদ নেই। অভাব এদের নিত্যসঙ্গী–কিন্তু এদের জীবনে রয়েছে অনাবিল শান্তি। বৈধ পথে রিয্ক অর্জনের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়িতে ফিরে আসার সাথে সাথে প্রেমদায়িনী স্ত্রী সেবাযত্নের বাহু বিছিয়ে দেয়, ছেলে-মেয়ে মমতার ছায়া বিস্তার করে, ডাল-ভাত যা রান্না হয় তাই আহার করে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। তারপর নামায আদায় করে বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। গোটা রাত পরম শান্তিতে ঘুমায়। যাবতীয় ব্যাপারে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে বলে এরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না, ঈমান ও মহান আল্লাহর স্মরণ এবং পরকালের ভীতিই এদের ভেতরে এই শান্তির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ–

নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই হৃদয়ে শান্তির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেয়। (সূরা রা'দ- ২৮)

যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্ করে, তারা যদি কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় বা

www.pathagar.com

দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হয়, তখন তারা বিপদ থেকে মুক্তিদাতা মহান আল্লাহকেই ডাকে। বিপদগ্রস্ত কোনো মানুষ যখন শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উচ্ছ্বাস উজাড় করে দিয়ে একবার মহান আল্লাহকে 'আল্লাহ' বলে ডাকে–মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর সেই গোলামের ডাকে ৭০ বার সাড়া দিয়ে বলেন, 'বান্দাহ্, আমি তোমার কাছেই আছি, বলো কি চাও।' পবিত্র কোরআন বলছে–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ-اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ-

হে নবী! আমার বান্দাহ্ যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি সন্নিকটে। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। (সূরা বাকারা-১৮৬)

ঈমানদার সন্দেহ-সংশয়ে দোলায়িত হয়ে আপন রব আল্লাহ তা'য়ালাকে ডাকে না, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েই ডাকে। তাঁর আবেদনের মধ্যে কোনো ধরনের কৃত্রিমতা থাকে না। এ জন্য কবি বলেছেন–

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں ، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

দিল ছে যো বাত নিকাল তি হ্যায় আছর রাখ্তি হ্যায়

প্যর নাহি, তা-কতে পরওয়াজ মাগার রাখতি হ্যায়।

হৃদয় থেকে যে কথা নির্গত হয় তা প্রভাব বিস্তার করে। ডানা থাকে না কিন্তু উড়তে পারে।

যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্কারী, মহান আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ-وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ-

www.pathagar.com

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা রয়েছে। তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দোয়া কবুল করেন এবং নিজের দয়ায় তাদের আরো অধিক দেন। (সূরা শূরা-২৫-২৬)

ধন-ঐশ্বর্য্য সফলতার মানদন্ড নয়

ইতোপূর্বে গাধা ও খাসীর গল্পের অবতারণা করে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, খাসীর যত্ন তার মালিক এ জন্য বৃদ্ধি করেছে যে, কোরবানীর চাঁদ উঠেছে এবং তাকে কোরবানী করা হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ বিরোধী লোকদেরকে তাদের ঈমানহীন সৎকাজের বিনিময় হিসাবে এই পৃথিবীতে অধিক ধন-ঐশ্বর্য্য দান করা হয়েছে এ কারণে যে, তাদের সৎকাজ তথা আমলে সালেহ্র পেছনে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না বিধায় তাদের পাওনা এই পৃথিবীতেই পরিশোধ করা হয়েছে। এভাবে করে অতীত যুগে ফেরাউন, নমরুদ এবং তাদের অনুরূপ প্রত্যেক যুগে যারা ভূমিকা পালন করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে সম্পদশালী করেছেন। তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে শান-শওকত, চাকচিক্য ও অর্থ-সম্পদ দেয়া হয়েছে। যারাই মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের ভূমিকা পালন করছে, তাদেরকে এভাবেই পৃথিবীতে কর্মের বিনিময়ে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে।

ইসলাম বিরোধী লোকদের এই চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দেখে এক শ্রেণীর দুর্বল ঈমানের লোকগুলো দ্বীনে হক সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এরা প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কল্যাণ ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে না, তারা ইসলাম বিরোধী আদর্শের মোকাবেলায় দ্বীনে হক-এর দুর্বলতা আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোর ক্রমাগত অসফলতা এবং ইসলাম বিরোধিদের চাকচিক্যপূর্ণ ও জাঁকজক এবং পার্থিব নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দেখে ধারনা করে যে, আল্লাহ বিরোধী লোকগুলোই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব অর্জন করুক, তারাই সর্বত্র সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক, প্রভাব বিস্তার করুক আর যারা 'হক'-এর দাওয়াত দেয়, তারা তারা দুর্বল ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে থাক–এটাই মহান আল্লাহর অভিপ্রায়।

কারণ ইসলাম বিরোধী শক্তির বাহ্যিক চাকচিক্য, জাঁকজমক ও সাজ-সজ্জা, সভ্যতা, সংস্কৃতির সৌন্দর্য, উন্নতি-অগ্রগতির কারণে পৃথিবীর মানুষ তাদের অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা অনুসরণ করতে থাকে। তারা উপায়-উপদানের

www.pathagar.com

প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের নীতি-আদর্শ ও কর্ম কৌশলকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে পৃথিবীতে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীরা নিজেদের কর্ম কৌশল বাস্তবায়ন করার তেমন কোনো উপায়-উপাদান পাচ্ছে না, এদের লোকবল নেই, অর্থবল নেই, প্রচার যন্ত্র নেই, কোনো কিছুরই প্রাচুর্যতা নেই। ব্যক্তি জীবনেও এরা দারিদ্রতার সমুদ্রে নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছাই এটা। তিনি হকপন্থীদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখবেন।

দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকগুলো এই অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে 'হক' তথা মহান আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এখন বরং নামায-রোযা, কোরআন তিলাওয়াত ও তসবীহ্ জপার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী পরিবেশে জীবন যাপন করাই যুক্তি সংগত। এই ধরনের অমূলক চিন্তা-ভাবনা যারা করে, তারা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকগুলোর অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন–

فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ–

নিজ কর্মপন্থার ওপরে দৃঢ়-মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না। (সূরা ইউনুস-৮৯)

দ্বীনে হক বিরোধী, মহান আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধান অনুসারে যারা জীবন-যাপন করে না তাদের অঢেল ধন-সম্পদ দেখে 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী নিজের অভাব ও দারিদ্রতার কথা স্মরণ করে ক্ষণিকের জন্যও মনোক্ষুন্ন হবে না। কারণ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে আখিরাতের জীবনে সর্বোত্তম বিনিময় দান করবেন আর ঐ লোকগুলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল করবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ–

আমি তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পৃথিবীতে যে সম্পদ দিয়েছি সেদিকে তুমি চোখ উঠিয়ে দেখো না এবং তাদের অবস্থা দেখে মনোক্ষুন্ন হয়ো না। (সূরা হিজ্র-৮৮)

www.pathagar.com

ব্যর্থতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত–কারূণ

আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করেন এবং না দিয়েও পরীক্ষা করেন। হযরত মূসা (আঃ) এর যুগে একজন লোক ছিলো, পবিত্র কোরআন যাকে 'কারূণ' নামে উল্লেখ করেছে। এই লোকটি ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছিলো। সরকারী অনুকম্পা লাভ করে এই ব্যক্তি বিপুল ধন-ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েছিলো। তার ইতিহাস আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ-وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ
مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْاُ بِالْعُصْبَةِ اُوْلِى الْقُوَّةِ-اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ-وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ-اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

এ কথা সত্য, কারূণ ছিলো মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো শক্তিশালী লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো। একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, 'অহঙ্কার করো না, আল্লাহ্ অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ্ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরী করার কথা চিন্তা করো এবং পৃথিবী থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ্ করো যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ্ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা কাসাস-৭৬-৭৭)

নিজ জাতির সাথে বিশ্বাঘাতকতা করে কারূণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনে ব্যস্ত ছিলো। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ফেরাউন তাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে লোকটি তৎকালীন যুগে শ্রেষ্ঠ ধনকুবের-এ পরিণত হয়েছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত থেকে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দিলেন, তখন

www.pathagar.com

লোকটি আপন রব মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে দম্ভভরে জবাব দিয়েছিলো–

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُه عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ–

এতে সে বললো, 'এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা, কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছি। কেউ আমাকে অনুগ্রহ করে এসব দান করেনি।

এই দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লোক এবং তার অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِه مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا، وَلاَ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ–

সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিলো? অপরাধীদের তো তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না। (সূরা কাসাস- ৭৮)

ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অহঙ্কারে যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের ঐসব গোষ্ঠীর ধ্বংসের ইতিহাস জানা উচিত, যারা তার তুলনায় অনেক গুণ বেশী অর্থ-সম্পদ ও শক্তির অধিকারী ছিলো। অহঙ্কারের পদভারে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মহান আল্লাহ পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন অপরাধীদের ওপরে আযাবের চাবুক হানেন, তখন তাদেরকে এ কথা বলা হয় না যে, 'তোমরা অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিলে, এই কারণে তোমাদের ওপরে আঘাত হানা হচ্ছে।' বরং আচমকা তাদের ওপরে আযাবের চাবুক হানা হয়।

কারুণের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে এক শ্রেণীর লোভী লোকজন মনে করতো, লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। নিজেদের ধন-সম্পদ না থাকার কারণে তারা আক্ষেপ করতো। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ শোনাচ্ছেন–

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِه فِىْ زِيْنَتِه، قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ، اِنَّه لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ–

www.pathagar.com

একদিন সে (কারুণ) তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা পৃথিবীর জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিলো তারা তাকে দেখে বললো, 'আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরা পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।' (সূরা কাসাস-৭৯)

সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড যাদের জানা ছিল না বা যারা পৃথিবীর জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়াকেই প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করতো, তারা ধারণা করতো, কারুণ বড়ই সফল ব্যক্তি–লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। তারা আক্ষেপ করে বলতো, আমরাও যদি কারুণের অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতাম! ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এই মূর্খ লোকগুলোর মূর্খতা দেখে হকপন্থীরা তাদেরকে বলতো, 'তোমরা যাকে সফলতা বলে ধারণা করছো তা সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হলো মহান আল্লাহ্ প্রতি ঈমান আনা এবং আমলে সালেহ্ করা। আর ঈমান আনা ও আমলে সালেহ্ করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ধৈর্যশীল।' হকপন্থীরা কিভাবে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছিলো, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তা শোনাচ্ছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ
اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وَلاَ يُلَقّٰهَا اِلاَّ الصّٰبِرُوْنَ–

কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলতে লাগলো, 'তোমাদের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না। (সূরা কাসাস- ৮০)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পুরস্কার শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোর জন্যই নির্ধারিত যাদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা রয়েছে। বৈধ পন্থায় উপার্জন করার ব্যাপারে যারা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এই পথে দিন শেষে যদি তাদের ভাগ্যে একটি শুক্নো রুটি জোটে তবুও তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে আর যদি বৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়ে যায়, তবুও তারা মহান আল্লাহ্র দরবারে শোকর আদায় করে। সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ার সুযোগ দেখা দিলেও তারা অবৈধ পথের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে এবং প্রভাব বিস্তার করে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বৈধ পথে উপার্জন তা যতো সামান্যই হোক না কেনো, এতেই তারা তৃপ্তি লাভ করে।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে যারা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, তাদের শান-শওকত দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা-বাসনার জ্বালায় ব্যাকুল হবার পরিবর্তে ঐসব অবৈধ জাঁকজমকের প্রতি চোখ তুলে না তাকানো এবং ধীর স্থির মস্তিষ্কে এ কথা অনুধাবন করা যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই সর্বাধিক উত্তম যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন।

আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ কারূণের ধন-সম্পদ দেখে যেসব লোক তার অনুরূপ ধন সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলো, কারূণকে যারা সফল ব্যক্তি মনে করতো, আল্লাহ তা'য়ালা খুব দ্রুত সে ধারণা পরিবর্তন করে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপর্যয় সৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করলো কারূণ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপরে আযাবের চাবুক হানা হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ-فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ، وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، لَوْ لَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ-

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদা লাভের আকাংখা পোষণ করছিলো তারা বলতে লাগলো, 'আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুঁতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিলো না, কাফিররা সফলকাম হয় না। (সূরা কাসাস- ৮১, ৮২)

অর্থাৎ আমরা এই ভুলে নিমজ্জিত ছিলাম যে, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই হলো সফলতা। এ কারণে আমরা ধারণা করে ছিলাম যে কারূণ বিরাট সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দেখে আমাদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমরা আসল সত্য অনুধাবন করতে পারলাম যে, প্রকৃত সফলতা ভিন্ন জিনিস, যা আল্লাহ বিরোধিদের ভাগ্যে কখনো জোটে না।

www.pathagar.com

'হক'-এর দাওয়াত যারা দেন, তারাও মানুষ এবং মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার পথ কন্টকাকীর্ণ পথ-এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে চলতে গেলে নানা ধরনের বিপদ-মুসিবতে নিমজ্জিত হতে হবে। নিন্দা, অপবাদ আর কটুবাক্য বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে। এতে করে ক্ষণিকের জন্য হলেও 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতায় বিসন্নতা ছেয়ে যেতে পারে। মনে এই চিন্তা জাগতে পারে যে, 'আমি যে লোকগুলোকে ধ্বংস আর ক্ষতির পথ থেকে ফিরিয়ে কল্যাণ আর সফলতার পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, সেই লোকগুলোই আমাকে এভাবে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জর্জরিত করছে।' মনে এই ধরনের চিন্তা জাগরুক হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূলও দাওয়াতের ময়দানে লোকদের কাছ থেকে এমন আঘাত পেতেন। তাঁর মনও ব্যথাভারাক্রান্ত হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার পথনির্দেশনা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এভাবে দিয়েছেন-

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ-وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

আমি জানি, এরা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁরই সকাশে সিজ্‌দাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রব-এর বন্দেগী করে যেতে থাকো। (সূরা হিজ্‌র-৯৭-৯৯)

অর্থাৎ 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, নিন্দা-অপবাদ, কলঙ্ক হকপন্থীদের প্রতি ছুড়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার প্রচার করা হচ্ছে, তার মোকাবেলা করার শক্তি তারা একমাত্র নামায ও মহান আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে। নামায-রোযা আদায়, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতা থেকে বিসন্নতা দূর করে প্রশান্তিতে ভরে দেবে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করবে, সাহসিকতা ও বীরত্ব সৃষ্টি করবে এবং 'হক'-এর দাওয়াত পেশকারীকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে, যার ফলশ্রুতিতে গোটা পৃথিবীর মানুষের ছুড়ে দেয়া নিন্দাবাদ, অপবাদ আর প্রতিরোধের মোকাবেলায় দাওয়াত দানকারী অটুট মনোবলের সাথে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। আর এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

www.pathagar.com

সম্মান মর্যাদার প্রকৃত মানদন্ড

পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার সূরা আল ফজর-এর ১৫ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতে মানুষের সাধারণ নৈতিক অবস্থার সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মানুষরা এমন হয় যে, যখন তার মালিক তাকে অর্থ ও মর্যাদা দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন এবং সম্মান দান করেন তখন সে বলে হ্যাঁ আমার মালিক আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি ভিন্নভাবে তাকে পরীক্ষা করেন এবং এক পর্যায়ে তার রেযেককে সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে নাখোশ হয়ে বলে, আমার মালিক আমাকে অপমান করেছেন।'

কোরআনের জ্ঞান বিবর্জিত কুসংস্কারে বিশ্বাসী বর্তমানের অধিকাংশ লোকদের মতো আরবের সে যুগের লোকদেরও বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি অধিক প্রিয়, তিনি তাকেই অঢেল ধন-সম্পদ দান করেন। আর তিনি যাদেরকে অপছন্দ করেন, তাদেরকে দারিদ্রতার নিস্পেষণে জর্জরিত করেন। এ কথা তারা বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও স্বল্পতা–এই উভয় অবস্থার মধ্যে মানুষকে নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি দেখতে থাকেন, অঢেল ধন-ঐশ্বর্য হস্তগত হলে মানুষ কি ধরনের চরিত্র প্রকাশ করে আর দৈন্যতার মধ্যেই বা মানুষ কোন্ ধরনের আচরণ করতে থাকে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে সে অহঙ্কারী, অত্যাচারী হয়ে ওঠে না মানবতার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটায়। আপন প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অথবা আপন মনিব আল্লাহর কথা ভুলে যায়। আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ থেকে সে অবারিত হস্তে সাহায্যপ্রার্থী বা অভাবীদেরকে দান করে, না অভাবী সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর দ্বীনের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে 'একটি আযাব বিশেষ' বলে মনে করে, না আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে।

আর অভাব এবং দৈন্যতায় আক্রান্ত হয়ে আপন প্রভুকে অভিসম্পাত দিতে থাকে, না ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে। চরম দরিদ্র আর দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে, না অসহিষ্ণু হয়ে ন্যায় অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে অর্থ-সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দারিদ্রের সর্বগ্রাসী অভিশাপ যখন সমস্ত কিছুকেই গ্রাস করে, তখন সে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির ভয়ে অন্যায়-অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত থাকে, না পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে সামান্য কয়েকদিনের সুখভোগের লক্ষ্যে অবৈধ পথে অগ্রসর হয়। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যই তিনি কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন এবং কাউকে দৈন্যতায় নিক্ষেপ করেন।

www.pathagar.com

আখিরাতের প্রতি উদাসীন ও উপেক্ষা প্রদর্শনকারী লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, অর্থ সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই হলো সম্মান এবং মর্যাদার মানদন্ড। এসব জিনিস যার হস্তগত হয়েছে, তিনিই পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত রয়েছে, যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারেনি, তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী নয়। এই ঘৃণিত নীতির আবর্তেই পৃথিবীতে মানবতা আবর্তিত হচ্ছে। উন্নত চরিত্র, উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকমান, সততা, মহানুভবতা, ন্যায়-পরায়ণতা, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি, পান্ডিত্য এসবের কোন মূল্য দেয়া হয় না। এসব দুর্লভ গুণ ও বৈশিষ্ট্য যে সব দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, মানব সমাজে এরা অপাংতেয়। সমাজের কোন একটি স্তরেও নেতৃত্বের আসন লাভের যোগ্য এরা নন। জাতির পরিচালকদের কাছেও এরা গুণীজন হিসাবে বিবেচিত হন না। সামাজিক বা জাতিয় কোন অনুষ্ঠানেও এরা দাওয়াত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। এদের একটিই অপরাধ, কেন তারা ধন-সম্পদ আর প্রভাব- প্রতিপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হননি।

আর আপাদ-মস্তক যাদের নোংরামীতে নিমজ্জিত, কদর্যতা আর কলুষতাই যাদের চারিত্রিক ভূষণ, ন্যায়-অন্যায়বোধটুকু যারা বিসর্জন দিয়েছে, দুষ্কৃতি আর দুর্নীতির উচ্চমার্গে যাদের অবস্থান, অশ্লীলতা আর নোংরামীর যারা স্রষ্টা, পরস্বার্থ অপহরণে যারা পারদর্শী, ব্যক্তিস্বার্থের কাছে যারা জাতিয়স্বার্থ বলিদানে উন্মুখ, সততা, ন্যায়-নীতি শব্দগুলো যারা পরিহার করে চলে, এসব লোকগুলোই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এরাই জাতিয় হিরো এবং গুণীজন হিসাবে বরিত হয়ে থাকে। কারণ এদের রয়েছে অবৈধ পথে উপার্জিত অঢেল অর্থ-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি। সমাজের ক্ষুদ্র একটি নেতৃত্বের আসন থেকে শুরু করে দেশের বৃহত্তর নেতৃত্বের আসনে এরাই সমাসীন। পরকালে অবিশ্বাসী এসব ভ্রষ্ট ও চরিত্রহারা লোকগুলো নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে রয়েছে বলেই সর্বত্র অশান্তি, বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

মানুষের ভেতরে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই হলো সম্মান এবং মর্যাদার মানদন্ড–এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে সূরা আল ফজর-এর ১৭ থেকে ২০ নম্বর আয়াতসমূহে। ১৭ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দটিতেই বলা হয়েছে, كَلَّا 'কাল্লা' অর্থাৎ কখনো নয় বা এমনটি নয়। অর্থাৎ তোমরা যে ধারণা অনুসারে অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছো, তা সত্য নয়। এসব বিষয় সম্মান ও

www.pathagar.com

অসম্মানের মানদন্ড কখনো হতে পারে না। কোন ব্যক্তির চরিত্র উন্নত না নিকৃষ্ট, তা বিবেচনা না করেই এবং এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা বিচার বিবেচনায় না এনে একমাত্র অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান-মর্যাদা ও অপমানের মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছো, এটা তোমাদের মারাত্মক ভুল ধারণা আর বুদ্ধির দৈন্যতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, ধন-সম্পদের মোহ তোমাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, সমাজে যারা ইয়াতিম, তাদের ধন-সম্পদ পর্যন্ত তোমরা আত্মসাৎ করে নিজের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করছো।

সম্মান-মর্যাদা ও অপমানের যে মানদন্ড তোমরা নির্ধারণ করেছো, এটা বহাল থাকলে ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করে অবৈধ পথে অপরের সম্পদ ও ইয়াতিমদের সম্পদ কৌশলে আত্মসাৎ করার পথে কোনই প্রতিবন্ধকতা থাকে না। পিতা অথবা পিতা মাতা উভয়ের অবর্তমানে ইয়াতিমরা চরম অসহায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে তোমরা প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করো। এই ইয়াতিমদের পিতা অথবা পিতা-মাতা উভয়েই জীবিত থাকা অবস্থায় তোমরা এদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেছো। যখনই তারা পিতাকে হারিয়ে চরম এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়েছে, তখনই তোমাদের দৃষ্টিতে তারা করুণার পাত্র এবং লাঞ্ছনা-অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত হয়েছে। এই ইয়াতিমরা তোমাদের দৃষ্টিতে কোন ধরনের অধিকার লাভের যোগ্য নয়।

শুধু তাই নয়, অভাবীদেরকেও তোমরা কোনই সাহায্য করো না। তোমাদের প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক নীতির কারণে অর্থ-সম্পদের ওপরে একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম করেছো তোমরা। শোষিত শ্রেণী ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক মুঠো খাদ্যের আশায় যখন তোমাদের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, তখন তোমরা যেমন ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে খাদ্য দাও না, তেমনি অন্যকেও অভাবীদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে বা খাদ্য দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দাও না। এমনকি তোমাদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করে তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ সুষম বন্টন না করে নিজেই কুক্ষিগত করো। তৎকালীন আরব সমাজে মৃত ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ বন্টনের এক অদ্ভূত নীতি প্রচলিত ছিল। মৃত ব্যক্তির যাবতীয় অর্থ-সম্পদ পরিবারের পুরুষদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি লাভ করতো, যে ব্যক্তি ছিল যুদ্ধবাজ। যুদ্ধ করা এবং পরিবারবর্গের সংরক্ষণ করার ক্ষমতা যার ভেতরে ছিল, সে-ই যাবতীয় অর্থ-সম্পদ দখল করতো। অর্থাৎ শক্তিশালী ব্যক্তি অন্যান্য শরীকদের বঞ্চিত করে একাই সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যেতো। পরিবারের অসহায়, অক্ষম, দুর্বল, নারী ও শিশুদেরকে, ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো। আরব জাহিলিয়াতের ঐ ঘৃণ্য প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মতো বর্তমান

www.pathagar.com

সমাজকেও আক্রান্ত করেছে। শোষণমূলক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে শোষক শ্রেণী আরেকদিকে সৃষ্টি হয়েছে শোষিত শ্রেণী। বৈধ পথে সহজে অর্থোপার্জনের যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশে শোষক শ্রেণীর হাতে পুঁজি আবর্তিত হবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং এ কারণেই ধনীর অর্থ-সম্পদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে আর গরীব ক্রমশঃ নিঃস্বই হয়ে যাচ্ছে।

সাহায্য-সহযোগিতা লাভের আশায় অভাবী-গরীব লোকজন ধনীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে পথও তাদের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে। সমাজের অসহায়, দুর্বল, অক্ষম ও ইয়াতিমদের সম্পদ দখল করার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের কৌশলের উদ্ভাবন করা হয়েছে। কল-কারখানা, লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জায়গা-জমির প্রয়োজনে পুঁজিপতি ধনীক শ্রেণী কৌশলে দুর্বলের জায়গা দখল করে অথবা স্বল্পমূল্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করে। দেশের প্রচলিত আইনও এদেরকেই সহযোগিতা করে। অপরকে ঠকানো, অন্যের অধিকার খর্ব করা, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার লক্ষ্যেই আখিরাতে অবিশ্বাসী লোকজন তাদের মন-মগজ প্রসূত নিয়ম-পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত করেছে।

এসব করা হয়েছে মাত্র একটিই উদ্দেশ্যে যে, তারা অর্থ-সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ধন-সম্পদ এদের কাছে এতটাই প্রিয় যে, তা অর্জনের জন্যে এরা যে কোন পথ অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। নিজের দেশের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মোড়ল রাষ্ট্রগুলো অনুন্নত দুটো দেশের মধ্যে উস্কানি দিয়ে যুদ্ধ বাধায়। এরপর শুরু করে উভয় রাষ্ট্রের কাছে মারণাস্ত্র বিক্রির ব্যবসা। দুর্বল রাষ্ট্রকে তার দেশের খনিজ সম্পদ বিক্রি করে নিঃস্ব হতে বাধ্য করা হচ্ছে। অশ্লীল অশালীন চরিত্র বিধ্বংসী গ্রন্থ রচনা এবং ছায়াছবি নির্মাণ করে তা দেশে দেশ সরবরাহ করে প্রভূত অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। এভাবে নানা কৌশলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোকে অন্যায়ভাবে শোষণ করছে, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

দেশের অভ্যন্তরেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আখিরাতের প্রতি উদাসীন লোকগুলো দ্রুত অর্থ-বিত্তের মালিক হবার লক্ষ্যে সুদ, ঘুষ, মাদক ব্যবসা, নারী দেহের ব্যবসা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। তার ব্যবসার কারণে জাতিয় চরিত্র কোন নিম্ন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলো, সমাজে কোন ধরনের অশান্তি আর বিপর্যয় সৃষ্টি হলো এর কোনদিকেই অর্থলোলুপ লোকগুলো দৃষ্টি দেয় না। অর্থ এদের কাছে এত অধিক প্রিয় বস্তু যে, তা অর্জনের জন্য এরা মানুষ অপহরণ করে তার দেহের রক্ত, কিড়নী ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করে। শুধু তাই নয়, অর্থলোভীরা মানব কংকালের ব্যবসা পর্যন্ত শুরু করেছে।

www.pathagar.com

অর্থলোলুপ লোকগুলো এই ধরনের জঘন্য কর্মকান্ডে এ জন্যই লিপ্ত হয় যে, এরা বিশ্বাস করে এমন কোন সত্তা নেই, যিনি তাদের প্রতিটি কর্মকান্ড রেকর্ড করে রাখছেন, যাবতীয় গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখছেন এবং যার কাছে মৃত্যুর পরে জবাবদিহি করতে হবে। সুন্দর করে সাজানো এই পৃথিবীটা কখনো কোনদিনই ধ্বংস হবে না, চিরযৌবনা এই পৃথিবীর যৌবন অনন্তকাল অটুট থাকবে, বার্ধক্য এই পৃথিবীকে হানা দেবে না, হবে না পৃথিবী কখনো জরাগ্রস্ত।

সুতরাং নিজের, পরিবারের সদস্যদের ভোগ-বিলাস ও উত্তরাধিকারীদের প্রাচুর্যতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিক সম্পদ বৃদ্ধিই এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

সূরা আল ফজর-এর ২১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে, অর্থলোলুপদের প্রতি অবিমিশ্রিত ঘৃণা বর্ষণ করা হয়েছে এবং এদের নিকৃষ্ট পরিণতির চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। ২১ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দেই বলা হয়েছে, অসম্ভব! কখনোই না, তোমরা যা ধারণা করছো, অবশ্যই তা নয়। নানা চিত্রে, অপূর্ব অলংকারে, মনোরম দৃশ্যে সাজানো এই পৃথিবীর সবটুকু যৌবন নির্মম হাতে শোষণ করে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা বানিয়ে দেয়া হবে। সমস্ত পৃথিবীটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলায় পরিণত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। দেখার যদি সেদিন কেউ থাকতো তাহলে সে দেখে কল্পনাও করতে পারতো না, পৃথিবী নামক গ্রহটায় কখনো সৌন্দর্যের কোন চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

মহাধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমস্ত মৃত মানুষদের ভেতরে প্রাণের সঞ্চারিত করা হবে। তারপর তারা সবাই উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। পৃথিবীতে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যা রয়েছে, তা সেদিন দৃষ্টি গোচরে আনা হবে। প্রজ্জ্বলিত জাহান্নাম মানুষের সামনে উপস্থিত করা হবে। অগণিত ফেরাশ্‌তাদেরকে মানুষ দেখতে পাবে। মানুষের সৎকাজ ও অসৎকাজ পরিমাপ করার জন্য পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হবে। হিসাব গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি মানুষ সেদিন দেখতে পাবে। পৃথিবীতে মানুষ গোপনে যা করেছে, প্রকাশ্যে যা করেছে, তা সবই সেদিন সর্বসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে যারা পৃথিবীতে অস্বীকার করতো, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না বলে বিশ্বাস করতো, তারা সেদিন দেখতে পাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রচন্ড প্রতাপ। আল্লাহর পক্ষ থেকে সেদিন ঘোষণা দেয়া হবে–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ–لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ–

আজ বাদশাহী ও রাজত্ব কার? কে একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী? সমস্ত সৃষ্টিলোক থেকে আওয়াজ উঠবে, একমাত্র আল্লাহ্‌র যিনি কাহ্‌হার। (সূরা মু'মিন-১৬)

পৃথিবীতে অসংখ্য ভ্রান্ত পথ ও মতের অনুসারী জালিম গোষ্ঠী ও দল নিজেদের ক্ষমতার এবং শক্তিমত্তার অহঙ্কারে ধারণা করতো, তাদের মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই। তাদেরকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে বা তাদের মোকাবেলা করতে পারে, এমন শক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে অধিকাংশ লোকগুলো এসব জালিমদের আনুগত্য ও প্রশংসা করতো। কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে, আজ বলো প্রকৃত শাসনদন্ড কার হাতে–বাদশাহী ও রাজত্ব কার? যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী কে? সবর্ত্র কার আদেশ চলছে?

এই বিষয়গুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন মানুষ যদি বিষয়টি অনুধাবন করে, তাহলে সে যত বড় ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, তার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়ে পারে না। চরম অহঙ্কারী ব্যক্তিও বিনয়ী না হয়ে পারে না। সামানী বংশের প্রতাপশালী শাসক নাসর ইবনে আহ্‌মদ নিশাপুরে আগমন করে একটি দরবার আহ্বান করেন। তারপর তিনি আদেশ জারী করেন, তিনি সিংহাসনে আসীন হবার পর আল্লাহ্‌র কোরআন তেলাওয়াত করা হবে এবং তারপরেই দরবারের কাজকর্ম শুরু হবে। একজন আলেম আল্লাহ্‌র কোরআনের সূরা মু'মিনের ১৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যার অর্থ হলো, 'আজ বাদশাহী ও রাজত্ব কার? কে একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী? সমস্ত হাশরের ময়দান থেকে আওয়াজ উঠবে, একমাত্র আল্লাহ্‌র যিনি কাহ্‌হার।' কোরআনের এই আয়াত শুনে তিনি এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, কাঁপতে কাঁপতে তিনি সিংহাসন থেকে নেমে মাথার রাজমুকুট খুলে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, 'হে আমার রব! সমস্ত বাদশাহী এবং ক্ষমতা একমাত্র তোমারই-আমি তোমার গোলাম।'

কিয়ামতের দিনের ভয়াল চিত্র দেখে মানুষ ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে যাবে। চোখের পলক ফেলতেও তারা ভুলে যাবে। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যিনি নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তিনিই সেদিন প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাঁর সামনে কারো পক্ষে সামান্য একটি শব্দ করারও সাহস হবে না। তিনিই সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। যে ফেরেশ্‌তারা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর আদেশ পালন করছে, তারা সেদিন নীরব নিস্তব্ধ মূক-বধিরের মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবতীয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার রব সেদিন স্বয়ং আবির্ভূত হবেন' এ কথাটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্‌র যে অসীম

ক্ষমতার কথা ও কিয়ামতের দিনের দৃশ্যের কথা শোনাচ্ছেন, সেদিন মানুষ এই চর্মচোখে তা প্রত্যক্ষ করবে। পৃথিবীর বুকে সবথেকে ক্ষমতাধর ব্যক্তিও সেদিন আল্লাহ্‌র প্রবল প্রতাপের সামনে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার প্রকাশ সেদিন মানুষের সামনে ঘটবে, এই অর্থেই বলা হয়েছে, সেদিন তোমার রব্ব স্বয়ং আবির্ভূত হবেন।

আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নবী-রাসূলগণ মানুষকে সতর্ক করেছে, কিন্তু তারা তাঁদের কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি। মিরাসী সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ অন্যান্য হকদারদের মধ্যে বন্টন না করে পৈশাচিক লোভের বশবর্তী হয়ে এবং অদম্য আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে একাই আত্মসাৎ করেছে। অক্ষম, দুর্বল, অসহায়-ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ শক্তির বলে দখল করেছে। অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদের স্তূপ গড়েছে। অন্যায় পথে অর্থোপার্জন করতে গিয়ে দেশ, সমাজ ও মানবতার কি মারাত্মক ক্ষতি করেছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়নি। অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থীকে ধারে কাছে ঘেষ্‌তে দেয়নি; অর্থ-সম্পদের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণে পৃথিবীকে অমর-অক্ষয় মনে করেছে। তাদের এই ধারণা, বিশ্বাস এবং কর্মকান্ড স্বয়ং তাদের জন্যেই কি বিরাট ক্ষতি ডেকে এনেছে, সেদিন তারা অনুভব করতে পারবে। অনুশোচনা আর অনুতাপে সেদিন তারা ভেঙে পড়বে। প্রকৃত চেতনা সেদিন জাগ্রত হবে, কিন্তু তা কোনই কাজে আসবে না। পরিণতি দেখার পূর্বে পৃথিবীর জীবনে যদি চেতনা জাগ্রত হতো, তাহলে তা কাজে আসতো। কিন্তু কর্মের নিকৃষ্ট পরিণতি দেখার পরে যে চেতনা জাগ্রত হবে, তা অনুশোচনা বৃদ্ধিই করে চলবে।

এই অর্থলোলুপ অভিশপ্ত লোকগুলো সেদিন নিকৃষ্ট পরিণতি দেখে আফসোস করে বলতে থাকবে, সেদিন আমরা যদি নবী-রাসূলদের অনুসরণ করে অন্যের হক বুঝিয়ে দিতাম এবং অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ না করতাম! পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখের জন্য ন্যায়-অন্যায়বোধ ত্যাগ করে অর্থোপার্জন করেছি, কিন্তু অনন্তকালের এই জীবনের জন্যে কোন কিছুই এখানে পাঠাইনি। যদি এই চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে পূর্বেই এখানে কিছু পাঠাতাম, তাহলে আজ এমন নিকৃষ্ট পরিণতি বরণ করতে হতো না। অপরাধীরা সেদিন পেছনে ফেলে যাওয়া জীবনের যাবতীয় অপকর্মকে স্মরণ করে আবার নতুনভাবে উপদেশ গ্রহণ করে সৎ পথ অবলম্বন করার জন্য আগ্রহ পোষণ করবে। কিন্তু সেদিন এই স্মরণ এবং আগ্রহ কোনটাই কাজে আসবে না। পৃথিবীর জীবনে সৎকাজ করার যে সুযোগ তার ছিল সে কথা স্মরণ করে সেদিন সে শুধু আক্ষেপই করতে থাকবে।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, সেদিন তাদের অনুতাপ আর অনুশোচনা তাদেরকে আমার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের অবাধ্যতার কারণে সেদিন তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে, যার দৃষ্টান্ত একমাত্র আমি ব্যতীত অন্য কেউ-ই স্থাপন করতে পারবে না। আমি এমনভাবে তাদেরকে সেদিন বাঁধবো, আমার কোন সৃষ্টি তেমনভাবে বাঁধতে সক্ষম নয়। আমি এমন আযাবে সেদিন তাদেরকে নিক্ষেপ করবো, যে আযাব অন্য কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়।

সূরা আল ফজর-এর ২৭ থেকে ৩০ আয়াতে ঐসব নেককার সৎলোকগুলোর কথা বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যারা দ্বিধাহীন চিত্তে, সন্দেহ মুক্ত মনে, কোন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতীতই মানসিক প্রশান্তির সাথে আপন প্রভু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিধান অনুসরণ করেছে। আল্লাহ্র নিদের্শকে বোঝা মনে করে, শাস্তি মনে করে অনিচ্ছা সত্বে এবং বাধ্য হয়ে তারা আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করেনি। বরং প্রশান্ত চিত্তে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস আর শ্রদ্ধা মিশ্রিত করে আল্লাহ্র প্রতিটি নির্দেশ পালন করেছে। আল্লাহ্ তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তার জটিল দেহকে পরিচালিত করছেন, যে পৃথিবীতে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, এই পৃথিবীকে তার জন্যে বসবাসের উপযোগী করেছেন, এখানে জীবন ধারণের জন্যে যাবতীয় উপকরণ তিনি সরবরাহ করছেন, তারই জন্য তার প্রভু এই পৃথিবীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে তারই কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তারই কল্যাণে উদ্ভিদ সবুজ-শ্যামলীমার অলঙ্কারে সজ্জিত হচ্ছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে তিনি তাকে করুণাধারায় সিক্ত করছেন। এই অনুভূতিতে সে আপন স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে।

স্রষ্টার প্রতি অসীম মমতা আর শ্রদ্ধায় তার হৃদয়-মন বিগলিত হয়ে সে বার বার আপন রব্বকে সিজ্দা দিয়ে, রব্ব-এর প্রতিটি নিদের্শ পরম শ্রদ্ধাভরে সম্মান ও মর্যাদার সাথে অনুসরণ করে নিজের মানসিক প্রশান্তি ব্যক্ত করেছে। আপন প্রভুর নিদের্শ পালন করতে গিয়ে এবং তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে যাবতীয় অত্যাচার-নির্যাতন নিপীড়ন হাসি মুখে বরণ করেছে। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠকে জান্নাতের মতোই মনে করেছে। ফাঁসির রশিকে মনে করেছে জান্নাতী ফুলের মালা। পৃথিবীর জীবনে কোন কষ্টকেই সে কষ্ট বলে মনে করেনি। এসবই করেছে সে আপন রব্ব-এর প্রতি পরম প্রশান্তির কারণে। এই শ্রেণীর লোকদেরকেই কিয়ামতের ময়দানে আহ্বান করা হবে, 'হে প্রশান্ত আত্মা!' বলে। এভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শুধু কিয়ামতের ময়দানেই আহ্বান জানানো হবে না, ঐ শ্রেণীর লোকগুলোর মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন দান করেও একইভাবে আহ্বান জানানো হবে।

www.pathagar.com

অপরাধীদের মৃত্যুর সময় যেমন কঠিন আযাবের সাথে তাদেরকে অপমান আর লাঞ্ছনা দিতে দিতে বন্দীশালার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তার বিপরীতে আল্লাহর গোলামদের মৃত্যুর সময় এভাবে আহ্বান জানিয়ে তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হবে যে, তুমি যেমন প্রশান্ত চিত্তে তোমার রব-এর গোলামী করে জীবনকাল অতিবাহিত করেছো, তেমনি তোমার রব-ও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং এগিয়ে চলো আপন মনিবের রহমতের দিকে। সেই মেহ্মান খানায় গিয়ে প্রশান্তিদায়ক সুসুপ্তিতে নিমগ্ন হও, যা তোমার মনিব তোমার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

হাশরের ময়দানে পুনর্জীবন দান করে যখন উঠানো হবে, অপরাধীরা ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়বে, তাদেরকে কঠিন বন্ধনে বেঁধে শাস্তি দেয়া হবে, সেই কঠিন দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও আল্লাহর অনুগত গোলামদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হবে, আজকের দিনের কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না, সুতরাং প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান করতে থাকো। এই নিশ্চয়তা দেয়া হবে মধুমাখা শব্দে, মমতা সিক্ত ভাষায়। পরিশেষে ঐ একই আহ্বান জানিয়ে বলা হবে, তোমরা যেমন আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে, আমিও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম। এখন চলো তাঁরই দিকে, যাঁর সাথে তোমাদের প্রকৃত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে তোমরা পৃথিবীতে অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেছো। তবুও আপন প্রভুর সাথে গোলামীর সম্পর্কে কোন ফাটল ধরতে দাওনি।

আমার সাথে ছিল আমার প্রিয় বান্দাহ্দের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, পরম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আমার প্রতি ছিল তাদের হৃদয়ে অদম্য আকর্ষণ, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যারা দিবারাত্রি প্রতি মুহূর্তে ছিল ব্যাকুল। যারা পৃথিবীতে প্রতিটি কাজেকর্মে আমার নির্দেশ কি, তার অনুসন্ধান করে তা অনুসরণ করেছে, আমিও আমার সেই ব্যাকুল গোলামদের জন্যে, প্রিয় বান্দাহ্দের জন্যে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি, যেখানের সুখ-শান্তি কখনো কোনদিন শেষ হবে না, সেই অশেষ সুখময় স্থান জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করো। ঐ জান্নাত তোমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে শেষ কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ، اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

www.pathagar.com

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

(১) সময়ের শপথ! (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত আছে), (৩) সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তা'য়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে সেই (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং এরা একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সূরা আসরে চারটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এবং সফলতা সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষসহ যাবতীয় প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবন ধারনের ব্যবস্থাও স্বয়ং তিনিই করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি প্রয়োজনীয় পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং মানুষকেও তিনি জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এমন কোনো পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম নয়, যে পথে চললে সে পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু নিচয় ব্যবহারের জ্ঞান মানুষকে দেয়া হয়েছে আর সফলতা ও ব্যর্থতার পথনির্দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ কোন্ পথ অবলম্বন করে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করলে মানুষ পৃথিবী ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে, সে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তিনি সে পথপ্রদর্শন করেছেন।

তিনি সফলতা ও ব্যর্থতার পথ মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, আর কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের এই উভয় জগতের জীবন সাফল্যমন্ডিত হবে। সূরা আসরে মানুষের স্রষ্টা, মানুষের সফল জীবনে উত্তম প্রতিদান দেয়ার মালিক এবং ব্যর্থ জীবনে অশুভ পরিণতি ভোগ করানোর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কোনো ব্যক্তি বিশেষকে, কোনো দল-গোষ্ঠীকে বা কোনো বিশেষ দেশের মানুষকে লক্ষ্য করা এ কথা বলা হয়নি যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। বরং 'ইনসান' শব্দ ব্যবহার করে গোটা মানবমন্ডলীকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তারা মহাক্ষতিতে নিমজ্জিত। সমস্ত মানুষ ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে ধাবমান।

www.pathagar.com

এতটুকু বক্তব্য পেশ করে মানবমন্ডলীকে হতাশার অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত করা হয়নি। সাথে সাথে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, কোন্ পথ অবলম্বন করলে এবং কোন্ কাজসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করলে মানুষ সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের জীবন কল্যাণময় হবে, তা আলোচ্য সূরা আসরে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রথমেই বলা হয়েছে, মানুষকে ঈমান আনতে হবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেভাবে ঈমান আনতে বলেছেন, তেমনই ভাবে ঈমান আনতে হবে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, শুধু ঈমান আনলেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা যাবে না। সেই সাথে ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল পৃথিবীতে জীবন-যাপনের লক্ষ্যে যে বিধান পেশ করেছেন, সেই বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয়ত ঈমান এনে ও আমলে সালেহ্ করে যে ব্যক্তি মহাক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সফলতা ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বার্থপরের মতো নিজেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকবে না, অন্য মানুষকেও মহাক্ষতি থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে। অর্থাৎ যে জীবন ব্যবস্থা অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করলে মহাক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে এবং সফলতা অর্জিত হবে বলে সে বিশ্বাস করে তা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করছে, সেই জীবনাদর্শ অনুসরণ করার জন্য অন্য মানুষকেও আহ্বান জানাবে। যার ভেতরে কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে অনুসরণ করছে, তা মানুষ সমাজে প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথে সদাতৎপর থাকবে।

মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার ও সফলতা অর্জন করার চতুর্থ বিষয়টি হলো, 'হক' অনুসরণ করতে গিয়ে এবং 'হক'-এর প্রচার-প্রসার ও তা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট, বাধা-প্রতিবন্ধকতা সম্মুখে আসবে তার মোকাবেলায় ধৈর্য তথা 'সবর' অবলম্বন করতে হবে। 'হক'-এর অনুসরণ করতে গেলে এবং মানব সমাজে 'হক'-এর প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গেলে 'হক' বিরোধী গোষ্ঠী ময়দান ছেড়ে দেবে না। সম্মুখে তারা প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলে দেবে। 'হক' অবলম্বনকারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে, মিথ্যাচার ছড়াবে, শারীরিকভাবে প্রহৃত করবে, অপমান ও লাঞ্ছিত করবে। সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে। কারাগারে নিক্ষেপ করবে, ফাঁসির রশিতে ঝুলাবে। দেশ থেকেও বিতাড়িত

www.pathagar.com

করবে। নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দেবে। এসব কিছুর মোকাবেলায় সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ করে 'হক'-এর পথে অটল-অবিচল থাকতে হবে, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে মন্‌যিলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর নামই হলো ধৈর্য।

এই চারটি কাজ বিশ্বস্ততার সাথে আঞ্জাম দিতে পারলেই মহাক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সফলতা অর্জন করা যাবে। আর এই চারটি কথাই আলোচ্য সূরা আসরে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূল এবং তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম এই চারটি কাজ করেছেন।

যুগে যুগে যাঁরা সফলতার পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁরাও এই চারটি কাজকে জীবনের অন্য সকল কাজের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই চারটি কাজ যারা সফলভাবে করতে পেরেছেন, তাঁরাই মহান আল্লাহর রহমতের দৃষ্টির আওতায় এসেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন। কবি বলেন–

পড়্গিয়া যিছ্ পর নযর বান্দাহ্ কো মাওলা কর দিয়া
আ-গিয়া যিস্ দাম মে জোশ্, কাত্রা কো দরিয়া কর দিয়া।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমতের দৃষ্টি যদি তাঁর কোনো গোলামের প্রতি নিপতীত হয়, তাঁর সে গোলাম বাদশায় পরিণত হয়ে যায়। তাঁর রহমতের দৃষ্টি যদি এক ফোঁটা পানির প্রতি নিপতীত হয়, সে পানি ফোঁটা অগাধ জলধীতে পরিণত হয়ে যায়।

আল্লাহর কোরআনের গবেষকগণ বলেছেন, মানুষ যদি সূরা আসর সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানুষের হেদায়াতের জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট। আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এই সূরাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলেই তারা একে অপরকে এই সূরাটি তেলাওয়াত করে শোনাতেন। তাঁরা একে অপরকে এই সূরা না শুনিয়ে বিদায় গ্রহণ করতেন না।

এই সূরাটির ছোট্ট ছোট্ট বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক ও ভাবপ্রকাশক মর্ম নিহিত রয়েছে। এই ছোট্ট সূরাটির মধ্যে ভাবের এক মহাসমুদ্র প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই সূরাটির মূল আলোচিত বিষয় হলো, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ কোনটি এবং কোন্ পথে তার ধ্বংস ও বিপর্যয় তা স্পষ্টভাবে এই সূরায় বলে দেয়া হয়েছে। মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এই ক্ষুদ্র সূরার ভেতরে মানব জীবনের জন্য

www.pathagar.com

একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেন ক্ষুদ্র ঝিনুকের মধ্যে একটি মহাসমুদ্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সুতরাং সূরা আসরের তাফসীর অধ্যয়ন করা একান্তই জরুরী।

এই সূরার তাফসীর করে শেষ করা যাবে না। শেষ পর্যায়ে পুনরায় চিরসত্য সেই কথাটি উল্লেখ করছি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার পদ এবং অঢেল ধন সম্পদের অধিকারী হবার অর্থ সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতার অর্থ হলো, আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণকে নিজ চরিত্রের অলঙ্কারে পরিণত করা। যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বুদ্ধিমত্তার সাথে অতিক্রম করে নিজেকে মহান আল্লাহ্র গোলাম হিসেবে গড়ে তোলার নামই হলো সফলতা।

বস্তুত এই সূরায় বিবৃত চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ ও রাষ্ট্র, যে সমাজ ও রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজো পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় শোষণ-লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন নিস্পেষন থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণমুক্ত ভীতিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হয়। আর এটাই হচ্ছে ইসলামী জিন্দেগীর সাফল্য ও ব্যর্থতার মানচিত্র। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে কোরআনের শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফিক এনায়েত করুন– আমীন।

www.pathagar.com

দ্বীনে হকের আন্দোলনে শরীক না থাকার পরিণতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বীনে হক-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বহু আয়াতে حق 'হক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে এই حق 'হক' শব্দটির দুটো অর্থ করা হয়েছে এবং আল্লাহর কোরআনেও দুটো অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির প্রথম অর্থ হলো, 'প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ বিষয়, সত্য-সঠিক-নির্ভুল, অভ্রান্ত, ইনসাফ, ন্যায়' ইত্যাদি। দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, 'অধিকার বা পাওনা।' মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ত্রিশ পারার ছোট্ট সূরা– সূরা আসরের মধ্যেও حق 'হক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই حق 'হক' শব্দের ভেতর উল্লেখিত দুটো অর্থ নিহিত রয়েছে। এই শব্দটি মিথ্যার বা বাতিলের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। ঈমানদারগণ যে সমাজ, দল বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে, সেই সমাজে, দলে বা রাষ্ট্রে কোনক্রমেই যেন সত্যের পরিপন্থী, ইনসাফের বিপরীত, মিথ্যা বা বাতিলের অনুকূলে কোন ধরনের কাজ যেন না হতে পারে, সেদিকে সবাই সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখবে। ঈমানদারদের জীবন হবে মহান আল্লাহর রঙে রঙিন, এই রঙের বিপরীত কোন ধরনের রঙকে ঈমানদাররা বরদাস্ত করতে পারে না। এখানে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন বাতিল মতবাদ–মতাদর্শ দেখলে বা হকের বিপরীত কোন কাজ সংঘটিত হতে দেখলেই ঈমানদাররা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করবে।

সত্যের বিপরীতে মিথ্যার অনুকূলে কোন শক্তি জেগে ওঠা মাত্র ঈমানদাররা তার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য বুহ্য রচনা করে মিথ্যা শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। যে শক্তি ঈমানের বিপরীত কোন কিছুর আমদানী করার চেষ্টা করবে, সে শক্তির উদ্ধত মস্তকে পদাঘাত করে তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে দেবে।

ঈমান তথা 'হক'–এর বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের জাগরণকে তারা স্তব্ধ করে দেবে। মানুষের ওপরে মহান আল্লাহ তা'য়ালার যে 'হক' রয়েছে, তেমনি আল্লাহ তা'য়ালার ওপরেও মানুষের 'হক' রয়েছে। মানুষের ওপরে মহান আল্লাহর 'হক' মানুষ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব, গোলামী, বন্দেগী, আরাধনা-উপাসনা করবে। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মানুষের যে 'হক' রয়েছে, তা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে নিজেই ধার্য করে নিয়েছেন।

এই হক মানুষ বা অন্য কোনো শক্তি ধার্য করেনি বা করার ক্ষমতা রাখে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মেহেরবানী করে স্বয়ং যদি তা নিজের ওপর ধার্য করে না নিতেন, তাহলে তা আল্লাহর ওপর আরোপ বা ধার্য করার কোনো ক্ষমতাই মানুষের ছিল না।

www.pathagar.com

আল্লাহর ওপর মানুষের 'হক' হলো তিনি মানুষকে প্রতিপালন করবেন, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবেন। মানুষের জীবন ধারণ, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদির জন্য মানুষের যে ক্ষমতা, যোগ্যতা ও উপায়-উপকরণ প্রয়োজন, তা মহান আল্লাহ সরবরাহ করবেন, এটা হলো আল্লাহর প্রতি মানুষের হক বা অধিকার এবং এই অধিকার মানুষ না চাইতেই মহান আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ নির্ভুল পথ রচনা করতে সক্ষম নয়, এ জন্য আল্লাহর প্রতি মানুষের হক হলো, তিনি মানুষকে নির্ভুল পথপ্রদর্শন করবেন। মানুষের এই অধিকারও মানুষ না চাইতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদের মাধ্যমে তা পূরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে। (সূরা নাহ্ল-৯)

(বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা, সূরা আল আ'লা-এর ৩ নং আয়াত ও সূরা আল লাইল-এর ১২ নং আয়াতের তাফসীর পড়ুন।)

মানুষ তার কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে মহান আল্লাহর কাছ থেকে, এটা আল্লাহর প্রতি মানুষের হক। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত মেহেরবানী করে আদালতে আখিরাতে এই 'হক'–ও আদায় করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যাবতীয় 'হক' মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে মানুষের প্রতি তাঁর 'হক'–এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ، قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ، اَفَمَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لاَّ يَهِدِّيْ اِلاَّ اَنْ يُّهْدٰى–

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমনও কি কেউ আছে, যে মহাসত্যের (হক-এর) দিকে পথ দেখায়? বলো, কেবল আল্লাহই এমন, যিনি মহান সত্যের (হক-এর) দিকে পথ দেখান। তাহলে এখন বলো, মহান সত্যের (হক-এর) দিকে যিনি পথ দেখান তিনিই কি বেশী অধিকারী নন যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে? না সে, যে নিজে কোনো পথ দেখাতে পারে না, বরং তাকেই পথ দেখাতে হয়। (সূরা ইউনুস-৩৫)

www.pathagar.com

হক-এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তারিতভাবে বুঝে নেয়া একান্তই আবশ্যক। মানুষের প্রয়োজন অসীম। শুধুমাত্র তার জীবন ধারনের উপায়-উপকরণ লাভ করার মধ্যে দিয়েই প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় না। তার সবথেকে বড় প্রয়োজন হলো একটি নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। মানুষ তার ব্যক্তি স্বত্তার, শক্তি-ক্ষমতা, সামর্থ যোগ্যতা, পৃথিবীর যেসব বস্তু নিচয়ের প্রতি সে কর্তৃত্বশীল রয়েছে তার সাথে, পৃথিবীতে যে অগণিত মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের সাথে, অর্থাৎ গোটা বিশ্বলোকের অধীনে অবস্থান করে মানুষ যে কর্মকান্ড করে তার সাথে সে কোন্ আচরণ গ্রহণ করবে, তা নির্ভুলভাবে অবগত হওয়া মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক। তার অবগত হওয়া প্রয়োজন, কোন্ পন্থা-পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করলে সামগ্রিক ভাবে তার জীবন মহান আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থেকে সফল হতে পারবে এবং তার যাবতীয় চেষ্টা-সংগ্রাম ব্যর্থ না হয়ে সফলতা অর্জন করবে। এই নির্ভুল পথ, পন্থা-পদ্ধতি, নীতি-আদর্শের নামই হলো 'হক' বা মহাসত্য।

আর এই মহাসত্যের দিকে, অভ্রান্ত পথের দিকে যে নেতৃত্ব মানুষকে পরিচালিত করবে, তাই হচ্ছে 'সত্যের হিদ্বায়াত'। এ জন্য মহান আল্লাহ্ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আমার প্রতি তোমাদের যা 'হক' রয়েছে আমি তা আদায় করার ব্যবস্থা করেছি। এখন তোমাদের প্রতি আমার 'হক' রয়েছে, তোমরা কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। এখন তোমরা আমার দাসত্ব ত্যাগ করে, আমার দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত না করে অন্য যাদের আইন অনুসরণ করছো, তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সত্যের হেদায়াত লাভের তথা 'হক' পথপ্রদর্শনের কোনো সূত্র রয়েছে, এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে কি?

মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যদি তারা মহান আল্লাহর 'হক' আদায় না করে। আল্লাহর 'হক' আদায় না করা সবথেকে বড় অকৃতজ্ঞতা। যারা মহান আল্লাহর 'হক' অস্বীকার করে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ، فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِه، وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا-

হে নবী বলে দাও, হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে প্রকৃত সত্য (হক) এসে পৌঁছেছে। এখন যে ব্যক্তি সত্য-সোজা পথ অবলম্বন করবে, তার এই সত্য পথ অবলম্বন তারই জন্য কল্যাণকর হবে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে, তার ভ্রষ্টতা তার পক্ষেই ক্ষতিকর হবে। (সূরা ইউনুস-১০৮)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে 'হক' শব্দ ব্যবহার করে বান্দার প্রতি আল্লাহর হক, আল্লাহর প্রতি বান্দার হক, মানুষের পরস্পরের হক, নিজের হক, মানুষ পৃথিবীতে যে পরিবেশে বাস করে তার হক, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার হক, অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি মানুষের হক এবং মানুষের প্রতি অন্যান্য সৃষ্টির হক ইত্যাদি বিষয় বুঝিয়েছেন। মানুষের জন্য নির্ধারিত নির্ভুল জীবন বিধান বা হেদায়াতকেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'হক' শব্দের মাধ্যমেই উপস্থাপন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ–

তিনি আল্লাহই, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। (সূরা তওবা-৩৩)

এই 'হক'–এর বিপরীত যা কিছু রয়েছে তাকে আল্লাহ তা'য়ালা বাতিল বলে ঘোষণা করে বলেছেন, একমাত্র 'হক'–ই টিকে থাকবে আর না-হক তথা বাতিল বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا–

সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই কথা। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৮১)

'হক' কল্যাণকর এবং তা পৃথিবীতে টিকে থাকে আর যা কিছু না-হক, তা পানির বুদ্বুদের মতো, পানির ফেনার মতো যা বিলীন হয়ে যায়। কোরআনে বলা হয়েছে–

وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الاَرْضِ–

যা ফেনা তা উড়ে যায় আর যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর (হক) তা যমীনে স্থিতিশীল হয়। (সূরা রা'দ-১৭)

'হক'–এর ওপরে আবরণ দিয়ে তা বেশী দিনে গোপন রাখা যায় না। 'হক'–কে দমিত করা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা 'হক'-কে 'হক' হিসাবেই উদ্ভাসিত করে তোলেন। কোরআন ঘোষণা করছে–

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِه وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ–

আল্লাহ তাঁর ফরমান দ্বারা 'হক'-কে 'হক' হিসাবেই দেখিয়ে থাকেন, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতোই দুঃসহ হোক না কেনো। (সূরা ইউনুস-৮২)

www.pathagar.com

সূরা আসরে মানব জীবন সফল করার লক্ষ্যে যে চারটি গুণ অর্জনের কথা বলা হয়েছে, তার প্রথম দুটো গুণ অর্থাৎ ঈমান ও আমলে সালেহ্ ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্জন করা গেলেও তা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন পরবর্তী দুটো গুণের শক্তিশালী অস্তিত্ব। আর পরবর্তী দুটো গুণ অর্জন করা যেতে পারে বা বিকশিত হতে পারে কেবলমাত্র সামাজিকভাবে, দলীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।

প্রথম দুটো গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলনে ঈমানদারদের তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা জীবন পরিচালিত করে তাদের একটি সমাজ বা দল অথবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি বা নাগরিককে অতিমাত্রায় সচেতন এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। যেন সেই সমাজ, সেই দল বা রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধরনের বিপর্যয় দেখা না দেয়। আমলে সালেহ্-এর বর্ম দ্বারা আবৃত তথা সৎকাজের দেয়ালে ঘেরা রাষ্ট্রের, দলের বা সমাজের গায়ে শয়তান ছিদ্র করে সেই ছিদ্র পথে প্রবেশ করে তার ভেতরে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং দুষ্কৃতি করতে না পারে। এ জন্য ঈমানদারদের সমাজের, দলের ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্য সচেতন থেকে একে অপরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য বা হক অবতীর্ণ করেছেন, তার ওপরে সুদৃঢ় থাকার ব্যাপারে উপদেশ দেবে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পথে যেসব বিপদ, মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আসবে, পরম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করার জন্য ধৈর্য ধারণ করার নসীহত করবে।

সৎ পথের ওপরে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহিত করা বা পরস্পরের ভেতরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার কর্তব্য একাকী অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে পালন করা যায় না। মহান আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি কোরআনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে দায়িত্বও একাকী পালন করা যায় না।

সেই সাথে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে যে বাধা-বিপত্তি ও বিপদ মুসিবত আসে সে অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। ধৈর্য ধারণের এই অনুশীলনও একাকী করা যায় না। একক কোন ব্যক্তির ওপরে কোন বিপদ এলে সে ব্যক্তি অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আর বিপদ যদি সবার ওপরে আসে তাহলে একে অপরকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিয়ে সে বিপদের মোকাবেলা সবাই একত্রিত হয়ে করতে পারে। সুতরাং হক-এর ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দেয়া এবং ধৈর্য ধারনের অনুশীলন করা একাকী হয় না। এর জন্য প্রয়োজন একটি সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের। এ জন্য প্রথম দুটো গুণের প্রাথমিক দাবীই হলো, এই গুণে গুণান্বিত লোকগুলো একত্রিত হয়ে একটি সমাজ বা দল গঠন করবে, যেন মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য পরবর্তী দুটো গুণও অর্জন করা যায়।

www.pathagar.com

ঈমানদারদের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেরাই আল্লাহ্‌র বিধান অনুসরণ করে চলবে না, এই বিধান অন্যান্য লোক যেন অনুসরণ করে, সে লক্ষ্যে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। অন্য লোকদেরকে আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবে।

এভাবে তারা প্রত্যেকটি লোককে ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীকে পরিণত করবে। ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে আন্দোলন গড়ে তোলে সেই আন্দোলনের মাধ্যমে সূরা আসরের শেষে বর্ণিত দুটো গুণের অনুশীলন করবে, সেই অনুশীলনীই হলো ঐ সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি। সমাজ, দল ও রাষ্ট্রকে যে কোন ধরনের দুষ্টক্ষত থেকে মুক্ত রাখবে ঐ জীবনী শক্তি তথা পরস্পরকে হকের ওপরে টিকে থাকার উৎসাহ ও উপদেশ এবং ধৈর্য ধারণের অনুপ্রেরণা।

মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রথম গুণ হলো ঈমান, দ্বিতীয় গুণ আমলে সালেহ্ এবং তৃতীয় গুণ হলো হকের ওপরে টিকে থাকার জন্য পরস্পরের প্রতি উৎসাহ দান করা এবং উপদেশ দেয়া তথা মহান আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করা।

দ্বীনে হক–এর প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তারাই কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনে হক সহকারে আগমন করেছিলেন এবং যা গ্রহণ করে তারা মুসলিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই দ্বীনে হক-এর প্রতি গোটা পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানাবে। 'ঈমান এনেছি, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত আদায় করছি, তসবীহ্ পাঠ করছি, কোরআন তিলাওয়াত করছি তথা মহান আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মেনে নিয়েছি' এইটুকুর মধ্যেই মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য তৃতীয় যে গুণটি অর্জন করতে হবে, তা হলো মানুষকে মহাসত্যের দিকে তথা 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে।

যে মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করা হচ্ছে, তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আল্লাহ্‌র দেয়া যে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা মুসলমানদের কাছে রয়েছে, তা নিজেরা যেমন অনুসরণ করবে এবং গোটা মানবমন্ডলীকে সেই মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। যে সত্য তথা 'হক' গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রতি ঈমান আনা হয়েছে সেই

www.pathagar.com

'হক'-এর সাক্ষী হিসাবে গোটা পৃথিবীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ মহাসত্যের সাক্ষী হিসাবে সারা পৃথিবীর মানবমন্ডলীর সামনে নিজেকে পেশ করতে হবে এবং এটাই হলো ঈমানদার আমলে সালেহ্কারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই দায়িত্ব পালনের জন্যই মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্বাচিত করেছেন। মুসলিম মিল্লাতের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে 'মধ্যমপন্থী দল' হিসাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا–

আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী দল বানিয়েছি যেন তোমরা পৃথিবীর লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। (সূরা বাকারা-১৪৩)

বিশ্ব ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ্র আবির্ভাবের কারণই হলো এটা যে, তারা পৃথিবীর মানুষকে মহাসত্যের দিকে তথা দ্বীনে হক-এর দিকে আহ্বান-জানাবে। এই দায়িত্ব ইতোপূর্বে অর্পণ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলীদের প্রতি। কারণ তাদের কাছে 'হক তথা মহাসত্যের জ্ঞান' বর্তমান ছিল এবং এ জন্য তাদেরকে গোটা পৃথিবীর জাতিসমূহের নেতার আসনে আসীন করা হয়েছিলো। তারা গোটা পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে, মহাসত্যের প্রতি ডাকবে, মানুষ হিসাবে পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে, এটাই ছিল উদ্দেশ্যে এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জাতিসমূহের নেতার মর্যাদায় তাদেরকে অভিষিক্ত করা হয়েছিলো।

কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে, শুধু তাই নয়, পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব যারা পালন করতে অগ্রসর হয়েছে, তাদের প্রতি বনী ইসরাঈলী জাতি তথা ইয়াহুদীরা নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। যে 'হক' তাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছিলো এবং তার দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর আদেশ দেয়া হয়েছিলো, সেই 'হক'-কে তারা যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি। বরং সেই 'হক'-কে তারা বিকৃত করেছিলো। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 'হক' তথা আল্লাহর বিধানে তারা নিজেদের মর্জি মতো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলো। এই বিকৃতির হাত থেকে তাদেরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মধ্যে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সেই নবী-রাসূল যখন তাদেরকে তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তৎপর হয়েছেন, তখন ঐ জালিমরা আল্লাহর নবী-রাসূলদেরকে একের পর এক হত্যা করেছে।

www.pathagar.com

ফলে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করলেন এবং তাদের ওপরে কিয়ামত পর্যন্ত গযব চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহর কোরআন বলছে–

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِايٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ–

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, অপমান, লাঞ্ছনা, অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের ওপর চেপে বসলো এবং তারা আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হলো। এই ধরনের পরিণতির কারণ এই ছিলো যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করেছিলো এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছিলো আর এটাই ছিলো তাদের নাফরমানী এবং শরীয়াতের সীমালংঘন করার পরিণতি। (সূরা বাকারা-৬১)

এই বনী ইসরাঈলী তথা ইয়াহুদী জাতিকে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব দিয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছিলেন। তারপর তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের দরুন তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করলেন যে, তাদের জন্য যে মসজিদুল আক্সাকে কিবলা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিলো তা বাতিল করে মক্কার মসদিুল হারাম-কে কিবলা হিসাবে মনোনীত করে দিলেন। আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন হারানোর পরে তারা পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই অপমানিত আর লাঞ্ছিত হয়েছে এবং বর্তমানেও তারা নিজের যোগ্যতা ও স্বাধীন শক্তিতে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না, পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর ছত্রছায়া ব্যতীত মুখ খুলে একটি কথা বলার মতো শক্তিও তাদের নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِايٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ۔

www.pathagar.com

এরা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই এদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে অথবা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় লাভ করতে পারলে তা ভিন্ন কথা। আল্লাহর গযব এদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে, এদের ওপর অভাব, দারিদ্র ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এসব কিছু শুধু এই জন্য হয়েছে যে, এরা আল্লাহর আয়াত অমান্য করছিলো এবং তারা নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বস্তুত এটা তাদের নাফরমানী ও সীমালংঘনের পরিণতি মাত্র। (সূরা ইমরান-১১২)

(ইয়াহুদীরা কিভাবে টিকে আছে এবং থাকবে, প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে তারা মার খেয়েছে, কোথা থেকে কিভাবে বিতাড়িত হয়েছে, এর বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'অভিশপ্তদের পথ নয়' শিরোণাম থেকে 'অভিশপ্ত ইহুদীদের নৃশংসতা ও আল্লাহর গযব' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

ইয়াহুদীদের দুষ্কৃতির কারণে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করে মুসলমানদেরকে সেই আসনে অভিষিক্ত করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا–

আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা পৃথিবীর লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। (সূরা বাকারা-১৪৩)

এই আয়াতে 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো, 'মধ্যপন্থী উম্মত'। কোরআনে ব্যবহৃত 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দটির অর্থ এতটাই ব্যাপক অর্থবোধক যে, পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, যে ভাষার মাধ্যমে এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য এবং ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন, একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই এই উম্মতে ওয়াসাতা শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীর শুরু থেকে তাঁদের অনুরূপ সর্বোন্নত গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো মানব গোষ্ঠী ইতোপূর্বে তৈরী হয়েছিল, না কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় তৈরী হবে। অর্থাৎ এমন একটি মানব গোষ্ঠী, যারা সর্বোন্নত যাবতীয় গুণ

www.pathagar.com

বিভূষিত। সুবিচার, সততা, ন্যায়-নীতি এবং যাবতীয় বিষয়ে যারা মধ্যমপন্থা অনুসরণে অভ্যস্থ। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর শাসনামলে হযরত ওমর (রাঃ)কে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন। দীর্ঘ একটি বছর এই পদে কর্মহীন অলস সময় অতিবাহিত করার পর হযরত ওমর (রাঃ) এসে খলীফাতুর রাসূলকে জানালেন, 'হে খলীফাতুর রাসূল! এমন এক দায়িত্ব আপনি আমার প্রতি অর্পণ করেছেন যে, আমাকে কর্মহীন সময় অতিবাহিত করতে হয়। দীর্ঘ একটি বছর অতিক্রান্ত হলো, আজ পর্যন্ত একটি মামলা মোকদ্দমার ফায়সালা করার সুযোগ এলো না।'

অর্থাৎ একটি বছরের মধ্যেও রাষ্ট্রের জনগণের পক্ষ থেকে কেউ একজনও আদালতের দারস্থ হয়নি। জনগণ এতটাই শান্তি-স্বস্তি, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার মধ্যে বসবাস করছে যে, কেউ কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না, কারো প্রতি কেউ কটুবাক্য ছুড়ে দেয় না। স্বার্থের কারণে কারো সাথে দ্বন্দ্বও হয় না। ফলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণেরও প্রয়োজন হয়নি। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে জানতে চাইলেন, 'জনগণের পক্ষ থেকে কেনো একটি মোকদ্দমাও আদালতে পেশ করা হয়নি, এর পেছনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে বললেন, 'মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে দেশের জনগণ এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রশংসনীয় যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে যে, এরা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। ফলে তাদের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না।'

একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে একজন মানুষও এক বছরের মধ্যে আদালতে কারো বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি, তাহলে সেই জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুণগুলো কিভাবে নিজেদের চরিত্রে বাস্তবায়িত করেছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে পারে। তাঁরাই ছিলেন গোটা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের পথপ্রদর্শক, উন্নতি-অগ্রগতির পরিচালক ও অগ্রনায়ক, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মানবাধিকার, ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও ইনসাফ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির পথনির্দেশনা দানকারী। অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার যাদের জীবন-অভিধান থেকে মুছে গিয়েছিলো। অন্যায় বা জুলুমমূলক সম্পর্ক তাদের কারো সাথে ছিল না বরং সেস্থান দল করেছিল ন্যায় ও ইনসাফ। গোটা জগতের সামনে যারা ছিল সর্বব্যাপক ও সার্বিক দিক দিয়ে কল্যাণ, শুভ ও সুন্দরের প্রতীক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য বা দ্বীনে হক অবতীর্ণ করেছেন, সেই মহাসত্যের মূর্ত প্রতীক

www.pathagar.com

ছিলেন তাঁরা এবং সেভাবেই তাঁরা সত্যের সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ভেতরে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো, সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানবমন্ডলীকেই 'উম্মতে ওয়াসাতা' হিসাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকদেরকে বলেন, তোমরাই উম্মতে ওয়াসাতা–মধ্যপন্থী উম্মত। আমি রাসূলকে যা কিছু শিখিয়ে ছিলাম, তিনি তা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। রাসূলের এই শিক্ষা তোমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে এবং পৃথিবীর মানুষকে এই শিক্ষার দিকে তথা 'হক'–এর দিকে আহ্বান জানাবে। রাসূলের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন তাঁর অনুসারী দল সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়ে অর্পণ করা হয়েছিলো, তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। রাসূলের অনুসারী দলকেও কিয়ামতের দিন এ কথার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রাসূল তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, সেই দায়িত্বও তারা যথাযথভাবে পালন করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে সত্য পৌঁছানো হয়েছে কিনা, তথা 'হক'–এর দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে কিনা, এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে হবে। এই জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও। (সূরা নিসা-১৩৫)

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সামনে মুসলমানদেরকে মহাসত্যের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তথা দ্বীনে হক-এর সাক্ষী হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক মুসলমানকে দেখে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সম্পর্কে যেন এ কথা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহর বিধান সুন্দর ও কল্যাণকর এবং এর কোনো বিকল্প নেই। যাবতীয় দুষ্কৃতিতে আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত হওয়া ও মহাসত্যের প্রতি বিদ্রোহ করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে ইয়াহুদীদেরকে পদচ্যুত করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গঠিত ঈমানদার ও আমলে সালেহ্কারী জনগোষ্ঠী-মুসলমানদেরকে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে অভিষিক্ত করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের সাক্ষ্যদানের পদে নিযুক্ত করেছেন। এরাই মানব জাতির নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

এই পদে আসীন হওয়া একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান-মর্যাদা ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক, এই পদ মানুষকে সম্মান-মর্যাদা ও জীবনের সার্বিক সফলতা এনে দেয়। যদি এই পদের যথাযথ ব্যবহার করা যায়। অপরদিকে এই পদের যে দায়িত্ব, এই পৃথিবীর অন্য সকল দায়িত্বের মধ্যে সবথেকে কঠিন ও গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলার পরিচয় দিলে গোটা পৃথিবী জুড়ে যেমন ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে এবং এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত মুসলিম মিল্লাতের ওপরে। কিয়ামতের ময়দানেও মহান আল্লাহর আদালতে কঠিন জবাব দিতে হবে। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য দায়িত্বের ব্যাপারে কোনো ধরনের অযোগ্যতার পরিচয় দিলে তা তেমন ক্ষতি বয়ে আনবে না, কিন্তু এই দায়িত্ব এমনই এক কঠিন দায়িত্ব যে, বিন্দু পরিমাণ অবহেলার পরিচয় দিলে মানবতাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সেই সাথে গোটা সৃষ্টিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই দায়িত্ব পালন করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আল্লাহভীতি, ন্যায়-পরায়ণতা, সততা, সত্যপ্রিয়তা, আদল-ইনসাফ, সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠার দিক দিয়ে গোটা মানবমন্ডলীর জন্য জীবন্ত আদর্শ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন, অনুরূপভাবে সমস্ত মুসলিম মিল্লাতকেও সারা দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত জাতির কাছে নিজেদের কথাবার্তা, আচার আচরণ, ব্যবহার ও অন্যান্য যাবতীয় কিছুর মাধ্যমে জীবন্ত আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই মুসলিম মিল্লাতের চলাফেরা, আচার-আচরণ, ব্যবসার ধরন, কথাবার্তা, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি দেখে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ যেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার অর্থ, সততার প্রকৃত অর্থ, সত্যবাদিতা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রকৃত তাৎপর্য কি তা যেন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

এই দায়িত্ব অর্পণ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবী-রাসূলকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনো একজনও যদি এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করতেন, তাহলে তাঁকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হতো। নবী-রাসূলদের অবর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই এই কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি। গোটা দুনিয়াবাসীর সামনে তাদেরকে নিজেদের জীবন চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের কল্যাণকারিতা তুলে ধরতে হবে। মানুষের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর বিধানই পৃথিবীর মানবতার কল্যাণের একমাত্র উপযোগী বিধান, আর অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান কল্যাণের উপযোগী নয়।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর মনোনীত যে বিধান তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা আল্লাহ্ তা'য়ালার সাধারণ বান্দাদের কাছে পৌঁছাতে আমরা যদি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করি, কিয়ামতের দিন যদি আমরা আল্লাহর দরবারে এ কথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হই যে, আমাদের ওপরে যে দায়িত্ব ছিল, তা আমরা যথাযথভাবে পালন করিনি। তাহলে অবশ্যই আমরা অপরাধির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হবো। পৃথিবীতে যাবতীয় ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের কারণে আমাদেরকেই দায়ী করা হবে। পৃথিরীতে যে সম্মান-মর্যাদার নেতৃত্বের আসন আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, এই আসনই আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে অগ্রসর করাবে।

এই পৃথিবীতে মুসলমানদের কাছে কোরআন রয়েছে, রাসূলের সুন্নাহ্ রয়েছে-রয়েছে সাহাবা কেরামের গোটা জীবন চরিত। এগুলো বাস্তবে প্রয়োগ অনুসরণ না করার কারণে পৃথিবীতে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যত প্রকার ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেবে, গোমরাহী, অসততা, পথভ্রষ্টতা, অবিচার, অন্যায়, অত্যাচার তথা মানব কল্যাণের বিরোধী ও মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর যতো কিছু দেখা দেবে, তার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য ভ্রষ্ট চিন্তা-নায়ক, নেতা, বুদ্ধিজীবী, ইবলিস শয়তান, মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানদের সাথে সাথে আমাদেরকেও অভিযুক্ত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য করা হবে।

সুতরাং 'হক'–এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নিজেরা পরস্পরকে মহান আল্লাহর 'হক'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং সেই সাথে পরস্পরের 'হক' তথা বান্দার 'হক'-এর কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বিষয়টি শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেই দায়িত্ব পালন করা হবে না, সাহাবা কেরাম যেমন তা বাস্তবে অনুশীলন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তা বাস্তবে অনুসরণ করে দেখাতে হবে। নতুবা কিয়ামতের দিন আসামীর কাঠগড়ায় যেমন দাঁড়াতে হবে, তেমনি ব্যর্থ লোকদের কাতারে গিয়ে মহাক্ষতি বরণ করতে হবে।

দ্বীনে হক-এর বাস্তব সুফল

মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে শুধু মক্কারই নয়, গোটা পৃথিবীর মানব সভ্যতা ধ্বংস গহ্বরের প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে আরবদের কাছে যুদ্ধ ছিল তাদের আয় রোজগারের সর্বোত্তম মাধ্যম তথা মহৎ পেশা। যুদ্ধহীন জীবন তাদের কাছে ছিল এক অকল্পনীয় বিষয়। এর কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক এবং গবেষকবৃন্দ বলেছেন,

www.pathagar.com

তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহের উপায়-উপকরণের দৈন্যতা, অর্থ-সম্পদ উপার্জন ক্ষেত্রের স্বল্পতা এবং সর্বোপরি তাদের সমাজে ঐক্য, সামাজিক আইন কানুন প্রতিষ্ঠিত না থাকা।

এ ধরণের নানাবিধ কারণে তাদের রক্তের শিরায় শিরায় যুদ্ধ যেন মিশে ছিল। কারণে বা অকারণে যুদ্ধ, রক্তপাত, নরহত্যা এবং লুঠতরাজ করা তাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হত। ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, চারণভূমিতে পশু চরানোর দখলদারী এবং নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রথমে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। এই ধরনের যুদ্ধ তাদের ভেতরে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত ফলে তাঁরা যুদ্ধে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কারণে অকারণে যুদ্ধে জড়িত থাকার ফলে তাঁরা নররক্ত দর্শনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের চরিত্রে কল্পনাতীত পাশবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল।

অর্থপ্রাপ্তির আকাংখা এবং লোভই তাদেরকে যুদ্ধোন্মাদ ও জঙ্গী করে তুলতো। আরবের কোন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে হাতে অস্ত্র ধারণ করতো, তখন তার মনের কোণে যে আকাংখা জাগ্রত থাকতো তাহলো, সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ, দাস-দাসী ইত্যাদী হস্তগত করবে। কেননা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিল তাদের কাছে বড় পবিত্র সম্পদ। যুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাকর পেশা। ব্যবসা বা নিজের দেহের শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাদের কাছে অপমানজনক।

শত্রু ভাবাপন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠী রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রীসহ পশুসম্পদ ও নারী-পুরুষদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। মানুষগুলোকে তারা দাস-দাসী হিসাবে ব্যবহার করতো বা বিক্রি করে দিত।

আরো একটা কারণে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো, তাহলো নিজেদের সাহসিকতা এবং বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। একে অপরের আভিজাত্য প্রদর্শন এবং তা নিয়ে গর্ব করা এবং পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজেকে একজন সাহসী বীর হিসাবে সবার কাছে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাদের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় আকাংখা। তাকে সবাই সাহসী যোদ্ধা বলুক, বিখ্যাত বীর বলুক এটা ছিল তাদের মনের ঐকান্তিক কামনা।

এ উদ্দেশ্যে তাঁরা যে কোন ধরনের পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতো। তাকে বীর এবং সাহসী হিসাবে সবাই জেনে যেন তার পশুচারণ ভূমিতে অন্য কেউ পশু চরাতে যেন সাহস না পায়, তার বাসস্থানের পাশে যেন কেউ বাস করতে সাহস

www.pathagar.com

না পায়, তার কূপ থেকে যেন কেউ পানি নিতে সাহস না পায়, তার তুলনায় অন্য কেউ যেন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে না করে, তার মত রং এবং ধরনের পোষাক যেন কেউ পরিধান না করে, সে যাকে খুশী হত্যা করবে, কেউ যেন প্রতিবাদের সাহস না পায়, সে যে কোনো নারীকে ভোগ করবে কেউ যেন বাধা দিতে সাহস না পায়, তার ওপর কেউ যেন মাথা উঁচু করে উচ্চ কণ্ঠে কথা না বলে, সবাই যেন তাকেই নেতা হিসাবে মান্য করে, তাকে সবাই যেন সেবা-যত্ন করে এ ধরনের কামনা-বাসনা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেও তারা যুদ্ধ করতো।

মনের এ ধরনের কামনা-বাসনা ব্যক্ত করে তারা অজস্র কাব্য রচনা করেছে। আজো সেসব কাব্য ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান। বর্তমান পৃথিবীতে পরাশক্তিগুলো যেমনভাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার অশুভ লক্ষ্যে, প্রয়োজনে রক্তের খেলায় মেতে ওঠে, সে যুগেও তেমনইভাবে একজন ব্যক্তি তার প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে তরবারী ধারণ করতো।

'আইয়ামূল আরাব' অর্থাৎ আরবের লোকগাঁথা পাঠ করলে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে যতগুলো ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং দশকের পরে দশক জীবিত থেকেছে তা সবই ছিল তাদের অহঙ্কার ও আভিজাত্য প্রদর্শনের কারণে। 'হারবে বাসুস' বা বাসুস যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শুধুমাত্র নিজের অহঙ্কার এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখার হীন উদ্দেশ্যে। বনী তাগলাব এবং বনী বকর গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ব্যাপী এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল।

বনী তাগলাবের গোত্রপতি ছিল কুলাইব ইবনে রাবিয়া। তার নীতি ছিল তার কূপ থেকে কেউ পানি নিতে পারবে না এবং অন্য কারো পশুকে সে পানি পান করতে দিত না। সে যেখানে শিকার করতো, সেখানে অন্য কাউকে শিকার করতে দিত না। সে যে চারণভূমিতে পশু চরাতো, সেখানে অন্য কারো পশু চরাতে দিত না। সে যেখানে অগ্নি প্রজ্জলিত করতো সেখানে আর কাউকে আগুন জ্বালাতে দিত না। একবার বনী বকরের গোত্রে এক অতিথির আগমন ঘটলো। সে অতিথির উট চরতে চরতে তাগলাব গোত্রের গোত্রপতি কুলাইবের চারণভুমিতে গিয়ে তার উটের সাথে চরতে থাকে। কুলাইব তা দেখে রাগে হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হয়ে তীর ছুড়ে উটের স্তনে বিদ্ধ করলো। বনী বকরের সে অতিথি তার উটের এই দুর্দশা দেখে চিৎকার করে বললো, 'আহ্হা, কি আফসোস ! এ কি অসম্মান !' বনী বকর গোত্রের প্রতিটি লোকের রক্ত যেন প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। তাদের অতিথির এই অপমান কিছুতেই তারা সহ্য করলো না।

www.pathagar.com

এই গোত্রের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনও ছিল। বনী বকর গোত্রের জাসসাস ইবনে মুররা তার বোনকে বিয়ে দিয়েছিল বনী তাগলাব গোত্রের গোত্রপতি কুলাইবের সাথে। এই জাসসাস স্বয়ং গিয়ে তার বোনের স্বামী কুলাইবকে হত্যা করলো। কুলাইবের ভাই মুহালহিল তার ভাই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার ঘোষনা দিল। মুহালহিল কেনো বনী বকর গোত্রের জাসসাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষনা দিল, অহঙ্কারে লাগলো বনী বকর গোত্রের। শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ ৪০ বছর। এই দুই গোত্র প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সে যুগে আরবদের ধারণা ছিল, কেউ নিহত হলে তার আত্মা পাহাড়-পর্বতে পাখি হয়ে উড়ে বেড়ায়। সে পাখির নাম তারা বলতো হামা পাখি বা সাদা পাখি। নিহত ব্যক্তির আত্মা পাখি হয়ে উড়তো আর বলতো,'পান করাও আমাকে পান করাও!' আবার কেউ ধারণা করতো, কেউ নিহত হলে যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় তাহলে সে নিহত ব্যক্তি কবরে জীবিত থাকে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে কবরে সে মৃত অবস্থায় থাকে। কারো বিশ্বাস ছিল, নিহত ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে কবরে সে অন্ধকারের ভেতরে অবস্থান করে। প্রতিশোধ গ্রহণ করলে তার কবর আলোকিত হয়। এ সমস্ত কুসংস্কারের কারণে তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতো। ফলে যুদ্ধে বা অন্য কোন কারণে যারা নিহত হত, তাদের গোত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোনো ফয়সালায় না এসে যুদ্ধের পথই অবলম্বন করতো। নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে কেউ যদি বিলম্ব করতো বা কোন অর্থ সম্পদের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিত, তাহলে তা ছিল তাদের কাছে লজ্জার বিষয়। এ সব ছিল তাদের কাছে নীচুতা এবং মর্যাদাহানীকর ব্যাপার। সুতরাং কোন প্রকার আপোষে না এসে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

আরবের কবিগণ তাদের কবিতায় নিজ নিজ গোত্রকে কোন অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা যেন করা না হয়, এ ধরনের কবিতা রচনা করে তাদেরকে উস্কানী দিত। তারা নিহত ব্যক্তির মাথার খুলিতে মদ পান করতো। আরবদের বিশ্বাস ছিল কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত না হয়ে অন্য কোন কারণে শয্যায় শুয়ে মারা গেলে তার আত্মা নাক দিয়ে বের হয়। আর নাক দিয়ে আত্মা বের হওয়া ছিল তাদের কাছে চরম অপমানজনক বিষয়। আর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর হাতে নিহত হলে তার আত্মা বের হয় আঘাতপ্রাপ্ত সেই ক্ষতস্থান দিয়ে। এটা ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু। এ কারণে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে মারা যাওয়াকে তারা বলতো, 'অমুক নাক নিয়ে মরেছে'। আর যুদ্ধের ময়দানে কেউ নিহত হলে তারা বলতো, 'সে নাক নিয়ে মরেনি'। নাক নিয়ে মরা অর্থাৎ যুদ্ধে নিহত না হয়ে অন্যভাবে মরা

www.pathagar.com

ছিল লজ্জার বিষয়। এ জন্য তাদের কবিগণ গর্ব করে বলেছে, 'আমাদের গোত্রের কোন নেতা নাক নিয়ে মরেনি।' অর্থাৎ তাদের গোত্রের কোন নেতা শয্যায় শুয়ে রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেনি।

ইয়াওমে মাসহালান যুদ্ধ, তাহ্‌লাকুল লামাম যুদ্ধ, দাহেস যুদ্ধসহ এ ধরনের নানা যুদ্ধ তাদের ভেতরে কোনো যুক্তি সংগত কারণে সংঘটিত হয়নি। সামান্য ঘোড় দৌড় নিয়ে–কার ঘোড়া আগে দৌড়ালো আর কার ঘোড়া পরে দৌড়ালো এই নিয়ে দাহেস যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রায় ৫০ বছর ধরে এই অহঙ্কার প্রদর্শনীর যুদ্ধ চললো। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের ভেতরে শুধুমাত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও হিংসার কারণে প্রায় ১০০ বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। যথা সময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা না হলে উভয় গোত্রই ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল বদর ইবনে পাশা। উকাজের মেলায় এই লোক একস্থানে উপবেশন করে সামনের দিকে তার পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে কোন কারণ ছাড়াই অহঙ্কার প্রদর্শনের লক্ষ্যে ঘোষনা করলো, 'গোটা আরবের ভেতরে আমিই হলাম সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমার চেয়ে কেউ যদি নিজেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করে তাহলে তার সাহস থাকলে যেন আমার পায়ে তরবারীর আঘাত হানে।' লোকটির এ অর্থহীন ঘোষনা অনেকের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। বনী দাহমান গোত্রের একজন যুবকের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। সে এসে বদর ইবনে পাশার পায়ে তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। আর যায় কোথা, শুরু হয়ে গেল কুখ্যাত ফুজ্জার যুদ্ধ। কিনানা গোত্র এবং হাওয়াজেন গোত্রের ভেতরে এমন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যে, উভয় পক্ষের মিত্র গোত্রগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। এই দুই গোত্রের মধ্যে আর আপোষই হলো না।

শেষ ফুজ্জার যুদ্ধও ছিল প্রতিহিংসা আর অহঙ্কারের অনিবার্য পরিণতি। চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিকদের মতে আরবের শেষ ফুজ্জার যুদ্ধের মত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়নি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনের ছাব্বিশ বছর পূর্বে হিরার রাজা নোমান ইবনে মুনজের আরবের উকাজ নামক স্থানে যে বিখ্যাত মেলা অনুষ্ঠিত হতো, একটা বাণিজ্য বহর সে মেলায় প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন তিনি আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার বাণিজ্য বহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে?' তার প্রশ্নের জবাবে কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে আপনার বাণিজ্য বহরের যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।' অপর দিকে হাওয়াজেন গোত্রের নেতা উরওয়াতুর রাহহাল অহঙ্কার প্রদর্শন করে বললো, 'আমি আপনাকে সমস্ত আরবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলাম।'

হাওয়াজেন গোত্রের এই নেতার কথা কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশের শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। হাওয়াজেন গোত্রের নেতা হিরার রাজার বাণিজ্য বহর নিয়ে যখন যাত্রা করলো, তখন কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ হাওয়াজেন গোত্রের উরওয়াতুর রাহ্হালকে পথিমধ্যে তায়মান নামক এলাকায় হত্যা করলো। পরিণতিতে যা হবার তাই হলো। এই দুই গোত্রের পুরোনো শত্রুতায় ঐ হত্যাকান্ডের ঘটনা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। উভয় গোত্রে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হলো। কুরাইশ গোত্র কানানা গোত্রের সাহায্যে এগিয়ে গেল আর বনী সাকিফ গোত্র এগিয়ে গেল হাওয়াজেন গোত্রের পক্ষে। ইয়াওমে শামতাত, ইয়াওমে শারব ও ইয়াওমুল হারিবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। প্রায় চার বছরের অধিক কাল এই যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিভৎসতা এতই প্রকট ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবের অতীতের সমস্ত যুদ্ধের নৃশংসতাকে এই যুদ্ধ ম্লান করে দিয়েছিল।

কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ তায়মান নামক এলাকায় যখন হাওয়াজেন গোত্রের উরওয়াতুর রাহ্হালকে হত্যা করে, সে সময় কুরাইশরা উকাজের মেলায় ছিল। তাদের কাছে এ সংবাদ পৌছা মাত্র তারা মক্কার কা'বাঘরের দিকে চলে আসছিলো। কিন্তু তারা কা'বার এলাকায় প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াজেন গোত্র তাদের পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে ধরে ফেললো। ফলে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ, গোটা দিন যুদ্ধ চলার পরে রাতে কুরাইশরা কা'বা এলাকায় প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। ফলে হাওয়াজেন গোত্র যুদ্ধে বিরতি দেয়। কিন্তু তারপর দিন থেকে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফিজারের এই শেষ যুদ্ধ ছিল ফিজার আল বারাদ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পূর্বে আরো তিনবার ফিজার যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধ প্রথম হয়েছিল কেনানা এবং হাওয়াজেন গোত্রের মধ্যে। দ্বিতীয়বার হয়েছিল কুরাইশ এবং হাওয়াজেনের মধ্যে। তৃতীয় বার হয়েছিল হাওয়াজেন এবং কেনানা গোত্রের মধ্যে। সর্ব শেষ ফিজার যুদ্ধে কুরাইশ এবং কেনানার যৌথ বাহিনীর সিপাহ্সালার ছিলেন কুরাইশ গোত্রের হারব ইবনে উমাইয়া। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের পিতা এবং হযরত মুয়াবিয়ার দাদা।

আরব ভূখন্ডে 'হক'-এর কার্যক্রম শুরু হবার পূর্বে এটাই ছিল সেখানের মানুষের বাস্তব অবস্থা এবং নানাবিধ জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে তারা নিশ্চিত ধ্বংস ও সর্বগ্রাসী অনলে ভষ্ম হয়ে যাচ্ছিলো। এই অবস্থা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছিলো মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দ্বীনে হক। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবা কেরাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় উপনীত হয়ে যে দ্বীনে হক-এর ভিত্তিতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ফলে দ্বীনে হক-এর জীবন্ত ও বাস্তব সুন্দর রূপ-সৌন্দর্য অবলোকন করেছিলো আরব জাহানসহ গোটা পৃথিবীর মানুষ। যুগ-যুগ ধরে যুদ্ধ ও

www.pathagar.com

নানা ধরনের অত্যাচারে জর্জরিত পরস্পর বিরোধী আওস এবং খাজরাজ গোত্রদ্বয় ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে পরস্পর একই মোহনায় মিলিত হয়ে মানবেতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের প্রতি এই গোত্রদ্বয় এমন অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব ত্যাগ ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলো যে, যা আপন ভাইয়ের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয় না। দ্বীনে হক এভাবেই মানুষের ভেতরে বাস্তব সুফল পরিবেশন করেছিলো।

দ্বীনে হক অনুসারে জীবন পরিচালিত করলে এভাবেই মানব জীবন সুন্দর, কল্যাণময় ও সজীব হয়ে ওঠে। দ্বীনে হক-এর আগমন পূর্ব অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا-وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا-كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের মন পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত বা এই নিদর্শনাবলী থেকে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। (সূরা ইমরান-১০৩)

অর্থাৎ তারা এমন ধরনের অন্যায়-অত্যাচারে পরস্পর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, জাতি হিসাবে তারা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যেতো। এই অবস্থাকেই আল্লাহ তা'য়ালা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের প্রান্তে দাঁড়ানোর সাথে তুলনা করে বলেছেন, দ্বীনে হক অবতীর্ণ করে তিনি তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। কিভাবে রক্ষা করলেন, দ্বীনে হক গ্রহণ করার কারণে তাদের পরস্পরের ভেতর থেকে যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ ও অমানবিকতা বিদায় গ্রহণ করলো এবং তারা দ্বীনে হক পরিবেশিত সর্বোত্তম গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গোটা পৃথিবীর নেতৃত্বের

www.pathagar.com

আসনে আসীন হলো। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দেয়া জীবন বিধানের অতুলনীয় সুন্দর রূপ-সৌন্দর্য এভাবেই সমুজ্জল করে তোলেন, এসব দেখে গোটা পৃথিবীর মানুষ যেন আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে সত্য পথ অনুসরণ করতে পারে।

দ্বীনে হক কিভাবে পরস্পরের ভেতর থেকে যাবতীয় তিক্ততা মুছে দিয়ে তাদের মধ্যে প্রেম, প্রীতি-ভালোবাসার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানবেতিহাসে এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। মক্কা থেকে যাঁরা নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন, আল্লাহর রাসূল মক্কার মুসলমান ও মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এভাবে মদীনার মুসলমানরা দ্বীনে হক-এর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অপিরিচিত লোকদেরকে একান্ত আপন করে নিয়ে তাদের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলো। মক্কার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) এর সাথে মদীনার খাযরাজ গোত্রের ধনাঢ্য ব্যক্তি হযরত সা'দ ইবনে রাবী (রাঃ) এর ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছিলো।

তিনি একদিন হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ)কে ডেকে বললেন, 'ভাই, মদীনার সবাই জানে আমি ধনী মানুষ। আমার যাবতীয় ধন-সম্পদ আমি দু'ভাগে ভাগ করছি। একভাগ তুমি গ্রহণ করো। আর আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে তোমার পসন্দ হয়, তাকে আমি তালাক দিচ্ছি। ইদ্দত অতিবাহিত হবার পরে তুমি তাকে বিয়ে করো।' হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) হযরত সা'দের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভাই, তোমার ধন-সম্পদে মহান আল্লাহ্ বরকত দিন। আমার এসবে প্রয়োজন নেই, তুমি শুধু আমাকে মদীনার বাজারের পথটি দেখিয়ে দাও।' মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান তথা দ্বীনে হক এমন মানুষই তৈরী করেছিলো, পৃথিবীর মানবেতিহাসে তাদের অনুরূপ দ্বিতীয় আরেকটি মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই দ্বীনে হক বর্তমানেও এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে, এর বাস্তব প্রয়োগে এখনও সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ তৈরী হতে পারে।

দ্বীনে হক-এর বাস্তবায়নে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। নবী রাসূলদের দাওয়াত যারা কবুল করে ধন্য হয়েছেন, তাঁদেরকে তাঁরা একতাবদ্ধ করে একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদেরকে

একই সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত করেছেন এবং সেই সংগঠিত শক্তিকে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মক্কার জীবনে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন। যেসব মহান ব্যক্তি তাঁর দাওয়াত কবুল করেছেন তিনি তাঁদেরকে একত্রিত করে 'হক'-এর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মক্কায় 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র অনুকূল না হবার কারণে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। সেখানে অনুকূল পরিবেশ লাভ করার ফলে 'হক'-এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকদের নিয়ে মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই গোটা পৃথিবীর মানবমন্ডলীকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানানো এবং 'হক'-এর ভিত্তিতে তাদের জীবনকে রঙিন করা।

এই পথে যারা বাধা দিয়েছে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, সহজ-সরল কথায় যারা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি, তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত শক্তি প্রয়োগ করে পথ থেকে সেই বাধা অপসারিত করে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের পথ নিষ্কন্টক করেছেন। এই কাজ নির্জনে একাকী, শুধুমাত্র মসজিদ, খান্কাহ্ বা মাদ্রাসার চার দেয়ালে নিজেদেরকে বন্দী রেখে করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য একটি সংগঠনের পতাকা তলে হকপন্থীদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হয়। মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতে হবে তথা 'হক'-এর প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে তথা 'না-হক'-এর মূলোৎপাটন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ–وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সাফল্য মন্ডিত হবে। (সূরা ইমরান-১০৪)

অর্থাৎ মানবমন্ডলীর ভেতরে এমন একটি দলের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, যে দল পৃথিবীর মানুষকে যা সুন্দর-শুভ, কল্যাণ-মঙ্গল ও ভালোর দিকে আহ্বান জানাবে। শুধু আহ্বানই জানাবে না, যা কিছু ভালো-সৎকাজ, তা বাস্তবায়ন করার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা কিছু অসুন্দর, অশুভ, অকল্যাণকর ও মন্দ, তা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। আদেশ দেয়া ও আদেশ বাস্তবায়ন করার কাজ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার কাজ অনুরোধ ও উপদেশের মাধ্যমে পৃথিবীতে কখনো হয়নি। ওয়াজ-নসিহত বা তাবিজ-কবজের মাধ্যমেও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে ভালোকাজে রত করানো যায়নি। অথবা ভালোকাজ ও মন্দ কাজের তালিকা সম্বলিত বই-পুস্তক পাঠ করিয়েও মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায়নি।

ক্ষেতে আগাছা জন্ম নেয়ার পরে ক্ষেতের মালিক যদি ক্ষেতের পাশে সুন্দর আসন বিছিয়ে তার ওপর কোনো মাওলানা বা পীর সাহেবকে বসিয়ে আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে সুরেলা কণ্ঠে ওয়াজ-নসিহত করে আগাছা দূর হবে না। অথবা আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে পীর সাহেবের কাছ থেকে কয়েক ড্রাম পানি পড়ে এনে ক্ষেতে ঢেলে দিলেও আগাছা দূর না হয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশের যাবতীয় বাহিনীকে সমবেত করে তাদের অস্ত্রসমূহ আগাছার দিকে তাক্ করে হুমকি প্রদর্শন করলেও আগাছা দূর হবে না। আগাছা দূর করতে হলে শক্ত হাতে আগাছা দূরীকরণের অস্ত্র ধরে ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন সুফল পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সৎকাজসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত উল্লেখিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মহান আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন করা যায় না। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করাতে হবে এবং সেই সংগঠনকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এই কাজটিই সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করে তাঁর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করিয়েছিলেন। পৃথিবীর মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদেরকে যাবতীয় জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে হবে। নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে না পারলে 'হক'-এর দায়িত্ব পালন করা যাবে না। আর এসবের মূলে রয়েছে একতাবদ্ধ হওয়া—নিজেদেরকে সংগঠিত করে একটি সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'হক'-এর তৎপরতা চালাতে হবে। 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই মানব গোষ্ঠীর ভেতর থেকে মুসলমানদেরকে বেছে বের করে

www.pathagar.com

নেয়া হয়েছে-অর্থাৎ এই কাজের জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

পৃথিবীতে সেই সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রেখে চলো। (সূরা ইমরান-১১০)

দ্বীনে হক-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের প্রক্রিয়া

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবমন্ডলীর কল্যাণের লক্ষ্যে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন এবং এই জীবন বিধান অনুসারে যারা পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছেই মহান আল্লাহ্র এই বিধান প্রাণের চেয়েও প্রিয়। হাদীসেও এ কথা বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের কাছে তার নিজের জীবন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের তুলনায় আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর আদর্শ সর্বাধিক প্রিয় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না। এই তাগিদ অনুসারে ঈমানদার লোকগুলো স্বাভাবিকভাবেই ইসলামকে সমস্ত কিছুর ওপরে স্থান দেবে।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, সে যাকে সর্বাধিক ভালোবাসে তার স্বার্থ যে কোনো অবস্থায় উর্ধ্বে তুলে ধরে এবং কথা ও আচরণের মাধ্যমে সেই ভালোবাসা বা আকর্ষণের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। ঈমানদার তার সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের জন্য উজাড় করে দেবে-এটাই ঈমানের দাবি। কোরআনেও ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা মুমিনের ধন-সম্পদ ও প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। সুতরাং ঈমানদার যে আল্লাহ্, রাসূল ও ইসলামকে ভালোবাসে, তা অনুসরণ করে, স্বাভাবিকভাবেই সে ইসলামকে পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরার সাম্ভাব্য যাবতীয় পথ অবলম্বন করবে। অর্থাৎ মহাসত্যের সাক্ষ্য হিসাবে সে নিজেকে উপস্থাপন করবে। মানুষ যেমন তার ভালোবাসার প্রকাশও কথা ও কাজের মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মহাসত্যের পক্ষে তথা দ্বীনের হক-এর পক্ষেও কথা ও কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

www.pathagar.com

পারস্পরিক কথাবার্তায় ঈমানদার ব্যক্তি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরবে। যেখানেই কথা বলার সুযোগ আসবে, সেখানে পরিবেশ ও প্রসঙ্গ অনুধাবন করে মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও তা প্রয়োগের ফলে ব্যবহারিক জীবনে এর কল্যাণসমূহের বর্ণনা অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরবে। লেখার সুযোগ থাকলে সে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনে হক-এর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মতবাদ-মতাদর্শ আবিষ্কৃত হয়েছে, লেখনীর মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ক্ষতিকর দিকসমূহ প্রকাশ করে তার তুলনায় মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে হবে।

বর্তমান যুগে প্রচারের যেসব মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে, এসব মাধ্যমকে মহান আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করতে হবে। পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দ্বীনে হক-এর সাথে পরিচিত করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রিন্টিং মিডিয়া ও ইলোক্ট্রনিক মিডিয়াসহ আধুনিক বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে যতগুলো মাধ্যম আবিষ্কার করেছে, তা কাজে লাগাতে হবে। মানুষের মন-মস্তিষ্কে দ্বীনে হক-এর মর্মবাণী পৌঁছানোর জন্য চিন্তা-গবেষণা করে প্রচার ও প্রসারে নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ইসলামী চিন্তাবিদদের একত্রিত করে মাঝে মধ্যে গোল টেবিল বৈঠক, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কোরআন- হাদীসের তাফসীরের আয়োজন করতে হবে। মহান আল্লাহর বিধানের যাবতীয় দিকসমূহ যুক্তি ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, জীবনের সকল কাজের মধ্যে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে।

অপরদিকে যে আদর্শের দিকে মুসলমানরা মানুষকে আহ্বান জানাবে, সেই আদর্শ বাস্তবে অনুসরণ করে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করে পৃথিবীর মানুষের সামনে এ কথাই প্রমাণ করে দিতে হবে যে, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, সুখ সমৃদ্ধি সর্বপরি কল্যাণ লাভ করতে হলে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে আদর্শ প্রচার করা হবে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেই আদর্শের বাস্তব রূপ দেখতে আগ্রহী হবে। তারা জানতে চাইবে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত তথা দ্বীনে হক-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদের বাস্তব জীবনধারা কেমন। ঈমানের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিচার ব্যবস্থা, সাংবাদিকতা, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, বাণিজ্য নীতি, সম্পদ বন্টন নীতি তথা যাবতীয় নীতিমালা কোন্ ধরনের কল্যাণের স্বাক্ষর

বহন করছে, কোন্ ধরনের সৌন্দর্য-সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে, কোন্ ধরনের আলো বিকশিত করছে তা পৃথিবীর মানুষ জানতে চাইবে এবং তা জানার অধিকার তাদের অবশ্যই রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে লন্ডনের একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনুভব করছি। ইসলামের প্রতি অনুরাগী একজন মুসলমান সেখানের একজন খৃষ্টান নারীকে ইসলাম সম্পর্কে জানার দাওয়াত দিয়ে তাকে কোরআন পড়তে দিয়েছিলো। মাতৃ ভাষায় অনুদিত কোরআন পাঠ করে সেই নারী উক্ত মুসলমান লোকটিকে বলেছিলো, 'এবার সেই কোরআনটি দাও, যা তোমরা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করো।' মুসলমান লোকটি অবাক বিস্ময়ে খৃষ্টান নারীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'আমাদের কোরআন তো একটি, আপনি দ্বিতীয় কোরআনের কথা কেনো বলছেন?' খৃষ্টান নারীটি উপহাস করে জবাব দিয়েছিলো, 'আমাকে যে কোরআন তুমি পড়তে দিয়েছো, সেই কোরআনের নীতিমালার সাথে তোমাদের বাস্তব জীবনধারার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়েই তোমাকে দ্বিতীয় কোরআনের কথা বলেছি।'

সুতরাং যে নীতিমালার দিকে মুসলমান পৃথিবীর অন্যান্য মানুষকে আহ্বান জানাবে, সেই নীতিমালা সর্বপ্রথমে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ، اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ-

তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা কি বুদ্ধিকে কোনো কাজেই প্রয়োগ করো না? (সূরা বাকারা-৪৪)

সুতরাং পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে আহ্বান জানানোর যে দায়িত্ব মুসলমানদের প্রতি অর্পিত হয়েছে, সেই আদর্শ সর্বপ্রথমে নিজেদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বাস্তবায়ন করে এর যাবতীয় কল্যাণ পৃথিবীর মানুষের সামনে উপস্থানপন করতে হবে। যে কোনো অবস্থায় এবং যে কোনো স্থানে, পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী ও জাতির সাথেই মুসলমানদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে, মুসলমান যে নীতি আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যে আদর্শ অনুসরণ করে তারা কল্যাণ লাভ করেছে, তাদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি,

www.pathagar.com

নিরাপত্তা, স্বস্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, তা যেনো সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি বাস্তবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়। তাহলে তারা দ্বীনে হক-এর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে।

দ্বীনে হক-এর সাক্ষ্য দান ও বর্তমান মুসলমানদের কর্মনীতি

মহাক্ষতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ও সফলতা অর্জনের জন্য পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দানের ব্যাপারে ওপরে উল্লেখিত দিকসমূহ অবলম্বন করাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্র বিন্দু। এটাই ছিল তাদের সর্বাগ্রে পালনীয় দায়িত্ব। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম মিল্লাত এই দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে ইতোপূর্বে বনী ইসরাঈলীরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছিলো বলে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে এবং তারা মহান আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। লাঞ্ছনা আর অপমান হয়েছে তাদের লালট লিখন। যে কারণে ইয়াহুদীরা নেতৃত্বের পদ থেকে পদচ্যুত হয়েছে এবং ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেই একই কারণ যদি মুসলমানদের মধ্যে পয়দা হতে থাকে, তাহলে ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে আচরণ করেছেন, সেই একই আচরণ তিনি মুসলমানদের সাথেও করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ্ তা'য়ালার স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে (নাউযুবিল্লাহ) এমন শত্রুতা ছিলো না যে, তিনি তাদের প্রতি অকারণে গযব চাপিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সাথেও মহান আল্লাহর এমন কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই যে, তারা ইয়াহুদীদের ন্যায় আচরণ করতে থাকবে আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন রাখবেন এবং ক্রমাগতভাবে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেই যাবেন।

'হক'-এর ব্যাপারে মুসলমানরা অতীতের সেই ইয়াহুদীদের তুলনায় মোটেও সুখকর আচরণ করছে না। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের চরিত্রে বিকশিত হয়ে পৃথিবীময় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে যে কোনো কাজ শুরুর পূর্বে মুসলমানরা আপন রব মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে স্মরণ করে শুরু করবে এবং এটাই ছিলো তাদের ঈমানী দায়িত্ব। অমুসলিম জাতিসমূহ কোনো দায়িত্ব গ্রহণকালে যে শপথ বাক্য পাঠ করে, সেখানে তারা নিজের ধ্যান-ধারণা অনুসারে স্রষ্টাকে স্মরণ করে। আমেরিকা-ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে শপথ

www.pathagar.com

গ্রহণকালে তারা বাইবেলের ওপরে হাত রেখে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণকালে শপথ বাক্যে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না।

আমি প্রথম বারের মতো যখন আমার নিজ এলাকা পিরোজপুর সদর ১ নম্বর আসন থেকে মহান আল্লাহ রহমতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রবেশ করলাম, তখন বাজেট অধিবেশনে আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করলাম, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ তাদের মৃত নেতাদেরকে স্মরণ করে বক্তৃতা শুরু করছেন। মুসলিম হিসাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণের সৎসাহস দেখাতে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। আমার জন্য নির্ধারিত সময়ে আমি আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের হাম্‌দ না'ত পাঠ করে আমার বক্তৃতার সূচনা এভাবে করলাম, 'আমি সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি' এই কথাটুকু বলতেই আমি লক্ষ্য করলাম পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যগণ আমার দিকে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় তারা অনুমান করেছিলো আমি তাদেরই অনুরূপ কোনো নেতাকে স্মরণ করবো। আমি বক্তৃতার সূচনা এভাবে করলাম, 'আমি আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে, আমার সবটুকু শ্রদ্ধার শেষ রেশটুকু বিলিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী ও বিশাল আকাশের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে।'

মুসলমানরা 'হক'-এর স্বপক্ষে এবং 'হক'-কে সর্বোচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুখের কথা ও লেখনী ব্যবহার করা তো দূরে থাক, তারা এর বিপরীত কাজটিই অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে। মুসলমান হিসাবে নিজেকে দাবি করে, পাশাপাশি মুখের কথা, বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করা হচ্ছে। দ্বীনে হক-কে তথা মহান আল্লাহর বিধানকে মানুষের জীবনে অপ্রয়োজনীয়, সেকেলে, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক, অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম নামধারী লোকগুলো প্রিন্টেড এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোয় ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী লোকজন অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল চালু করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় পত্র পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলসমূহ 'হক'-এর বিপরীত পথেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের কবিতায় ও সাহিত্যে 'হক'-এর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, কৃষিজীবী, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চিকিৎসক তথা মুসলিম মিল্লাতের অধিকাংশ লোকজন নিজেদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় ভিন্ন জাতির

www.pathagar.com

সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইসলামের বিপরীত নীতি আদর্শে প্রতিপালিত, বিপরীত পরিবেশে বর্ধিত কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন লোকগুলোর ঘৃণ্য জীবনধারার তুলনায় মুসলিম মিল্লাতের লোকজনের জীবনধারা কোনো অংশেই উৎকৃষ্ট নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের তুলনায় মুসলমানদের চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য বিভৎসরূপে প্রকাশ ঘটছে। অমুসলিমদের জীবনধারায় আর মুসলমানদের জীবনধারায় কোনোই পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বর্তমান মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা দেখে অমুসলিম জাতিসমূহ এ কথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে যে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলমানদের কাছে অনুসরণ করার মতো কোনো আদর্শ নেই, এই জন্যই তারা আমাদের নীতি আদর্শ পরম মমতাভরে অনুসরণ করছে।

মুসলমানদের কেনো এই দুঃখজনক অবস্থা হলো, বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করার জন্য একটু পেছনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। ইসলাম বিবর্জিত আধুনিক জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি শ্রেণী ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। ইতিহাস–যে ইতিহাস রচিত হয়েছে ইউরোপের ধর্ম বিরোধী গোষ্ঠী দ্বারা বা তাদেরই মানস সন্তানের হাত দিয়ে, এসব ইতিহাসে তারা যখন পড়ছে যে, ইউরোপে ধর্ম ছিল প্রগতি এবং মানব কল্যাণের অন্তরায়। তখন এসব মুসলিম নামধারী ব্যক্তিগণ ইসলামকেও প্রগতির অন্তরায় মনে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ইসলাম মানেই মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং এই আদর্শ মানব কল্যাণের অন্তরায়। সুতরাং ইসলামকে সমাজ থেকে উৎখাত করতেই হবে। ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে এই মুসলিম নামধারী পন্ডিতরা ইসলামকে পাদ্রীদের পোপতন্ত্রের ন্যায় প্রগতি বিরোধী বলে ধারণা করছে, আবার কেউ জেনে বুঝে নিজের কলম এবং মাথা ইসলামের শত্রুদের কাছে বিক্রি করে উচ্ছিষ্টের লোভে ইসলামের বিরোধিতা করছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করছেন বা করেছেন, তাদের ভেতরে অধিকাংশ পন্ডিতই ইসলাম সম্পর্কে বহু অমুসলিম চিন্তা নায়কের তুলনায় ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে পিছিয়ে আছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ–যারা অমুসলিম, তারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানেও করছেন, ঠিক এ সময়ে তথাকথিত মুসলিম চিন্তাবিদগণ ভ্রান্ত মতবাদ-মতাদর্শ নিয়ে গবেষণায় বিভোর হয়ে আছেন। এই শ্রেণীর মুসলিম নামধারী চিন্তা-নায়করা পরিত্যক্ত আদর্শ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার অঢেল সময় পান, কিন্তু তারা সময় পান না ইসলামকে নিয়ে একটু মাথা চিন্তা-গবেষণা করার। তারা নিজের ঘরে গিলাফে মোড়া কোরআন খুলে দেখার সময় পান না।

অপরদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে যারা কোরআন-হাদীস নিয়ে চর্চা করছেন, ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করছেন, তাদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত নন। তারা বিজ্ঞান চর্চা করেন না। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্। সৃষ্টির শুরুতেই বিজ্ঞান, সৃষ্টির প্রথম মানুষ একজন বিজ্ঞানী। কি ধরনের বিজ্ঞানী তা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন, পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাকে নবুয়াত দান করা হয়েছিল না পরে দান করা হয়েছিল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক শ্রেণীর আলেম সমাজ গবেষণা করেন-বিতর্ক করেন। কিন্তু আফসোস, তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন তা নিয়ে গবেষণা করেন না। এ সম্পর্কে গবেষণা তো করেনই না, যারা বিজ্ঞান গবেষণা করেন এবং চর্চা করেন তাদেরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেন। তাঁরা কেন এমন করেন, এরও যুক্তি সম্মত কারণ রয়েছে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে গোটা পৃথিবী শাসন করেছে ইংরেজ জাতি। ভারতীয় উপমহা দেশেও তারা দস্যুর মত আক্রমন করে প্রায় দুই শত বছর শাসন করেছে। তারা জানতো, তারা চিরদিন এই দেশে থাকতে পারবে না। সুতরাং তারা চলে যাবার পরেও যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক গোলামী না করলেও যেন অন্যান্য সমস্ত দিক ও বিভাগে গোলামী করে সেই ব্যবস্থা তারা পাকাপোক্ত করে রেখে যায়।

পরিকল্পনার ভিত্তিতে তারা তাই করেছে। মুসলমানদেরকে তারা প্রকৃত ইসলাম বুঝতে দেয়নি। ইসলামকে তারা বুঝতে দেবে না এ কারণে শিক্ষাকে তারা দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। একভাগের শ্রুতি মধুর এবং আকর্ষণীয় নাম General Education দেয়া হলো। আরেক ভাগের শ্রুতিকটু এবং অবহেলিত নাম ওল্ড স্কীম Old Scheme দেয়া হলো। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষার নাম দেয়া হলো Old Scheme। এই নামটি এমন যে, তা শুনতেই খারাপ বোধ হয় এবং এই শিক্ষা গ্রহণের প্রতি কোন আকর্ষণ মানুষের মনে সৃষ্টি হয় না।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এখানেই থেমে থাকেনি। কোরআন হাদীসকে বিকৃত করা এবং কোরআনের প্রকৃত শিক্ষাকে আড়াল করার লক্ষ্যে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অমুসলিম প্রিন্সিপাল নিয়োগ করলো। এভাবে বছরের পর বছর ধরে ২৬ জন অমুসলিম প্রিন্সিপাল সে মাদ্রাসায় থাকলো। সে মাদ্রাসা থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করলো, তাঁরা কোরআন হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে কিনা, তাদের কার্যকলাপই তা প্রমাণ করে দিল। স্বামী-স্ত্রীর বিভেদের ফতোয়া দেয়া আর মিলাদ পড়া ব্যতীত তেমন কোনো যোগ্যতাই তাদের ভেতরে ইংরেজগণ সৃষ্টি হতে দেয়নি।

www.pathagar.com

ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি কিছুই তারা জানতে পারলো না। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এই কথাটিই তারা জানতে পারলো না, অথচ তারাই হলো ইসলামের শিক্ষক এবং মুসলমানদের ধর্মগুরু। এই শিক্ষার প্রতি এতটাই ঘৃণা সৃষ্টি করা হলো যে, কোন একটি ধনীর সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়া হত না, মাতা-পিতার কোন মেধাবী সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়া হত না। কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, ডানপিটে সন্তানদেরকে মাতা-পিতা মাদ্রাসায় দিতে থাকলেন। এরাই আলেম নামে পরিচিতি পেল। ফল যা হবার তাই হলো। মুসলিম সমাজ ধ্বংসের অতলে তলিয়ে গেল।

ইসলামকে যারা সত্যই ভালোবাসতো তাঁরা বাধ্য হয়েই আরেক ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করলো। তার নাম দেয়া হলো কওমী মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় সরকার কোনো অনুদান দিল না। ফলে সাধারণ মুসলমানদের দানের ওপরে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হতে থাকলো। মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার জন্য মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক রাস্তায় নেমে এলেন। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে তাঁরা বাধ্য হলেন। ফলে তাদের ভেতর থেকে আত্মমর্যাদা বোধ হ্রাস পেতে লাগলো। সমাজে তাদের মর্যাদা খাটো হতে থাকালো। তাদের ভেতরেও ইসলামের বিপ্লবী চেতনা আশানুরূপ জাগ্রত হলো না। ফলে মুসলিম জাতিকে তাঁরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে খুব কমই টেনে নিতে পারলেন।

আল্লাহর কিছু বান্দাহ্ যখন প্রকৃত ইসলাম অনুধাবন করে মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান জানালো, তখন ইংরেজদের তৈরী একশ্রেণীর আলেম নামধারী ব্যক্তি প্রবল বাধার সৃষ্টি করলো। বর্তমান সময় পর্যন্তও তাদেরই অনুসারী এবং উত্তরাধিকারী আলেম নামধারী ব্যক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে আসছে। দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বই পুস্তক রচনা করছে, তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ফতোয়া দিচ্ছে।

বর্তমানেও ইসলামের নামে যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, সেটা পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা নয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হযরত আলী, খালিদ, তারিক, মুসা সৃষ্টি হচ্ছে না। কারণ এদেরকে হযরত বিলালের কাহিনী পড়ানো হয়, হযরত খাব্বাবের কাহিনী পড়ানো হয়, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কিভাবে তাঁরা নির্যাতন সহ্য করেছেন, এ কাহিনী পড়ে এবং শুনে তাঁরা কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তাদের ভেতরে এই ধারণার সৃষ্টি হয়, একজন লোক কালেমা পাঠ করে এই মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে আর কাফের এসে তার ওপরে কঠিন নির্যাতন করছে, তবুও সে ইসলাম ত্যাগ করছে না।

www.pathagar.com

কিন্তু তাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না যে, রাসূল তাদেরকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, যে প্রশিক্ষণের কারণে তাদের ভেতরে ইসলামী আদর্শ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ইসলামের এ সকল দিক তাদেরকে শিক্ষা না দেয়ার কারণ হলো, এসব শিক্ষা লাভ করলে তাঁরা ময়দানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

সে সময়ে বাংলা এবং আসামে মাদ্রাসা ছিল মাত্র একটি। সে মাদ্রাসা হলো কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা। ৭৭ বছর ধরে ২৬ জন খৃষ্টান প্রিন্সিপালের পরিচালনার পরে একজন মুসলমান প্রিন্সিপাল দেয়া হয়েছিল। সে প্রিন্সিপালও ছিল খৃষ্টানদের হাতে গড়া তথা তাদেরই মানস সন্তান এবং তিনি যে কেমন ধরনের মুসলমান ছিলেন তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। ১৮৫০ সালে প্রথম প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছিল ডক্টর স্প্রেংগার। তারপর ১৯২৭ সাল পর্যন্ত শেষ প্রিন্সিপাল ছিল আলেকজান্ডার হেমিলটন হালি। এই মাদ্রাসায় কোন বিজ্ঞান চর্চা ছিল না।

এই মাদ্রাসা থেকে যারা বের হলো তারাও বিজ্ঞান চর্চা বৈধ মনে করতেন না। কারণ তাদের মন মগজে প্রবেশ করানো হয়েছিল, বিজ্ঞান শিক্ষা করা হারাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এসব বিষয় তাদেরকে জানতে দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, এখান থেকেই পরিকল্পিতভাবে পবিত্র কোরআনের তাফসীরে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বাইবেলের বিকৃত বর্ণনা ইসলামের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজও সে বিকৃত বর্ণনা খৃষ্টানদের উচ্ছিষ্ট মুসলমানরা গলধকরণ করছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সম্প্রদায় বিজ্ঞান চর্চা করেন না এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে বিজ্ঞান চর্চাকে তারা অবজ্ঞা করে বিজ্ঞান চর্চা থেকে নিজেরা বিরত রয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও বিরত রাখার চেষ্টা করছেন।

এর ফলে বস্তু জগতকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিচার করতে না পারার কারণে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে তাঁরা নেতৃত্ব দানে সক্ষম হচ্ছেন না। দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামহীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শাসনের ফলে ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন ও চরিত্র বিশিষ্ট নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের প্রতিটি বিভাগ থেকে বিদূরিত হয়ে গেছে। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত অথচ ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র শূন্য মুসলমান ব্যক্তিদের নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের সমস্ত বিভাগ ও স্তরে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফলে পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। বর্তমানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কথা উঠলেই ইসলামী শিক্ষাহীন এই আধুনিক শিক্ষিত নামধারী মুসলিম ব্যক্তিগণই সর্বপ্রথম বিরোধিতা করছে।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটাকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞান সন্ধানীরা তথা বিজ্ঞানীরা এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটার পরিচালক। গাড়ির পরিচালকের ইচ্ছানুযায়ীই গাড়ির যাত্রীদেরকে গাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থান করে এগিয়ে যেতে হয়। ইসলামী চরিত্রসম্পন্ন মুসলিম নেতৃত্ব যতো দিন এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটার পরিচালক ছিলেন অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, সে সময় পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাধারা-ই মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সত্য, মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত তথা সমস্ত কিছুর মানদন্ড ছিল ইসলাম।

পাদ্রীদের জুলুমতন্ত্রের পরিণতি- ইউরোপের অবৈধ সন্তান ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের ফলে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার প্লাবনে ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত মুসলিমদের তৃণখন্ডের ন্যায় ভেসে যাওয়াটা আশ্চর্যজনক নয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার যে গাড়ি দুর্বার গতিতে মানব মন্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাতে করে ইসলামী শিক্ষা বর্জিত মুসলিম এমনকি দাড়ি টুপি তসবীহধারী ধার্মিক বলে পরিচিত মুসলিম ব্যক্তির ভেসে যাওয়া আশ্চর্যজনক নয় বরং এটাই স্বাভাবিক।

এ জন্য মুসলমানদেরকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে। যে দায়িত্ব তাদের ওপরে ন্যাস্ত করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী, এই দায়িত্ব পালন না করার কারণেই ইয়াহুদীদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তারা সামষ্টিকভাবে হক'-এর দায়িত্ব পালন করেনি বরং ব্যক্তিগতভাবে যারা দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের প্রতি তারা নির্মম অত্যাচার করেছে। তাদের সেই ঘৃণ্য আচরণের সাথে বর্তমান মুসলমানদের আচরণে কোনোই পার্থক্য নেই। এরাও জাতিগতভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করছে না। ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে যারা এই দায়িত্ব পালন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইয়াহুদীরা নবী-রাসূলদের ওপরে নির্যাতন চালিয়েছে এবং হত্যা করেছে, বর্তমান মুসলমানরা অনুরূপভাবেই 'হক'-এর প্রতি আহ্বানকারী দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের ওপরে নির্যাতন করছে, তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করে কারারুদ্ধ করছে, বিচারের নামে প্রহসন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর দ্বীনের সাথে যে ঘৃণ্য আচরণ করে ইয়াহুদীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, সেই একই আচরণ মুসলিম নামধারী নেতৃত্ব স্থানীয় লোকগুলো নিজেরা করছে এবং গোটা জাতিকে করতে বাধ্য করছে। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। সারা পৃথিবীতে সবথেকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত, অবহেলিত, নিষ্পেষিত, পদদলিত মানুষগুলোর পরিচয় হলো মুসলমান।

যতদিন তারা 'হক'-এর অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছে, ইতিহাস সাক্ষী, ততদিন এই মুসলমানরাই ছিলো পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন। গোটা দুনিয়ার ওপরে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। আর যখন থেকে তারা 'হক'-এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে, দায়িত্ব পালনে গাফলতির পরিচয় দিয়েছে, তখন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। মুসলমানদের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও সম্মান-মর্যাদা লাভের একমাত্র চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কোরআন। এই কোরআনের অনুসরণই কেবলমাত্র তাদের হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে। কোরআন তো এ জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি যে, এর অনুসারীরা পৃথিবীতে বিপদগ্রস্ত হবে। সূরা ত্বা-হা-য় মহান আল্লাহ বলেন–

طه-مَا اَنْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى-

আমি কোরআন এ জন্য তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি বিপদে পড়বে।

দ্বীনে হক-এর দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোয় রাস্তা-পথে যান-বাহন চলাচলে শৃংখলা রক্ষা ও সাধারণ জনগণের শান্তি-স্বস্তির সাথে পথ চলা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে রাস্তা-পথে চরম বিশৃংখলতা দেখা দেবে। নিষিদ্ধ যান-বাহন পথে নেমে আসবে, তা থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষ শান্তি ও স্বস্তির সাথে পথ চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যান-বাহন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে, মানুষ প্রাণ হারাবে, পঙ্গুত্ববরণ করবে এবং সম্পদের হানী ঘটবে।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে মুসলমানরা হলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ। নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তারা গোটা পৃথিবীর প্রত্যেক দিক ও বিভাগের শৃংখলা এবং মানব জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করবে—এটাই ছিলো তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। তাদের প্রতি এই দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ক্ষমতা ও পদের প্রয়োজন হয়, তা-ও মহান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা ও পদ অর্জনের জন্য বেশ কয়েকটি গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ব্যর্থ হলে ক্ষমতা ও পদ কোনটিই আল্লাহ্ তা'য়ালা দেন না। কারণ মহান আল্লাহর নীতি হলো, তিনি অপাত্রে ক্ষমতা ও পদ দেন না।

মুসলমানদের মধ্যে অতীতকালে সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছিলো, তারা ক্ষমতা ও পদ লাভের গুণ অর্জন করেছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তখন অনুগ্রহ করে মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও পদ দুটেই দান করেছিলেন। যখনই তারা নিজেদের অযোগ্যতার কারণে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ্ তা'য়ালাও ক্ষমতা ও পদ নামক নে'মাত দুটো তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ মুসলমানরা ছিলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ভাষায়—

اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ—

যদি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসো, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মক ধরনের ভাঙ্গন ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল-৭৩)

আর যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে তা থেকে সমাজের ঐ লোকগুলোও নিরাপদ থাকবে না, যারা ইসলাম বিরোধিদের চতুরমুখী আক্রমণ সাহসের সাথে মোকাবেলা না করে মসজিদ আর খান্‌কায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ নিজেরাই শুধু ইসলামী বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করেছে, জাতিকে আল্লাহ্ বিরোধী পথ থেকে বিরত রাখার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিরত থেকেছে। নিজেরাই শুধু অসৎকাজ থেকে বিরত থেকেছে কিন্তু সমাজ ও দেশের বুকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। ঈমানদার যে সমাজে বাস করবে, সে সমাজে বাতিল মাথা উঁচু করবে, ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ড চলতে থাকবে, আর ঈমানদার নীরবে তা সহ্য করবে এবং কোনো প্রতিবাদ করবে না, এটা স্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। বাতিলের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে না, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'শয়তানুন আখরাজ অর্থাৎ বোবা শয়তান' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। হযরত দাউদ (আঃ) যখন মহান আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করতেন, তখন আল্লাহর কালাম শোনার জন্য নদীর মাছ কিনারায় চলে আসতো। ইয়াহুদীরা সেই মাছ ধরে ভক্ষণ করতো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই মাছ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এক শ্রেণীর ইয়াহুদী আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ অমান্য করে সেই মাছ ধরে ভক্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহর নিষেধ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা গযব নাযিল করে সত্তর হাজার ইয়াহুদীকে বাঁনরে পরিণত করে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সেই অপরাধের কথা ইয়াহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পবিত্র কোরআনে তা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ–

আর তোমাদের স্বজাতির সেই সব লোকদের ঘটনা তো জানাই আছে, যারা শনিবারের নিয়ম লংঘন করেছিলো। আমি তাদেরকে বলেছিলাম বানর হয়ে যাও এবং এমন অবস্থায় দিন যাপন করো যে, চারদিক থেকে তোমাদের ওপর ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হবে। (সূরা বাকারা-৬৫)

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'য়ালার এই গযবে আক্রান্ত হলো, তারা সবাই আল্লাহর নিষেধ অমান্য করে মাছ ভক্ষণ করেনি। কিন্তু তারপরেও তারা গযবের আওতায় এসে গিয়েছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা যখন মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন বনী ইসরাঈলীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। জনতার এক অংশ নিষিদ্ধ মাছ ভক্ষণ করলো। তারা কৌশল অবলম্বন করলো এভাবে যে, শনিবারে মহান আল্লাহর কালাম শোনার জন্য মাছগুলো যখন কিনারায় আসতো, তখন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো যে, সেই মাছগুলো বিশেষ স্থানে যেন বন্দী হয়ে পড়ে। তারপরের দিন অর্থাৎ রবিবারে তারা সেই বন্দী মাছগুলো ধরে ভক্ষণ করতো।

জনতার মধ্য থেকে আরেকটি দল এসব ঘটনা নীরবে দেখেছে। চোখের সামনে মহান আল্লাহর আইন প্রকাশ্যে লংঘিত হচ্ছে, আর তারা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। নিজেরা অবশ্য সেই পাপ থেকে বিরত থেকেছে, কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হতে দেখে তার প্রতিবাদ করেনি। হাদীস অনুসারে তারা বোবা শয়তানের ভূমিকা পালন করেছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় যে দলটি ছিলো তারা হলো প্রতিবাদকারী দল। তারা নিজেরা অপরাধমূলক কর্ম থেকে বিরত থেকেছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। মাছ ভক্ষণকারীদেরকে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ এভাবে মাছ ভক্ষন করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং এই কাজ থেকে বিরত থাকো। মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইয়াহুদী জাতির ওপরে গযব নাযিল করলেন, তখন প্রতিবাদকারী দল ব্যতীত ঐ দুই দলকেই গযবে আক্রান্ত করলেন, যারা মাছ ভক্ষণ করেছিলো আর যারা মাছ ভক্ষণ করেনি কিন্তু কোনো প্রতিবাদও করেনি। মহান আল্লাহর আইন অমান্য করা হচ্ছে দেখে কোনো সতর্কবাণী উচ্চারণ করেনি।

আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত এই ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হক কথা বলতে হবে তথা বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। কারণ অন্যায় যে করে আর যে সহে–তারা উভয়েই সমান অপরাধী। হযরত লূত (আঃ) এর আমলে তাঁর অপরাধী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা গযবের ফেরেশ্তাদেরকে প্রেরণ করলেন। আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের মতো যমীনের তলদেশ থেকে লাভা উত্থিত হয়ে গোটা যমীনকে উলট-পালট করে দেয়া হয়েছিলো। এই কাজে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর যেসব ফেরেশ্তা দল নিযুক্ত করেছিলেন, তারা কাজ সম্পাদন করতে এসে দেখলেন, সেখানে এমন একজন লোক রয়েছে, যে ব্যক্তি জীবনের ত্রিশ বছর ব্যাপী আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রয়েছে।

তাঁরা মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করলো, হে আল্লাহ! এই যমীনে তোমার এমন একজন বান্দাহ্ রয়েছে, যিনি ত্রিশ বছর ধরে তোমারই দাসত্ব করে যাচ্ছে।' আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিলেন, ঐ ব্যক্তিকেও আযাবে নিক্ষেপ করো। কারণ গোটা জাতি যখন পাপাচারে লিপ্ত ছিলো, তখন সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত ছিলো। লোকজনকে আল্লাহ্ বিরোধী কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য একটি কথাও বলেনি।

সুতরাং মহান আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে 'হক'-এর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, গোটা মানবতাও যদি আল্লাহ বিরোধী পথে ধাবিত হয়, তবুও একজন ব্যক্তিকে হলেও 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে। নতুবা যে গযব আসবে, সেই গযব থেকে আল্লাহভীরু লোক বলে কথিত লোকগুলোও মুক্ত থাকবে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

এবং দূরে থাকো সেই ভাঙ্গন ও বিপর্যয় থেকে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদেরকেই গ্রাস করবে না, তোমাদের মধ্যে যারা অপরাধ করেছে। (সূরা আনফাল-২৫)

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, মনে করুন কোনো একটি বাড়ির সামনে যে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা রয়েছে, সেখানে কোনো কুকুর বা বিড়াল মরে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পৌরসভা কর্তৃক নিয়োজিত লোকজন তা পরিষ্কার করছে না। পথিক যারা নালার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, তারা দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য নাকে কাপড় চেপে পথ অতিক্রম করছে। বাড়ির মালিকও পথিকের অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে। কেউ যখন তা পরিষ্কার করলো না, তখন কেবলমাত্র ঐ বাড়ির মালিক শুধু দূষিত পরিবেশের কারণে রোগে আক্রান্ত হবে না, যারা তার চারদিকে বসবাস করে এবং সেই নালার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পথ অতিক্রম করে, তারাও রোগে আক্রান্ত হবে। রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এখানে একজনকে অবশ্যই তা পরিষ্কার করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং অন্যায়ের উদ্ভব যেখানেই ঘটবে, সেখানেই প্রতিবাদের ঝান্ডা উত্তোলন করতে হবে। 'হক' কথা বলতে হবে এবং না-'হক'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে-আর এটাই হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্বের অঙ্গন থেকে মুসলমানরা যখনই অপসারিত হয়েছে, ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো বিদায় গ্রহণ করেছে, তখনই রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী দুনিয়া পূজারী ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত লোকগুলো বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্বে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। একের পর এক মহাযুদ্ধের কারণে অগণিত আদম সন্তান পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। অসংখ্য মারণাস্ত্রের ব্যবহার ও চরম ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশ অনাগত মানব সন্তানের জন্য যেমন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবী থেকে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী চিরতলে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমান মানব গোষ্ঠীও নানা ধরনের প্রাণঘাতী অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে এবং পঙ্গুত্ব বরণ করছে।

www.pathagar.com

রাজনীতির অসৎ নিয়ন্ত্রকরা নিজেদের হীন স্বার্থে পৃথিবীর এক দেশের সাথে আরেকটি দেশের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করে রাখছে। প্রয়োজনে যুদ্ধে লিপ্ত করে নিজেরাই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নানা স্বার্থ উদ্ধার করছে। কোনো একটি দেশেও দেশ ও জাতি প্রেমিক কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতে অধিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না, দেশ ও জাতির স্বার্থে যারা তৎপর, প্রয়োজনে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে দেশদ্রোহী লোককে ক্ষমতায় বসাচ্ছে। জাতীয় উন্নতির পূর্ব শর্ত হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতা। প্রায় দেশেই তাদের অনুগত লোকদের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে সে দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের মুখাপেক্ষী করে রাখছে।

অর্থনীতির অঙ্গন থেকে আল্লাহভীরু লোকগুলো যখন বিদায় গ্রহণ করেছে, তখন চরম মুনাফাখোর-সুদখোর ও দস্যু-তস্করের দল অর্থ জগতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে মানবতার ওপরে শোষণমূলক পুঁজিবাদ চাপিয়ে দিয়ে মানবতাকে নির্মমভাবে শোষণ করছে। ফলে পৃথিবীর মানুষগুলোকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য করা হয়েছে, অর্থোপার্জনকে এমন কঠিন করা হয়েছে যে, 'সবথেকে দায়িত্বপূর্ণ ও মহৎ কর্ম অর্থাৎ সন্তান প্রতিপালন–আদর্শ মানব গড়ার কারিগর' নারীদেরকে সেই দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাকেও শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনে বাধ্য করা হয়েছে। শিশুদের অধিকার হরণ করে তাদেরকেও পেটের ভাতের জন্য শ্রম বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এতে করে তাদের সুকুমার বৃত্তিসমূহের অকাল মৃত্যু ঘটছে, দুর্ব্যবহার পাবার ফলে তাদের ভেতরে নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের প্রতি যৌন নিপীড়নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, বড়দের সাথে মেলামেশার ফলে তাদের ভেতরের সুপ্ত চেতনাসমূহ অসময়ে জাগ্রত হচ্ছে এবং তারা অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

অর্থোপার্জনের নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-বন্ধনহীন পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নারীদেহ, অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে সমাজ, দেশ ও জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করা হচ্ছে। যার যেমন খুশী তেমন পথে অর্থোপার্জন করছে, এতে করে দেশ ও জাতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দেশের পরিবেশ কতটা কলুষিত হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার মতো মানসিকতার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন নারীকে সেই আসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে এনে পণ্যদ্রব্যের লেবেলে পরিণত করা হয়েছে। নেশা জাতিয় মাদকদ্রব্যের বিস্তৃতি ঘটিয়ে জাতির মেরুদন্ড কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে আখিরাত প্রেমিক লোকগুলো যখন সরে এসেছে, তখন সেই জগৎ দখল করেছে বিকৃত রুচিসম্পন্ন নেশায় অভ্যস্ত যৌন উন্মাদগ্রস্ত লোকগুলো। এরা গান-বাজনার নামে অশালীন ও নগ্ন নর্তন-কুর্দনের প্রচলন ঘটিয়েছে। শ্রবণের অযোগ্য অশ্লীল যৌন আবেদনমূলক গীতমালা রচনা করে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তা তুলে দিয়েছে। চরিত্র বিধ্বংসী ছায়া-ছবি, চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মানবতাকে পাপ-পঙ্কিলতার পথে ঠেলে দিচ্ছে। যুদ্ধ-মারামারি, হত্যা-ধর্ষন, শ্লীলতাহানী, রাহাজানী, ছিন্‌তাই, চুরি, ডাকাতী ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনের যাবতীয় কলা-কৌশল সম্বলিত সিনেমা প্রদর্শন করে কিশোর, তরুণ যুবকদেরকে বিপদগামী করা হচ্ছে। পাঠের অযোগ্য কবিতা ও উপন্যাস রচনা করে কিশোর-তরুণদের সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রত করে তাদেরকে ধর্ষনের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে অপরাধিদের পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলে দেখা যাবে অস্বাভাবিকহারে কিশোর-তরুণরা অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা এমন ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে, যা কল্পনা করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হত্যা-ধর্ষণ, ছিন্‌তাই এমন কোনো অপরাধ নেই, যা কিশোর-তরুণদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। পড়ালেখার জন্য শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক তার কিশোর ছাত্রদেরকে শাসন করছে, কিশোর ছাত্র প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে সেই শিক্ষককে হত্যা করছে। এসবই হলো বর্তমান মানবতা বিরোধী চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের বিষময় ফল।

অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র থেকে ঈমানদার মুসলমানদের দুর্ভাগ্যজনক পশ্চাদাপসারণের ফলে মানবতার কল্যাণে অর্থ ব্যয় না হয়ে অকল্যাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। পৃথিবীর অসংখ্য আদম সন্তানকে দারিদ্র সীমার নীচে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের অভাবে শতকোটি আদম সন্তান মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। অগণিত অর্থ-সম্পদ নিছক আমোদ-ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের নামে ব্যয় করা হচ্ছে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ধুমপান আর মদের পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে, বস্ত্রহীন ও চিকিৎসাহীন রেখে বন্য পশু-প্রাণীর পেছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। নিছক শখের বশে অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলছে।

আবিষ্কার, উদ্ভাবন তথা বিজ্ঞানের জগৎ থেকে যখন ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারী লোকগুলো নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে, তখন পরকালের ভীতিশূন্য লোকগুলো

www.pathagar.com

সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে। তারা সীমা-পরিসংখ্যাহীন অর্থ এবং নিজেদের মেধা ব্যয় করে মানবতা বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। হত্যা ও মানুষকে বিপন্ন করার নিত্য-নতুন উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করা হচ্ছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে ঈমানহীন লোকগুলো যখন মানব জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, তখনই গোটা পৃথিবী জুড়ে মহাভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এই ভাঙ্গন ও বিপর্যয়, অশান্তি-অনাচার আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের ওপরে চাপিয়ে দেননি। এগুলো মানুষের নিজের হাতেরই উপার্জন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ–

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। (সূরা রূম-৪১)

আল্লাহ্ ভীতিহীন লোকগুলো যখনই কোনো নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে, তখনই সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আখিরাতের ভীতিহীন স্বৈরাচারী দুর্বৃত্ত লোকগুলো পৃথিবীর নেতৃত্বে আসীন, এদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড হলো পৃথিবীর পরিবেশকে অশান্ত করে তোলা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً–

এরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে ফাসাদে ভরে তোলে। সেখানের মর্যাদাবান-সম্মানীত লোকগুলোকে লাঞ্ছিত করে। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব। (সূরা নামল-৩৪)

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ঈমানহীন লোকগুলো মানব জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনের প্রত্যেক বিভাগের নেতৃত্বের আসন যখন দখল করেছে, তখন শুধু মানবতাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গোটা পৃথিবীর পরিবেশই বিনষ্ট হয়েছে। এদের কর্মকান্ডের কারণে পৃথিবীর প্রাণীকূল ও উদ্ভিদ ধ্বংস হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। উর্ধ্বজগতে যে ওজন স্তর রয়েছে, তাতে ফাটল ধরেছে তাদেরই ভারসাম্যহীন কার্যকলাপের দরুন। পবিত্র কোরআন ঈমানহীন লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এভাবে তুলে ধরেছে–

www.pathagar.com

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الْفَسَادَ–

সে যখন শাসকের আসনে বসে তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করতে সচেষ্ট হয় এবং ফসল ও প্রাণীকুলকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়। (সূরা বাকারা-২০৫)

ক্ষমতার দম্ভে এরা গোটা পৃথিবীর মানুষগুলোকে নিজের গোলামে পরিণত করতে চায়। ভিন্ন দেশের ধন-সম্পদের লোভে এরা যে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা এরা করে না। সাধারণ চক্ষু লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এরা অন্য দেশে আগ্রাসন চালায়। এদের ঘৃণ্য চরিত্র আল্লাহর কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ–

তুমি তাদের বেশীর ভাগ লোককেই দেখতে পাবে পাপাচার, সীমালংঘন ও অবৈধ সম্পদ খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে। (সূরা মায়িদা-৬২)

নিজেদেরকে এরা গোটা দুনিয়ার মোড়ল মনে করে। ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে এরা দুর্বল জাতিসমূহের প্রতি অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়। আল্লাহর কোরআন তাদের কর্মকান্ড এভাবে প্রকাশ করেছে–

فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الاَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَقَالُوْامَنْ اَشَدُّ مِنَّاقُوَّةً–

তারা পৃথিবীতে অবৈধ পন্থায় পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে যে, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে? (সূরা হামিম সিজদা-১৫)

সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যে সামগ্রিক অরাজকতা চলছে, গরীব জাতিগুলোর ওপর নিষ্ঠুর শোষণ, লুন্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করা হচ্ছে, নিছক ক্ষমতার গর্বে ক্ষুধার্থ মজলুম জাতি সমূহের ন্যায্য সম্পদ লুন্ঠন করে নিজের ভান্ডার পরিপূর্ণ করা হচ্ছে, ক্ষমতাশালী লোকগুলো দুর্বল মানুষগুলোর প্রভুর আসনে বসে আপন লোভ-লালসা ও খেয়াল খুশীর বেদীমূলে তাদের যাবতীয় অধিকার বিসর্জন দিচ্ছে, সুবিচার ও ন্যায়-নীতির

www.pathagar.com

মূলোৎপাটন করে জুলুম ও অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে, সৎ ও ন্যায়-পরায়ণ লোকদেরকে কোণঠাসা করে এবং অসৎ ও নীচমনা লোকদেরকে স্বগর্বে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে, তাদের অশুভ প্রভাবে জাতিসমূহের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, ন্যায়-পরায়ণতা, মহানুভবতা ও যাবতীয় সৎ গুণাবলীর উৎসসমূহ শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা, অসততা, পরস্বার্থ অপহরণ, ব্যভিচার, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নৃশংসতা, না-ইনসাফী ও যাবতীয় নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ড ও অনাচারসমূহের পুঁতিগন্ধময় নালার মুখ খুলে দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর স্বঘোষিত মোড়লদের মনে পররাজ্য দখলের লিপ্সা উগ্র হয়ে উঠেছে, তারা দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলোর ওপর তাদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে। দুর্বল জাতিসমূহের স্বাধীনতা হরণ করে, নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে নিজেদের ক্ষমতার উচ্চাভিলাস পূর্ণ করার লক্ষ্যে চরম অরাজকতার সৃষ্টি করে স্বাধীন মানুষের গলায় গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এসব কিছুর মূলে যে কারণ নিহিত রয়েছে, তাহলো পৃথিবীর মানব জীবনের প্রত্যেক বিভাগে ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলোর অনুপস্থিতি। তারা যদি 'হক'-এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো, তাহলে বর্তমান পৃথিবীর চেহারা এমন করুণ আকার ধারণ করতো না।

হক-এর প্রচার ও প্রসার ঘটানোর এবং মানব জীবনে সার্বিক ক্ষেত্রে যাবতীয় দিক নিয়ন্ত্রণ করার ট্রাফিক পুলিশের যে দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম মিল্লাতের ওপর অর্পণ করেছেন, সেই দায়িত্ব যদি তারা যথাযথভাবে পালন করতো, তাহলে গোটা মানবতা বর্তমানে এই করুণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত হতো না। মানুষসহ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদরাজি তথা সার্বিক পরিবেশে যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলোর পতনে পৃথিবী এক তিক্ত পরিবেশের মোকাবেলা করছে। পৃথিবী থেকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিদায় গ্রহণ করেছে। ক্ষুধা, দারিদ্রতা, অত্যাচার আর নির্যাতন এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত রয়েছে, সেই পথটি হলো মুসলমানদের নিজ জীবনে 'হক'-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং পৃথিবীর মানুষদেরকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান করা। এই দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করতে থাকলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে পূর্বের ন্যায় আবার পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকদের হাতে তুলে দেবেন–এটা মহান আল্লাহর ওয়াদা এবং তাঁর ওয়াদাই সবথেকে সত্য।

www.pathagar.com

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী

মানুষের জীবনে কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথমে ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে হবে। এরপর সে ব্যক্তির প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত হবে যে, সে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করার বিষয়টিকে এবং আমলে সালেহ্ করাকে নিজের জন্য কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ বলে মনে করেছে, সেই পথের দিকে অপরকেও সে আহ্বান জানাবে এবং এর নামই হলো 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত। ঈমানদার ব্যক্তিকে দাওয়াতী কাজ করতে হবে এবং এই কাজকে মুসলিম মিল্লাতের সামগ্রিক চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতীয় কর্ম চাঞ্চল্যের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজেই এই উদ্দেশ্যের প্রতি সজাগ লক্ষ্য রাখতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্যই হলো, তারা মহান আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে। তারা মানুষকে পার্থিব কোনো বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাবে না। বস্তুগত স্বার্থের দিকে আহ্বানকারী আহ্বান জানাবে না। পৃথিবীর বিশেষ কোনো জাতি, দেশ বা কোনো নেতার প্রতি আনুগত্য করার জন্য আহ্বান জানাবে না। 'হক'-এর দাওয়াত যারা দেবে, তাদের দাওয়াত হবে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর একত্বের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ব্যতীত ভিন্ন কোনো জীবন বিধান অনুসরণ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব, বন্দেগী, আরধনা-উপাসনা ও আনুগত্য ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা যাবে না। একমাত্র তাঁর আইন ব্যতীত অন্য কারো রচিত আইন মানা যাবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না। এই কথার দিকেই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী দাওয়াত দেবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান। (সূরা হামীম সাজ্দাহ্-৩৩)

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার সেই পরিবেশে, যে পরিবেশে মুসলমানদের ওপরে নির্মম-নিষ্ঠুর লোমহর্ষক নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে। আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, তারপর তা যখন অঙ্গারে পরিণত হয়ে প্রচন্ড তাপ নির্গত

www.pathagar.com

করতে থেকেছে, তখন মুসলমানদেরকে ধরে শরীর থেকে বস্ত্র খুলে উন্মুক্ত দেহে সেই আগুনের অঙ্গারের ওপরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে যাঁদের ওপরে নির্যাতন করা হয়েছে, হযরত খোবায়েব (রাঃ) ছিলেন তাঁদের একজন। একদিন তাঁকে হযরত ওমর (রাঃ) উন্মুক্ত শরীরে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, তোমার পিঠে অমন গর্ত এবং কোমরটি এতো সরু কেনো? এমন পিঠ আর কোমর তো আমি কারো দেখিনি!'

হযরত খোবায়েব (রাঃ) বললেন, 'ভাই ওমর, তোমার বোধহয় মনে নেই, ইসলাম কবুল করার অপরাধে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে রক্তাক্ত করেছে, অনাহারে রেখে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিয়েছে। তারপরও যখন আমি ইসলাম ত্যাগ করিনি তখন তারা আগুনের অঙ্গারের ওপরে আমাকে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। আমার শরীরের গোস্ত-চর্বি গলে গলে আগুন নিভে গিয়েছে, তবুও তারা নির্যাতনে বিরতি দেয়নি। আগুনের অঙ্গারসমূহ আমার পিঠের ভেতরে প্রবেশ করেছিলো, তখন থেকে আমার পিঠে যে দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, আজো পর্যন্ত তা মুছে যায়নি।'

যখন মুসলমানদের প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছিলো, যে সময়ে মুসলমান হবার অর্থই ছিলো নিজেকে ব্যঘ্র-সিংহ তথা হিংস্র বন্য প্রাণীর মুখে নিজেকে সোপর্দ করা। তখন যে ব্যক্তিই মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করতো, তখনই সহসা অনুভব করতো যেন সে হিংস্র শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করেছে আর হিংস্র প্রাণীগুলো দন্ত-নখর বিস্তার করে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য তার দিকে ছুটে আসছে। মুসলমান হবার কারণে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, রাস্তা-পথে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হচ্ছে, কোথাও প্রাণের নিরাপত্তা থাকছে না, এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং মুসলমানরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছিলো, আমি একজন মুসলমান।

তারা হাসি মুখে যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও নির্মম মৃত্যুকে কবুল করে এ কথা অকুতোভয়ে ঘোষণা করছে, 'যে মুসলমানদের ওপরে তোমরা নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছো, যাদেরকে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিচ্ছো, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছো, লাঞ্ছিত অপমানিত করছো, যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

'আমি একজন মুসলমান' মানুষের জন্য এর থেকে উচ্চতর স্তর আর দ্বিতীয়টি নেই। বিস্তীর্ণ এই যমীন, বিশাল ঐ আকাশ তথা গোটা মহাবিশ্বের যিনি অধিপতি সেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি

www.pathagar.com

হলো মুসলমান, একামাত্র তাঁরাই পৃথিবীতে যাবতীয় কাজে নেতৃত্ব দেবে, তাঁরাই হলো শাসক শ্রেণী আর সবাই শাসিত। পৃথিবীর যাবতীয় নে'মাত তাদের জন্য এবং পরকালেও তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাতের অধিকারী হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র তাঁরাই কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী। মানুষের এর থেকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার বিষয় দ্বিতীয়টি আর নেই। সুতরাং মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় পেশ করা সবথেকে গর্বের ও অহঙ্কারের বিষয়। আমি মুসলমান–মহান আল্লাহর সবথেকে ঘনিষ্ঠ একজন, এটাই আমার পরিচয়।

নিজের এই পরিচয় পেশ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ধন-সম্পদ, প্রাণ, সন্তান-সন্ততিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'আমি মুসলমান'। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমস্ত মানুষের ভেতরে ঐ ব্যক্তির কথাকে সবথেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি নিজে ঈমান এনেছে, ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করেছে এবং মহান আল্লাহর পথ অনুসরণ করার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। মানুষকে মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করার, আনুগত্য করার আহ্বান জানিয়ে এ কথা ঘোষণা করেছে যে, 'আমি আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি, আমি মহান আল্লাহর আনুগত্য করছি। আমি বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছি, অতএব তোমরাও তাঁরই বিধান অনুসরণ করো। আমি একমাত্র তাঁরই দাসত্ব কবুল করেছি, তোমরাও একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল করো।' এই কথার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও সর্বোত্তম কথা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

সুতরাং 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর সর্বপ্রথম গুণ হলো সে মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানাবে এবং এই কাজের বিনিময় একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই কামনা করবে। পৃথিবীর কোনো উদ্দেশ্য মনে গোপন রেখে সে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে না। দাওয়াত দেবে যেমন একমাত্র আল্লাহরই দিকে, তেমনি একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে দাওয়াতী কাজ করবে।

দ্বীনে হক-এর দাওয়াত দানকারীকে দুঃসাহসী হতে হবে

'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার কাজটি অসীম সাহসের কাজ, কোনো ভীরু, দুর্বল ও কাপুরুষের পক্ষে দাওয়াতের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। অস্থির ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী যারা, তাদের পক্ষে মানুষের কাছে মহাসত্যের দাওয়াত পৌছানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, নিজের প্রাণের মায়া

www.pathagar.com

বিসর্জন দিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন কবুল করে অকুতোভয়ে রাসূলের সাহবায়ে কেরাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা পৃথিবী থেকে যাদেরকে বিদায় করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

পৃথিবীর বড় বড় রাজা-বাদশাহ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধিকারী সেনাপতিদের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের ওপরে চোখ রেখে নির্ভীক চিত্তে তাঁরা 'হক'-এর দাওয়াত পেশ করেছেন। দৃঢ়পদে এবং অকম্পিত কণ্ঠে আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তদানীন্তন যুগে সমকালীন বিশ্বে ফেরাউন ও নমরুদের মতো শক্তিধর ও সামরিক শক্তির অধিকারী দ্বিতীয় কোনো শাসকের অস্তিত্ব ছিলো না। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম গ্রেফতারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে সেই ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তার চোখের ওপরে চোখ রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, 'তুমি জুলুম করছো, এই জুলুম ত্যাগ করে সেই আল্লাহর গোলামী করো–যিনি তোমার আমার এবং গোটা বিশ্বলোকের রব।'

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও দোর্দন্ড প্রতাপশালী নমরুদের দরবারে একই কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। প্রত্যেক নবী রাসূলই সমকালীন যুগের শাসকদের সামনে একই ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের সাহাবায়ে কেরামও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেই 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন। প্রত্যেক যুগেই মহান আল্লাহর দ্বীনের দিকে যারাই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, দুর্বলতা-কাপুরুষতা, লোকলজ্জা, দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্তহীনতা ইত্যাদির ঊর্ধ্বে অবস্থান করেই 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন।

'হক'-এর সন্ধান যারা পায়নি, তারা মহাক্ষতির দিকে বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হচ্ছে। 'হক'-এর দাওয়াত বঞ্চিত মানুষগুলো সাগরের অথৈ জলে নিমজ্জিত, সর্বগ্রাসী হুতাশনে পরিবেষ্টিত, হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে বিপদগ্রস্ত, ছায়া ও খাদ্য পানিহীন উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে তারা মৃতবৎ–এদেরকে এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার মানেই হলো তাদের কাছে 'হক'-এর দাওয়াত পৌছানো। মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মালায় নিমজ্জিত লোকগুলোর প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টাকারীকে উত্তাল তরঙ্গের সাথে লড়াই করেই ডুবন্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে হয়। সর্বগ্রাসী অগ্নি শিখায় পরিবেষ্টিত মানুষগুলোকে যারা উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়, প্রজ্জ্বলিত অনলের প্রচন্ড তাপকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যেতে হয়। ঘন তমসাবৃত যামিনী দুর্গম গিরি কান্তার মরুর যাত্রীদের দৃষ্টিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে কিন্তু অগ্রসরমান যাত্রী তার যাত্রা

www.pathagar.com

ক্ষণিকের জন্যও স্থগিত করে না। কারণ অন্ধকার পথের পথিকের জানা থাকে যে, অন্ধকার যতো বেশী গভীর হবে পূর্ব দিগন্তে নবারুণের আগমনী বার্তা ততোই জোরে ঘোষিত হতে থাকবে।

অন্ধকারের সূচীভেদ্য আবরণ ভেদ করে সাহসী যাত্রীরা সম্মুখপানে অগ্রসর হলে পূর্ব নীলিমায় তরুণ তপন উদিত হয়ে গোটা ধরণীকে যখন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে তখন তমসাবৃত যামিনীর তেজোদীপ্ত দুর্বিনীত যাত্রীদের পথের যাবতীয় বাধা স্বাভাবিকভাবেই অপসৃত হয়। পথিক তার গন্তব্যস্থলে পৌছতে পথিমধ্যে বাধার অলংঘনীয় বিন্ধ্যাচলের দিকে হাতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছতে ব্যর্থ হবে। লক্ষ্যস্থল যদি যোজন যোজন দূরে অবস্থিত হয় আর পথের দূরত্বের দুর্ভাবনায় পথিক যদি যাত্রা পথে কদম উঠানোর পূর্বেই মনের ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে সে পথিক তার কাংখিত স্থানে পৌছতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি হিমশীতল শুভ্র তুষার আবৃত পর্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গ বিজয় আকাংখায় যারা মনস্থির করেছেন তারা শৃঙ্গ আরোহন পথে প্রতি পদক্ষেপে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শীতল হাতছানিকে নির্মম পায়ে পদদলিত করেই তাদের লক্ষ্যস্থলে দৃঢ়পদে পৌছতে সক্ষম হন।

সূর্যের প্রচন্ড কিরণে উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর যাদেরকে অতিক্রম করতে হবে, মরুভূমির বিশালতা দেখে ঘাবড়ালে তা অতিক্রম করা যাবে না। ভয়াল জলধির উত্তাল ঊর্মিমালার হিংস্র কিরীটে পদাঘাত করে যারা যাত্রা আরম্ভ করেছেন, তারাই কেবল পৃথিবীর দেশ-মহাদেশের অবস্থান নিরূপন করতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীব্যাপী মিথ্যার বিজয় ভেরীর উচ্চ নিনাদে যারা কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে মসজিদ ও খানকার চার দেয়ালের মধ্যে আত্মরক্ষা করে তাদের পক্ষে মহাসত্যের দুন্দুভী বাজানো অসম্ভব। গাজী অথবা শাহাদাতের দুর্দমনীয় উগ্র কামনা হৃদয়ে যারা পোষণ করে তারাই কেবল মহাসত্যের দুন্দুভীতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুতরাং মহাসত্যের প্রতি যারা আহ্বান জানাবেন, 'হক'-এর দাওয়াত যারা দেবেন, তাদেরকে দুঃসাহসী হতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে যারা নিজের হাত-পায়ের শৃংখল ও কণ্ঠের জিঞ্জির মনে করে, সত্য প্রকাশের কাজের মধ্যে যারা নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি দেখতে পায়, তাদের পক্ষে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার কাজ কোনো ভীরু-কাপুরুষের কাজ নয়, দুর্বল চিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকারী লোকদের কাজ নয়, কুকুরের চিৎকারেই যাদের

www.pathagar.com

হৃদকম্পন শুরু হয়, এ কাজ তাদেরও নয়। এ কাজ কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের ধন-সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সর্বপরি নিজের প্রাণকেও বাজি রাখতে প্রস্তুত। যে ব্যক্তি সংখ্যাধিক্যের পরোয়া করে না এবং একা হলেও অকম্পিত কণ্ঠে 'হক' উচ্চারণ করার মতো হিম্মত রাখে।

দৈহিক নির্যাতন, সামাজিকভাবে অপদস্থ হওয়া, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করা, জান-মালের ক্ষতি স্বীকারে যারা প্রস্তুত রয়েছে, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরী ও ফাঁসীর মঞ্চকে স্বাগত জানাতে যারা দন্ডায়মান, কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই 'হক'-এর পক্ষে সক্রিয়ভাবে ময়দানে ভূমিকা রাখা এবং 'হক' উচ্চারণ করা সম্ভব। কারো রক্তচক্ষু, গর্জন আর নির্মম চাবুকের নৃত্য দেখে এবং গোটা পৃথিবীর মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজের কৌশল পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু এই কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কোনো সুযোগ নেই। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে এ কথা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে যে, গোটা বিশ্বলোকের রাজাধিরাজ সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। দাওয়াত দানকারী ময়দানে একা-নিঃসঙ্গ নন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَاتَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى–

তোমরা ভয় পেয়ো না, শঙ্কিত হয়ো না, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি শুনছি এবং দেখছি। (সূরা ত্বা-হা-৪৬)

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেন, মহান আল্লাহ তার সাথে থাকেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা যখন সাহায্য প্রেরণের প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখনই তিনি সাহায্য প্রেরণ করবেন। আর যারা 'হক'-এর বিরোধিতা করবে, তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ মহান আল্লাহই করবেন। অতএব কোনো শক্তির পরোয়া না করে 'হক'-এর দাওয়াত দিতে হবে। প্রতিকুল পরিবেশে নির্ভীক চিত্তে দাওয়াতী কাজ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে আদেশ দিয়েছিলেন–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُوَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ، اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ–

হে নবী! আপনাকে যে বিষয়ের আদেশ দেয়া হচ্ছে তা সরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং শির্ককারীদের মোটেও পরোয়া করবেন না। যেসব বিদ্রুপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা হিজর-৯৪-৯৫)

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেবেন, তাকে অবশ্যই অটুট মনোবলের অধিকারী হতে হবে। মহান আল্লাহ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। দাওয়াত দেয়ার কাজে যারা বাধার সৃষ্টি করে, মহান আল্লাহর শক্তির মোকাবেলায় তারা মাছির পাখার অনুরূপও নয়, এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের ছাপ হৃদয় ও মন-মগযে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও মহানত্বের সুস্পষ্ট ছাপ যার মন-মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একমাত্র তার পক্ষেই একাকী গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে বুক টান করে বিরোধিদের মোকাবেলায় দন্ডায়মান হওয়া সম্ভব।

দ্বীনে হক-এর দাওয়াত দানকারীকে নির্লোভী হতে হবে

'হক' প্রতিষ্ঠার ময়দানে ব্যক্তিত্বহীন লোকজন অচল মুদ্রার অনুরূপ। এদের পক্ষে কোনো ব্যাপারেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করা, দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, প্রতিকুল ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান করা, বিরোধিদের আক্রমনের মোকাবেলায় উপস্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যাবতীয় লোভ-লালসা প্রত্যাখ্যান করে নিজ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অনমনীয় থাকা ব্যক্তিত্বহীন লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই ধরনের লোকগুলো সাধারণ মানুষের কাছে নিজ চরিত্রে বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করলেও এদের ব্যক্তিত্বের থলে প্রকৃতপক্ষে শূন্য এবং এই শূন্যতা বিরোধিদের পক্ষের চতুর লোকদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। তারা এ কথা ভালো করে বোঝে, লোকটি মুখে যা দাবি করে, সে দাবির সাথে তার অন্তরে দৃঢ়তা নেই। ভয়-ভীতি বা পার্থিব লোভ-লালসার কাছে সে লোকটি নিজেকে সোপর্দ করে দেবে। সুতরাং 'হক' বিরোধী লোকদের কাছে 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং অনমনীয় হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَايَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ–

যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে। (সূরা রূম-৬০)

www.pathagar.com

বিরোধী পক্ষ 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে যেন দুর্বল বা ব্যক্তিত্বহীন মনে না করে। তারা একটা বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করলো অথবা নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলো, নিন্দা আর অপবাদের ঝড় তুললো, 'হক'-এর প্রতি আহ্বানকারীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে থাকলো আর অমনি 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারী মনোবল হারিয়ে ফেললো, উৎসাহ-উদ্দীপনা তার ভেতর থেকে বিদায় নিলো, দাওয়াতী কাজের ময়দান ত্যাগ করে ঘরে নিশ্চুপ বসে রইলো, দাওয়াত পেশকারী যেন এমন হালকা ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হয়।

দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য 'হক' বিরোধিরা নানা ধরনের লোভ-লালসা প্রদর্শন করবে, উচ্চপদ, সম্মান-মর্যাদা, পার্থিব দিক থেকে অঢেল সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিতে চাইবে। জাতীয় সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে 'হক'পন্থীদেরকে সাময়িকের জন্য হলেও আপোষের পথে পরিচালিত হবার অনুরোধ করবে, এসব কিছুর মাথায় পদাঘাত করে 'হক'-এর দাওয়াতী অব্যাহত গতিতে চালাতে হবে। নিজেদেরকে উদ্দেশ্য সচেতন হতে হবে, লক্ষ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের বিশ্বাস ও ঈমানে সর্বাধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্কল্পে দৃঢ়চেতা হতে হবে এবং আমলে সালেহ্‌র বর্মে নিজ চরিত্র দুর্ভেদ্যভাবে পরিবেষ্টিত করতে হবে।

বিরোধী পক্ষ যেন এ কথা অনুভব করতে পারে, এই লোকগুলোকে ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা প্রদর্শন করে তাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। কোনো প্রতারণা- প্রবঞ্চনার কূটজালে এদেরকে বন্দী করা যাবে না। কোনো মূল্যেই এদেরকে ক্রয় করে মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না। কোনে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবতে ফেলে, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে, পত্র-পত্রিকায় এদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এদেরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না। প্রয়োজনে এরা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু মচ্‌কাবে না। এরা আপোষের চোরাগলিতে হারিয়ে যায় না। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর প্রতি ছুড়ে দেয়া যে কোনো অস্ত্রই ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হতে পারে, এ ধরনের ব্যক্তিত্বই তাকে গড়তে হবে, আর এই ব্যক্তিত্ব গড়ার একমাত্র সহায়ক শক্তি হলো ঈমান ও আমলে সালেহ্।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর এই ব্যক্তিত্ব দেখে সাধারণ মানুষ যখন এ কথা অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, এই ব্যক্তি মুখে ও লেখনীর মাধ্যমে যে কথার দিকে, যে আদর্শের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, সেই কথা ও আদর্শের ব্যাপারে লোকটি প্রকৃত অর্থেই আন্তরিক। কারণ লোকটি সেই আদর্শ সর্বপ্রথমে নিজ জীবনে

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন করেছে, সে যে কথার দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে, লোকটি সেই কথাগুলো প্রত্যেক পদে স্বয়ং অনুসরণ করছে। সুতরাং লোকটি যা বলছে তা অবশ্যই সত্য এবং কল্যাণকর। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সাধারণ মানুষের ভেতরে ঐ অনুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস চালানোর লক্ষ্যে আমলে সালেহ্র বর্মে নিজেকে সর্বপ্রথম আবৃত করতে হবে। তাহলে ইনশাল্লাহ্ তার দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে মানুষের ভেতরে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে পার্থিব লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে এর বিনিময় আশা করা যাবে না। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, 'হক'-এর দাওয়াত বিক্রয় যোগ্য কোনো পণ্যের নাম নয়। এই কাজ করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। প্রত্যেক নবী-রাসূল যখন তাঁদের জাতির কাছে হকের দাওয়াত দিয়েছেন, তখন তাঁরা জাতিকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে-

وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا، اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ-

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে দাওয়াতের কোনো বিনিময় কামনা করি না। আমার কাজের বিনিময় আমার আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। (সূরা হূদ-৫১)

দ্বীনে হক-এর দাওয়াত দানকারী আল্লাহকে সাহায্য করে

মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবায়ন করে একজন মানুষ আল্লাহ্ তা'য়ালার গোলাম হবার যোগ্যতা অর্জন করে। এই যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যেই মানব জীবনে সফলতা অর্জনের প্রথম দুটো গুণ–ঈমান ও আমলে সালেহ্র কথা আলোচ্য সূরায় সর্বপ্রথমে বলা হয়েছে। মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা, সফলতা অর্জন ও কল্যাণ লাভের জন্য সর্বপ্রথম ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর গোলাম হতে হবে। আর এই গোলাম হবার জন্যই ব্যক্তিকে ঈমান আনতে হবে এবং আমলে সালেহ্ করতে হবে। কিন্তু মহান আল্লাহর সাহচর্য, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা অর্জনের একমাত্র পথ হলো ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর সাহায্যকারী হতে হবে। মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ হিসাবে বর্তমান পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোকজন সাধারণ মানুষকে নানা পথপ্রদর্শন করে থাকে।

অমুক পীর সাহেবের মুরীদ হলে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ দেখিয়ে দেবেন, বছর ব্যাপী রোযা পালন করলে, গোটা জীবন ব্যাপী রাতের পর রাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করলে, অমুক দোয়া বা তস্‌বীহ্ দিনরাতের অমুক সময়

www.pathagar.com

সংখ্যায় এত বার জপ করলে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা যাবে–এসব কথা বলে ঈমানদারকে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে নফল নামায-রোযা অবশ্যই আদায় করতে হবে। কিন্তু সাথে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের জীবনীর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যে, তাঁরা কোনো পথ অবলম্বন করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মহান আল্লাহর সাহায্যকারী। আর আল্লাহর সাহায্যকারী যারা হয়, একমাত্র তাঁরাই পৃথিবীতে অবস্থান করেও আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থান করেন।

আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া বলতে কি বুঝায়, সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার কাজে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করবে এবং এই কাজে অংশগ্রহণ করার বিষয়টিকে আল্লাহ তা'য়ালা 'আল্লাহকে সাহায্য করা' বাক্যের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেই সাথে মানুষকে সত্য ও মিথ্যা পথও প্রদর্শন করেছেন। এখন মানুষ ইচ্ছা করলে সত্য ও মিথ্যা পথের যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের গায়েবী শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর কোনো নাফরমান বা বিদ্রোহী বান্দাকে তাঁর বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য করেন না।

গায়েবী শক্তি প্রয়োগ করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'য়ালা কিতাব অবতীর্ণ করে, যুক্তি, বিজ্ঞান ও উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে এ কথাই বুঝিয়ে থাকেন যে, 'আমার বিধান অনুসরণ করা বা না করার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়েছে। তুমি আমার নাফরমানী করতে পারো, আমাকে অস্বীকার করতে পারো, আমার বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করতে পারো। কিন্তু তোমার এই ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা থাকার পরও তোমার উচিত হলো, আমার গোলামী ও দাসত্ব করা। কারণ তোমাকে আমিই সৃষ্টি করে লালন-পালন করছি আর এ কাজে আমার সাথে অন্য কেউ-ই শরীক নেই। যদি তা না করো তাহলে তোমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর যদি আমার দাসত্ব কবুল করো, তার উত্তম বিনিময়ও আমি প্রদান করবো।'

এভাবে যুক্তি, বিজ্ঞান ও উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে মহাসত্যের পথে পরিচালিত করা হলো মহান আল্লাহর কাজ। কিন্তু এই কাজ তিনি স্বশরীরে আগমন করে বা বান্দাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে করেন না। তিনি নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করে এই কাজ করে থাকেন। মহান আল্লাহ সর্বশেষ এই কাজ করেছেন

www.pathagar.com

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। তাঁর বিদায়ের পরে এই কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর উম্মতদের ওপরে। সুতরাং কোনো মানুষ যখন অন্য মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালো, সেই ব্যক্তিই মহান আল্লাহর কাজে সাহায্য করলো। আর আল্লাহর কাজে যারা সাহায্য করে, একমাত্র তারাই মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে। 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া হলো আল্লাহর কাজে সাহায্য করা। যারা 'হক'-এর দাওয়াত দেন, মহান আল্লাহর ভাষায় তারাই হলো আল্লাহর সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ–

আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। (সূরা হজ্জ-৪০)

সাধারণ মানুষে স্বভাব হলো, কোনো ক্ষমতাবান লোকের সাথে যদি তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকে, তাহলে সে তা গর্বভরে প্রকাশ করে। এতে করে সে এ কথাই বুঝানোর চেষ্টা করে যে, অমুক ক্ষমতাবান লোকের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং আমার সাথে কোনো অন্যায় আচরণ বা অশোভনীয় ব্যবহার করার পূর্বে সতর্ক হওয়া উচিত, আমার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, এ কথা ঐ ক্ষমতাবান লোকটি জানতে পারলে তিনি এর কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

ক্ষমতাবান ও সম্মান-মর্যাদার অধিকারী লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার ব্যাপারে সাধারণ লোকজন আগ্রহ পোষণ করে, তাদের কোনো খেদমত করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু যে কাজটি করলে এই মহাবিশ্বের মালিক সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা যাবে, তাঁর সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা অর্জন করা যাবে, তাঁর বন্ধুত্ব ও সাহায্য পাওয়া যাবে, সেই কাজটি থেকে একশ্রেণীর ঈমানদার দুঃখজনকভাবে নিজেকে বিরত রেখেছে। সেই কাজটি হলো 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া। 'আমি মহান আল্লাহর সাহায্যকারী' এর থেকে অহঙ্কার ও গর্বের বিষয় মানুষের জন্য আর কি হতে পারে! সুতরাং 'হক'-এর দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছাতে হবে আর এ পথেই নিজেকে 'আল্লাহর সাহায্যকারী'দের দলে শামিল করতে হবে।

www.pathagar.com

দ্বীনে হক-এর দাওয়াত দানকারীকে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেবেন, তিনি যে বিষয়ে অন্য মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন, সে বিষয়ে তাকে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে। শ্রুতি মধুর ভাষায়, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে দাওয়াত দিতে হবে। 'হক'-এর দাওয়াত কিভাবে দিতে হবে, সে পন্থাও মহান আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ–

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রব-এর পথের দিকে দাওয়াত দিন এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। (সূরা নাহল-১২৫)

যাকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, দাওয়াত দানকারী সর্বপ্রথমে তার মন মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। রোগী কোন্ রোগে আক্রান্ত, তা যদি ডাক্তার সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার যাবতীয় চিকিৎসাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, কোন প্রক্রিয়ায় দাওয়াত দিলে সেই ব্যক্তি 'হক'-এর কথাগুলো চম্বুকের মতোই গ্রহণ করবে এবং তার ভেতরে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে। যারা ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে হবে-তার সামনে শ্রোতাদের ধরন কেমন। তিনি কোন্ ধরনের শ্রোতাদের সামনে কথা বলছেন, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

শ্রোতা কোন্ ধরনের কথা ধারন করার উপযুক্ত, তার মন-মানসিকতা কথা শোনার অনুকূলে রয়েছে কিনা, তা অনুধাবন করে 'হক'-এর দাওয়াত দিতে হবে। মানুষ কেউ-ই সমস্যা মুক্ত নয়, সর্বোত্তম কথাও সমস্যার ভারে আক্রান্ত মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটিয়ে ভদ্রতার খাতিরে কথা শুনতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তার মনে ভিন্ন চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। দাওয়াত দানকারীর কথার প্রতি সে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। দাওয়াত দেয়ার জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ

www.pathagar.com

করতে হবে। মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছে, রোগ যন্ত্রণায় অস্থির রয়েছে, জরুরী কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়ে কোথাও তার যাওয়া প্রয়োজন, এসব দিকে দৃষ্টি রেখে সঠিক সময় নির্ধারণ করে 'হক'-এর দাওয়াত পেশ করতে হবে। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় দাওয়াত দিলে তা কার্যকর হবে, সেই অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে জটিল কোনো বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বা কথা এগিয়ে যেতে হবে। শ্রোতা যদি অনুভব করে যে, লোকটি তার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, তাহলে তার মনে দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। সুতরাং এমন কোনো আচরণ বা কথা বলা যাবে না, যা শ্রোতাকে দাওয়াত গ্রহণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতা এ কথাই যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, লোকটি প্রকৃতপক্ষেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক। 'আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে পরিচালিত করার জন্য লোকটি আন্তরিকতার সাথেই আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, লোকটি সত্যিকার অর্থেই আমার কল্যাণকামী'—দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতার মনে এই ধারণা সৃষ্টি হলে দাওয়াতী কাজে অতি সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়।

শ্রোতার ব্যক্তিত্বে, অহংবোধে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং বিষয়েরও অবতারণা করা যাবে না। দাওয়াত দেয়ার, বলার ও উপস্থাপনের ধরন হতে হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যেন শ্রোতা অতি সহজেই কথকের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটা একটি সাধারণ বিষয় যে, মিষ্টভাষী ও বিনম্র লোকদের প্রতি অন্যান্য লোকজন সহজেই আকৃষ্ট হয়। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে এসব বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। শ্রোতা যে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, সেই ভ্রান্তি দূর করার জন্য সরাসরি আঘাত করা যাবে না। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে শ্রোতার মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, সত্যই তিনি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। দাওয়াত দানকারী যখন এ কথা অনুভব করবেন, শ্রোতা অযথা বিতর্ক সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনই কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে সর্বোত্তম পন্থায় তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

যার কাছে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, সে ব্যক্তি যদি ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করার মতো কোনো কথা বলে, তাহলে দাওয়াত দানকারীকে অসীম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিপক্ষ যতো অপসন্দনীয় ও বিরক্তি সৃষ্টিকারী কথাই

www.pathagar.com

উচ্চারণ করুক না কোনো, এর মোকাবেলা সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে করতে হবে। মন্দের জবাবে মন্দ বা নোংরামীর জবাব নোংরামী দিয়ে দেয়া 'হক'-এর বিপরীত কাজ। ধীর স্থির মস্তিষ্কে ঠান্ডা মাথায় প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলতে হবে এবং তার খারাপ আচরণের অনুরূপ খারাপ আচরণ করা যাবে না। যার কাছে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তার আচরণ আর দাওয়াত দানকারীর আচরণ যদি সমমানের হয়, তাহলে দাওয়াতের কাজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী যে কোনো ধরনের অশোভন আচরণ সর্বোত্তম ভদ্রতার মাধ্যমে এড়িয়ে যেতে হবে। কোরআন এভাবে শিক্ষা দিচ্ছে–

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ–

এসব লোকদের অশোভন আচরণকে ভদ্রভাবে উপেক্ষা করে যাও। (সূরা হিজর-৮৫)

'হক'-এর দাওয়াতের ময়দানে শয়তান সবথেকে বেশী সক্রিয় থাকে। একজন লোক যখন 'হক'-এর দাওয়াত গ্রহণ করে, তখন শয়তানের অনুচরের সংখ্যা হ্রাস পায়। আর মানুষ যেন কোনো ভাবেই সত্য গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, শয়তান এদিকেই অধিক তৎপর থাকে।

এ জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সতর্ক থাকতে হবে, তিনি যাকে দাওয়াত দিচ্ছেন, কোনোক্রমেই যেন তার সাথে কোনো একটি দিক দিয়েও তিক্ততার সৃষ্টি না হয়। শ্রোতার কথায় অনেক সময় মন-মানসিকতা উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য ধারন করতে হবে। দাওয়াত দানকারীকে উপলব্ধি করতে হবে যে, শয়তান তার প্রতি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তাকে মহান আল্লাহর দরবারে আশ্রয় কামনা করতে হবে। (বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী আমপারা সূরা ফালাক ও নাসের তাফসীর পাঠ করুন।)

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সর্বক্ষেত্রে কোরআনের যুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে এবং শ্রোতাকে কোরআনের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। এ ব্যাপারে তিরমিযী হাদীসে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা এসেছে এভাবে–

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلَى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ–

www.pathagar.com

এই কোরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করবে, সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায় বিচার করবে। যে এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সে সহজ-সরল পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।'

অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে যারা কোরআন থেকে যুক্তি পেশ করে কথা বলে, তাদের কথার মধ্যেই সত্যতা বিদ্যমান থাকে। জীবনের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে যারা কোরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে যারা কোরআনের দেয়া রায় অনুসারে বিচার ফায়সালা করে, তাদের বিচারই ন্যায় বিচার হয়ে থাকে। আর কোরআন নির্দেশিত পথের দিকে যারা আহ্বান করে, তারাই সবথেকে সত্য-সুন্দর ও কল্যাণময় পথের দিকে আহ্বান করে।

দ্বীনে হক বিরোধিদের ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা

আমরা ইতোপূর্বে গাধা ও খাসীর গল্পের অবতারণা করে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, খাসীর যত্ন তার মালিক এ জন্য বৃদ্ধি করেছে যে, কোরবানীর চাঁদ উঠেছে এবং তাকে কোরবানী করা হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ বিরোধী লোকদেরকে তাদের ঈমানহীন সৎকাজের বিনিময় হিসাবে এই পৃথিবীতে অধিক ধন-ঐশ্বর্য্য দান করা হয়েছে এ কারণে যে, তাদের সৎকাজ বা আমলে সালেহ্‌র পেছনে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না বিধায় তাদের পাওনা এই পৃথিবীতেই পরিশোধ করা হয়েছে। এভাবে করে অতীত যুগে ফেরাউন, নমরুদ এবং তাদের অনুরূপ প্রত্যেক যুগে যারা ভূমিকা পালন করেছে, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পৃথিবীতে সম্পদশালী করেছেন। তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে শান শওকত, চাকচিক্য ও অর্থ-সম্পদ দেয়া হয়েছে। যারাই মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের ভূমিকা পালন করছে, তাদেরকে এভাবেই পৃথিবীতে কর্মের বিনিময়ে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে।

'হক' বিরোধী লোকদের এই চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দেখে এক শ্রেণীর দুর্বল ঈমানের লোকগুলো দ্বীনে হক সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এরা প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কল্যাণ ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে না, তারা ইসলাম বিরোধী আদর্শের মোকাবেলায় দ্বীনে হক-এর দুর্বলতা আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোর ক্রমাগত অসফলতা এবং ইসলাম বিরোধিদের চাকচিক্যপূর্ণ ও জাঁকজক এবং পার্থিব নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দেখে

www.pathagar.com

ধারনা করে যে, আল্লাহ্ বিরোধী লোকগুলোই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব অর্জন করুক, তারাই সর্বত্র সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক, প্রভাব বিস্তার করুক আর যারা 'হক'-এর দাওয়াত দেয়, তারা তারা দুর্বল ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে থাক, এটাই মহান আল্লাহর অভিপ্রায়।

কারণ ইসলাম বিরোধী শক্তির বাহ্যিক চাকচিক্য, জাঁকজমক ও সাজ-সজ্জা, সভ্যতা, সংস্কৃতির সৌন্দর্য, উন্নতি-অগ্রগতির কারণে পৃথিবীর মানুষ তাদের অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা অনুসরণ করতে থাকে। তারা উপায়-উপদানের প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের নীতি-আদর্শ ও কর্ম কৌশলকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে পৃথিবীতে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীরা নিজেদের কর্ম কৌশল বাস্তবায়ন করার তেমন কোনো উপায়-উপাদান পাচ্ছে না, এদের লোকবল নেই, অর্থবল নেই, প্রচার যন্ত্র নেই, কোনো কিছুরই প্রাচুর্যতা নেই। ব্যক্তি জীবনেও এরা দারিদ্রতার সমুদ্রে নিমজ্জিত। আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাই এটা। তিনি হকপন্থীদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখবেন।

দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকগুলো এই অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে 'হক' তথা মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এখন বরং নামায-রোযা, কোরআন তিলাওয়াত ও তসবীহ্ জপার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী পরিবেশে জীবন যাপন করাই যুক্তি সংগত। এই ধরনের অমূলক চিন্তা-ভাবনা যারা করে, তারা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকগুলোর অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন–

فَاسْتَقِيْمَا وَلاَ تَتَّبِعنّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

নিজ কর্মপন্থার ওপরে দৃঢ়-মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না। (সূরা ইউনুস-৮৯)

দ্বীনে হক বিরোধী, মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে যারা জীবন-যাপন করে না তাদের অঢেল ধন-সম্পদ দেখে 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী নিজের অভাব ও দারিদ্রতার কথা স্মরণ করে ক্ষণিকের জন্যও মনোক্ষুন্ন হবে না। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আখিরাতের জীবনে সর্বোত্তম বিনিময় দান করবেন আর ঐ লোকগুলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল করবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلى مَامَتَّعْنَا بِه اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ–

আমি তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পৃথিবীতে যে সম্পদ দিয়েছি সেদিকে তুমি চোখ উঠিয়ে দেখো না এবং তাদের অবস্থা দেখে মনোক্ষুন্ন হয়ো না। (সূরা হিজ্‌র-৮৮)

আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করেন এবং না দিয়েও পরীক্ষা করেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে একজন লোক ছিলো, পবিত্র কোরআন যাকে 'কারূণ' নামে উল্লেখ করেছে। এই লোকটি নিজ জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছিলো। সরকারী অনুকম্পা লাভ করে এই ব্যক্তি বিপুল ধন-ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েছিলো। তার ইতিহাস আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسى فَبَغى عَلَيْهِمْ–وَاتَيْنهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَه لَتَنُوْاُ بِالْعُصْبَةِ اُوْلِى الْقُوَّةِ–اِذْ قَالَ لَه قَوْمُه لاَ تَفْرَحْ اِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ–وَابْتَغِ فِيْمَا اتكَ اللّهُ الدَّارَ الاخِرَةَ وَلاَتَنْس نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الاَرْضِ–اِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ–

এ কথা সত্য, কারূণ ছিলো মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো। একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, 'অহঙ্কার করো না, আল্লাহ্ অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ্ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরী করার কথা চিন্তা করো এবং পৃথিবী থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা কাসাস-৭৬-৭৭)

www.pathagar.com

নিজ জাতির সাথে বিশ্বাঘাতকতা করে কারুণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনে ব্যস্ত ছিলো। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ফেরাউন তাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে লোকটি তৎকালীন যুগে শ্রেষ্ঠ ধনকুবের-এ পরিণত হয়েছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত থেকে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দিলেন, তখন লোকটি আপন রব মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে দম্ভভরে জবাব দিয়েছিলো–

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُه عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ–

এতে সে বললো, 'এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা, কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছি। কেউ আমাকে অনুগ্রহ করে এসব দান করেনি। এই দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লোক এবং তার অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِه مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا، وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ–

সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিলো? অপরাধী দেরকে তো তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না। (সূরা কাসাস-৭৮)

ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অহঙ্কারে যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের ঐসব গোষ্ঠীর ধ্বংসের ইতিহাস জানা উচিত, যারা তার তুলনায় অনেক গুণ বেশী অর্থ-সম্পদ ও শক্তির অধিকারী ছিলো। অহঙ্কারের পদভারে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মহান আল্লাহ্ পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা যখন অপরাধীদের ওপরে আযাবের চাবুক হানেন, তখন তাদেরকে এ কথা বলা হয় না যে, 'তোমরা অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিলে, এই কারণে তোমাদের ওপরে আঘাত হানা হচ্ছে।' বরং আচমকা তাদের ওপরে আযাবের চাবুক হানা হয়।

www.pathagar.com

কারুণের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে এক শ্রেণীর লোভী লোকজন মনে করতো, লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। নিজেদের ধন-সম্পদ না থাকার কারণে তারা আক্ষেপ করতো। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শোনাচ্ছেন–

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ–

একদিন সে (কারুণ) তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা পৃথিবীর জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিলো তারা তাকে দেখে বললো, 'আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরা পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।' (সূরা কাসাস-৭৯)

সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড যাদের জানা ছিল না বা যারা পৃথিবীর জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়াকেই প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করতো, তারা ধারণা করতো, কারুণ বড়ই সফল ব্যক্তি–লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। তারা আক্ষেপ করে বলতো, আমরাও যদি কারুণের অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতাম! ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এই মূর্খ লোকগুলোর মূর্খতা দেখে হকপন্থীরা তাদেরকে বলতো, 'তোমরা যাকে সফলতা বলে ধারণা করছো তা সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হলো মহান আল্লাহ্ প্রতি ঈমান আনা এবং আমলে সালেহ্ করা। আর ঈমান আনা ও আমলে সালেহ্ করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ধৈর্যশীল।' হকপন্থীরা কিভাবে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছিলো, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তা শোনাচ্ছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ–

কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলতে লাগলো, 'তোমাদের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না। (সূরা কাসাস-৮০)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পুরস্কার শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোর জন্যই নির্ধারিত যাদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা রয়েছে। বৈধ পন্থায় উপার্জন করার ব্যাপারে যারা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এই পথে দিন শেষে যদি তাদের ভাগ্যে একটি শুক্‌নো রুটি জোটে তবুও তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে আর যদি বৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়ে যায়, তবুও তারা মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ার সুযোগ দেখা দিলেও তারা অবৈধ পথের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে এবং প্রভাব বিস্তার করে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বৈধ পথে উপার্জন তা যতো সামান্যই হোক না কেনো, এতেই তারা তৃপ্তি লাভ করে।

পৃথিবীতে যারা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, তাদের শান-শওকত দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা-বাসনার জ্বালায় ব্যাকুল হবার পরিবর্তে ঐসব অবৈধ জাঁকজমকের প্রতি চোখ তুলে না তাকানো এবং ধীর স্থির মস্তিষ্কে এ কথা অনুধাবন করা যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই সর্বাধিক উত্তম যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক কারূণের ধন-সম্পদ দেখে যেসব লোক তার অনুরূপ ধন-সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলো, কারূণকে যারা সফল ব্যক্তি মনে করতো আল্লাহ তা'য়ালা খুব দ্রুত তাদের ধারণা পরিবর্তন করে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপর্যয় সৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করলো কারূণ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপরে আযাবের চাবুক হানা হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الاَرْضَ، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ، وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، لَوْ لاَ اَنْ مَّنَّ اللّهُ

عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، وَيْكَانَّه لاَ يُفْلِحُ الْكفِرُوْنَ–

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেললাম। তখন আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদা লাভের আকাংখা পোষণ করছিলো তারা বলতে লাগলো, 'আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুঁতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিলো না, কাফিররা সফলকাম হয় না। (সূরা কাসাস-৮১-৮২)

অর্থাৎ আমরা এই ভুলে নিমজ্জিত ছিলাম যে, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই হলো সফলতা। এ কারণে আমরা ধারণা করে ছিলাম যে কারূণ বিরাট সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দেখে আমাদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমরা আসল সত্য অনুধাবন করতে পারলাম যে, প্রকৃত সফলতা ভিন্ন জিনিস, যা আল্লাহ্ বিরোধিদের ভাগ্যে কখনো জোটে না।

'হক'-এর দাওয়াত যারা দেন, তারাও মানুষ এবং মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন। 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার পথ কন্টকাকীর্ণ পথ-এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে চলতে গেলে নানা ধরনের বিপদ-মুসিবতে নিমজ্জিত হতে হবে। নিন্দা, অপবাদ আর কটুবাক্য বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে। এতে করে ক্ষণিকের জন্য হলেও 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতায় বিসন্নতা ছেয়ে যেতে পারে। মনে এই চিন্তা জাগতে পারে যে, 'আমি যে লোকগুলোকে ধ্বংস আর ক্ষতির পথ থেকে ফিরিয়ে কল্যাণ আর সফলতার পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, সেই লোকগুলোই আমাকে এভাবে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জর্জরিত করছে।' মনে এই ধরনের চিন্তা জাগরুক হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূলও দাওয়াতের ময়দানে লোকদের কাছ থেকে এমন আঘাত পেতেন। তাঁর মনও ব্যথাভারাক্রান্ত হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার পথনির্দেশনা মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এভাবে দিয়েছেন–

وَلَقَدْنَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

আমি জানি, এরা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁরই সকাশে সিজ্‌দাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রব-এর বন্দেগী করে যেতে থাকো। (সূরা হিজ্‌র-৯৭-৯৯)

অর্থাৎ 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, নিন্দা-অপবাদ, কলঙ্ক হকপন্থীদের প্রতি ছুড়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার প্রচার করা হচ্ছে, তার মোকাবেলা করার শক্তি তারা একমাত্র নামায ও মহান আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে। নামায রোযা আদায়, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতা থেকে বিসন্নতা দূর করে প্রশান্তিতে ভরে দেবে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করবে, সাহসিকতা ও বীরত্ব সৃষ্টি করবে এবং 'হক'-এর দাওয়াত পেশকারীকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে, যার ফলশ্রুতিতে গোটা পৃথিবীর মানুষের ছুড়ে দেয়া নিন্দাবাদ, অপবাদ আর প্রতিরোধের মোকাবেলায় দাওয়াত দানকারী অটুট মনোবলের সাথে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। আর এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

সবক প্যড় ফির সাদাকাত কা, আদালাত কা, শাজাআ'ত কা
লিয়া জায়েগা কাম তুঝ্‌ছে দুনিয়া কি ইমামাত কা।

দীক্ষা নাও পুনরায় সততার, ন্যায়-পরায়ণতার ও বীরত্বের, তাহলে এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার কাজটি তোমাকে দিয়েই সম্পন্ন হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ধৈর্যের ব্যাপক ও সামগ্রিক অর্থ

বাংলা শব্দ ধৈর্য্য এবং পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় যাকে 'সবর' বলা হয়েছে। এই 'সবর' শব্দটি পবিত্র কোরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দ বলে গবেষকগণ অভিহিত করেছেন। ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'ইয়াহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দিন' এ লিখেছেন, 'কোরআন মজীদে 'সবর' শব্দটি ৭০ বার বর্ণিত হয়েছে।'

ইমাম আবু তালিব মাক্কী (রাহঃ) তাঁর 'কুওয়াতুল কুলুব' কিতাবে লিখেছেন, 'সবরের তুলনায় উত্তম আর কিছুই নেই। পবিত্র কোরআনে সবর শব্দটি ৯০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আন্ নাহ্লের একই সাথে দুটো আয়াতে 'সবর' শব্দটি চার বার উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ–

যদি তোমরা কাউকে শাস্তি দাও তাহলে ঠিক ততোটুকুই শাস্তি দিবে যতোটুকু (অন্যায়) তোমাদের সাথে করা হয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো তাহলে (জেনে রেখো) ধৈর্য্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম। (হে নবী) আপনি (নির্যাতন নিপীড়নে) ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনার ধৈর্য্য (সম্ভব হবে) শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য দিয়েই, এদের (আচরণের) ওপর দুঃখ করবেন না, এরা যে সব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে আপনি মনোক্ষুন্ন হবেন না। (সূরা নাহ্ল, ১২৬-১২৭)

নবী করীম (সাঃ) মহান আল্লাহর কাছে যতো দোয়া করেছেন, তার অধিকাংশ দোয়ার মধ্যেই সবরের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যেমন 'আল্লাহুম্মাজ্ আ'লনি ছাবুরান অর্থাৎ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আপনি আমাকে ধৈর্য্য বা সবর দান করুন।' সুতরাং মুমিনের জীবনে সবর শ্রেষ্ঠ পাথেয়। যারা ইসলামী আন্দোলনে ওয়াদাবদ্ধ সবর তাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আল্লাহ তা'য়ালার একনিষ্ঠ গোলামদের জন্য সবরই হলো জান্নাতের সিঁড়ি।

ইসলাম তথা কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, তাদের চরিত্রে যে গুণটি থাকা সবথেকে বেশী অপরিহার্য, সে গুণটির নাম হলো ধৈর্য বা সবর। মানুষ যখন মিথ্যার বিপরীতে সত্যকে গ্রহণ করবে,

www.pathagar.com

পৃথিবীর যাবতীয় মিথ্যা আদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি ত্যাগ করে একমাত্র সত্য আল্লাহর বিধান গ্রহণ করবে, সেই অনুসারে জীবন চালাবে এবং এই বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যা শক্তি সত্যের বাহকদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। নানা ধরনের নির্যাতন, নিষ্পেষন, অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। এই অবস্থায় আল্লাহর বিধানের ওপর অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেবে। অসীম ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করে দ্বীনি আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেভাবে নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এগিয়ে গিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ধৈর্য তথা 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ঈমানদারদের গোটা জীবনই ধৈর্যের জীবন। ঈমানের পথে পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথেই তার ধৈর্যের পরীক্ষা শুর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা যেসব আদেশ দিয়েছেন, তা পালন করার ব্যাপারে ধৈর্যের প্রয়োজন। যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকার জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। নৈতিক অপরাধ ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা ও পরিহার করে চলাও ধৈর্যের প্রয়োজন। প্রতিটি পদে যে পাপের হাতছানি ও আকর্ষণ, তা থেকে দূরে অবস্থান করার জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। গভীর নিশীথে আরামের শয্যা ত্যাগ করে নামাজে দন্ডায়মান হওয়ার ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গেলে বৈষয়িক দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এ অবস্থায় পরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে গেলে বিপদ-আপদ, মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিকে আলিঙ্গন করতে হয়, এসব ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য ব্যতীত সফল হওয়া যায় না এবং ঈমানও টিকিয়ে রাখা যায় না। ঈমান গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা থেকে শুরু করে নিজের পরিবারের লোকদের সাথে, সমাজের সাথে, দেশের প্রচলিত আইনের সাথে এবং শয়তানের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ না করলে ঈমানের ওপরে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে হিজরাত ও জিহাদের প্রয়োজন হয়। এ পর্যায়েও ধৈর্য নামক মহৎ গুণটির একান্ত প্রয়োজন। এই অবস্থায় একজন মুমিন একাকী বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তাকে প্রতি পদে পদে পরাজয় বরণ করার

ঝুঁকি থেকে যায়। সফলতা অর্জন করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য একটি মুমিন সমাজ বা দলের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ধৈর্যশীল হয়, সমস্ত লোকগুলো পরস্পরকে ধৈর্যের প্রেরণা দিতে থাকে এবং মহাপরীক্ষার সময় তার পেছনে শীশাঢালা প্রাচীরের মতোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ঈমানদারদের সমাজ–দল বা সমাজের ও দলের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

তখন সেই সমাজ বা দলের গতি হয় অপ্রতিরোধ্য এবং দুর্বার। এক দুর্বিনীত অদম্য শক্তিতে ধৈর্যশীলদের সেই দল আত্মপ্রকাশ করে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণের সমাহার যে দলের কর্মীদের মধ্যে ঘটবে, একমাত্র সেই দলের পক্ষেই সম্ভব দেশের বুক থেকে অন্যায় অবিচার আর অনাচার ও পাপাচার দূর করা। সেই দলকে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই বিজয় দান করবেন এবং দেশ ও জাতির নেতৃত্ব তাদেরকে দান করবেন। একদিন তাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণহীন শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

সবর বা ধৈর্যের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অভিধানে 'সবর' শব্দের অনেকগুলো অর্থ করা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'বিরত রাখা, বাধা দেয়া।' আবার কোনো ক্ষেত্রে এর অর্থ করা হয়েছে, 'ইচ্ছার দৃঢ়তা, সঙ্কল্পের পরিপক্কতা এবং এমন শক্তিকে প্রয়োগ করে লালসা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ করা, যার সাহায্যে একজন মানুষ নিজের প্রবৃত্তির তাড়না, কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ্র বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে বা দ্বীনি আন্দোলনের পথে বাহ্যিক বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও ...কতার বিরুদ্ধে না থেমে অব্যাহত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় যে শক্তির মাধ্যমে, তাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়।

যে কোনো ধরনের লোভ-লালসা এবং আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাবধারাকে সংযত রাখাও 'সবর'-এর অন্তর্গত। অহেতুক ব্যাকুলতা প্রকাশ না করা, তাড়াহুড়া না করা, বিপদ শঙ্কুল অবস্থা দেখে না ঘাবড়ানো, লোভ-লিপ্সা ও বাঞ্ছিত উত্তেজনা পরিহার করাও 'সবর'। ধীরস্থির মনোভাব সহকারে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সবরকারীদের অন্যতম গুণ। ঈমানদার ব্যক্তির সামনে বিপদ-আপদ ও কঠিন অবস্থা সম্মুখে এলে 'সবর' তার ভেতরে সচেতনতা সৃষ্টি করে দেয় এবং পদস্খলন থেকে তাকে মুক্ত রাখে। 'সবর' এমন একটি সুন্দর গুণ যে, তা উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থাতেও ক্রোধ ও রাগের তীব্রতা হ্রাস করে মানুষকে অবাঞ্ছনীয় কর্ম থেকে বিরত রাখে।

www.pathagar.com

বিপদের ঘন-ঘটা সমাচ্ছন্ন হয়ে এলেও এবং অবস্থার ক্রমিক অবনতি ঘটতে থাকলেও 'সবর' মানুষের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি ও জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত হওয়া থেকে হেফাজত করে। মানুষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অতি আগ্রহে দিশাহারা হয়ে অনেক সময় অপরিপক্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং সেই ব্যবস্থাকে সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকরী মনে করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। 'সবর' এমন একটি উত্তম গুণ যে, মানুষকে এই অবস্থায় নিপতিত হওয়া থেকে ঢালের ভূমিকা পালন করে।

নিতান্ত বৈষয়িক স্বার্থ, বড় অঙ্কের মুনাফা বা লাভ, ভোগ-বিলাস ও আত্মতৃপ্তির আকর্ষণ অনেক সময় মানুষকে লোভাতুর বানিয়ে দেয়। এই অবস্থায় নিপতিত হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং মন মানসিকতায় দুর্বলতা ছেয়ে যায়। 'সবর' এসব অবস্থা থেকে মানুষকে দূরে রেখে মূল লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে প্রত্যেক কদমে সবর করতে হয়। এই ময়দানে 'সবর' নামক গুণটির অভাব দেখা দিলে বা এই গুণের ভেতরে কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। আন্দোলনের সাথীদের সবার গুণ-বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চলাফেরা অনেক সময় পসন্দের বিপরীত হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাথীর কথাবার্তা ও আচার আচরণকে 'সবর' বা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হয়। ধৈর্যের অভাব ঘটলেও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটবে, পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে। 'সবর'-এর অভাবে নিজেদের মধ্যে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে প্রতিপক্ষের সামনে টিকে থাকা যাবে না এবং ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا، اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ–

হে ঈমানদারগণ! কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মোকাবেলা হয়, তখন দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়িয়ে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্য সহকারে সব কাজ আঞ্জাম দিও, নিশ্চিত আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনফাল-৪৫-৪৬)

www.pathagar.com

সর্বাবস্থায় সততার নীতি অবলম্বন করাও 'সবর'

পৃথিবীতে মৌসুম পরিবর্তন হয় এবং এর মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য বিরাট কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। শীতের মৌসুমে গোটা প্রকৃতিতেই পরিবর্তনের একটি ধারা বইতে থাকে। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মানুষ, সবার দেহেই পরিবর্তনের সেই বাতাস ছোঁয়া দিয়ে যায়। বিশেষ করে মানুষের ত্বকে শুষ্কতা বিরাজ করে। অধিকাংশ উদ্ভিদ জগতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। উদ্ভিদ তার শ্যামলিমা হারিয়ে শুষ্ক আকার ধারণ করে। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে উদ্ভিদ জীর্ণতা ও শুষ্কতার আক্রমণ প্রতিহত করে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সৃষ্টির শুরু থেকেই এভাবে সর্বত্র পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। কোনো কিছুই চিরদিন একই অবস্থায় বিরাজ করে না। মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো ব্যক্তি বা জাতির জীবনেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রূপে বিদ্যমান থাকে না। এর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং এটাই মহান আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নীতি।

এক শ্রেণীর মানুষের অবস্থা হলো, তাদের জীবনে যখন কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটে, তখন তারা অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তাদের ভঙ্গি থাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে পরিপূর্ণ। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করে, অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় ভাবতে থাকে। হাঁটা, চলাফেরা, ওঠা-বসায়, পোষাক-পরিচ্ছদে একটা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। পূর্বে সে কি ছিলো, কোন্ জীর্ণ দশা থেকে সে বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছে, এ কথা কল্পনা করার কষ্টটুকুও করতে চায় না। অহমিকা-দাম্ভিকতা, ক্ষমতা আর সম্পদের নেশায় সমস্ত কিছুকে নিজের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ করতে চায়।

পক্ষান্তরে এই অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটে, বিপদ-মুসিবত তাকে গ্রাস করে, ধন সম্পদ, অর্থ-বিত্ত হাত ছাড়া হয়ে যায়, তখন তারা হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। নিজের তকদিরকে ধিক্কার দিতে থাকে এবং আপন স্রষ্টার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর প্রতি অভিশাপ দিতেও এদের বিবেকে বাধে না। কিন্তু যারা ঈমানদার এবং সালেহ্কারী ধৈর্যশীল, তাদের অবস্থান এমন হয় না। তাদের জীবনে কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটলে তারা মহান আল্লাহ প্রতি অধিক মাত্রায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, গর্ব অহঙ্কারে তাদের বুক ফুলে ওঠে না। আবার হঠাৎ কোনো বিপদ-মুসিবত তাদের ওপর আপতিত হলেও তারা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে, পরম ধৈর্যের সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তারা সততার পথ অবলম্বন করে

www.pathagar.com

চলে। শুভ পরিবর্তনে গর্ব অহঙ্কারে ফেটে পড়া আর বিপদ মুসিবতে নিপতিত হলে হতাশাগ্রস্ত হওয়া, এই হীনতা ও নীচতা কেবলমাত্র তারাই মুক্ত, যারা 'সবর' নামক গুণ অর্জন করতে পেরেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন-

اُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ، اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ، وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ-

এই ত্রুটি থেকে কেবল সেই লোকেরাই মুক্ত, যারা ধৈর্য অবলম্বনকারী এবং নেক আমলকারী। আর তারাই এমন যে, ক্ষমা ও বড় পুরস্কার তাদেরই জন্য রয়েছে। (সূরা হূদ-১১)

যেসব ব্যক্তি বা জাতি কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজেদের মন-মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, সময়ের পরিবর্তন তথা শুভ পরিবর্তন ঘটলে সাথে সাথে নিজের কথা, চলাফেরা, ব্যবহারে ও মন-মানসিকতা পরিবর্তিত করে না, দাম্ভিকতা অহঙ্কার প্রকাশ করে না, সর্বাবস্থায় এক যুক্তিসঙ্গত, সতত ও সুস্থ আচরণ রক্ষা করে জীবন পরিচালনা করে, তারাও ধৈর্যশীলদের অন্তর্গত। অবস্থার অনুকূলে এবং অর্থ, ধন সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রশংসা-যশ ও জনবলের বিপুলতায় সামান্যতম অহঙ্কারের চিহ্নও প্রদর্শন করে না। আবার কোনো সময় বিপদ-মুসিবতে নিপতিত হয়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ববোধকেও বিনষ্ট করে না। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নে'মাতের রূপ ধারণ করেই আসুক অথবা বিপদ মুসিবতের রূপেই আগমন করুক, সর্বাবস্থায় তারা সততার নীতি অবলম্বন করে ধৈর্য ধারণ করে-এই লোকগুলোকে মহান আল্লাহ্ ধৈর্যশীল, আমলে সালেহ্কারী এবং ক্ষমা ও পুরস্কারের যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

ধৈর্য বা 'সবর' এমন এক দুর্লভ গুণ, এই গুণ যে ব্যক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে যেমন সফলতা অর্জন করতে পারে এবং পরকালের জীবনেও কল্যাণ লাভ করবে। এই গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা সর্বাবস্থায় সততার নীতি অবলম্বন করে থাকে। নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা তথা লালসা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিজেদের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ঝোঁক-প্রবণতাকে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। মহান আল্লাহর নিষেধমূলক কাজে, তাঁর অপসন্দনীয় কোনো কাজে তারা নিজেদেরকে জড়িত করে না। ঘুষ গ্রহণ করে অবৈধ পথে কাউকে কোনো সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দিলে,

www.pathagar.com

নৈতিকতা বিরোধী কোনো অবৈধ ব্যবসার সাথে নিজেকে জড়িত করলে প্রচুর অর্থ-বিত্তের অধিকারী হওয়া যায়, যাবতীয় অভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিলাসী জীবন যাপন করা যায়, এসব সুযোগ সামনে উপস্থিত দেখেও ঈমানদার মহান আল্লাহর নির্দেশে ধৈর্য অবলম্বন করে পার্থিব সুযোগ-সুবিধার মাথায় পদাঘাত করে। যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে গিয়ে পার্থিব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সম্মান মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, নিজের প্রভাব-প্রতিপতি হারিয়ে যায়, তবুও ধৈর্য অবলম্বন করে সততার পথেই অটল অবিচল থাকে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় এবং পরকালের চিরস্থায়ী শুভ ফলের আকাংখায় পৃথিবীতে যাবতীয় অবৈধ কর্ম থেকে আত্মসংযম করে, পাপ-অপরাধের দিকে নিজের প্রবৃত্তির তীব্র আকর্ষণ ও ঝোঁক প্রবণতাকে যারা 'সবর' নামক অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করে, এরা পরকালেও যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবে, তেমনি এই পৃথিবীতেও সাধারণ মানুষের কাছে সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সততার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের মানসিকতা বর্তমান অপরাধে নিমজ্জিত পৃথিবীতেও দেখা যায়। ঘুষখোর, অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী, আত্মসাৎকারী ও লোভী ব্যক্তিকে কেউ-ই সুদৃষ্টিতে দেখে না বা একান্ত বাধ্য না হলে কোনো মানুষ তার প্রশংসাও করে না। কিন্তু ধৈর্য অবলম্বন করে যারা এসব কাজের সুযোগ থাকার পরও অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সততাকে উচ্চে তুলে ধরে, সাধারণ মানুষের কাছে তারা সম্মান ও মর্যাদার পাত্রে পরিণত হন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সততা অবলম্বনকারী তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ–

তাদের অবস্থা এমন যে, নিজেদের রব-এর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তারা ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করতে থাকে আর অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুত পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট। (সূরা রা'দ-২২)

www.pathagar.com

অন্যায়ের মোকাবেলা ন্যায় দ্বারা করাও 'সবর'

অহঙ্কারী ও দাম্ভিক লোকগুলো সাধারণত অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। অন্যের কোনো আচরণ বা কথা পসন্দ না হলে সাথে সাথে অহঙ্কারী ব্যক্তি হীন আচরণ করে মনে মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে যে, 'সে-ও ছেড়ে কথা বলেনি, প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।' পথ চলতে অসতর্কতা বশতঃ কারো দেহের সাথে ধাক্কা লাগলে এই শ্রেণীর লোকগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অধীনস্থ লোকদেরকে কোনো কাজের আদেশ করা হয়েছে। সে কাজ করতে ভুল করলো অথবা কাজটি করতে একটু দেরী হয়ে গেলো। অহঙ্কারী ধৈর্যহীন লোকগুলো তৎক্ষণাত অধীনস্থদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে রূঢ় আচরণ করলো। অর্থাৎ এসব লোকদের মধ্যে ধৈর্যের বড়ই অভাব। ধৈর্যহীনতা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না, মানুষকে অকল্যাণের দিকেই নিক্ষেপ করে।

মহান আল্লাহর সন্তোষ অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা অন্যায়ের মোকাবেলা অন্যায় দিয়ে নয়–বরং ন্যায় ও পুণ্য কাজের মাধ্যমে করে। অপরাধের মোকাবেলা অপরাধ দিয়ে নয়, পাপের প্রতিবন্ধকতা পাপ দিয়ে নয়, সৎকাজ ও কল্যাণময় কাজের মাধ্যমে করে। ঈমানদার ধৈর্যশীল লোকদের ওপরে যারা জুলুম-অত্যাচার করে, তার জবাবে এরাও জুলুম-অত্যাচার করে না। তারা জুলুমের মোকাবেলা ইনসাফের মাধ্যমে করে। তাদের বিরুদ্ধে যতোই অশালীন ভাষা, মিথ্যাচার ও প্রচার মাধ্যমে অপবাদ ছড়ানো হোক না কেনো, এসবের জবাব দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলে তারা সততা ও শালীনতার মাধ্যমেই জবাব দিয়ে থাকে। কেউ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করলে তার সাথেও তারা অনুরূপ আচরণ করে না, বরং বিশ্বাসপরায়ণতাই প্রদর্শন করে।

মহান আল্লাহর সন্তোষ অনুসন্ধানে তৎপর ধৈর্যশীল লোকগুলো অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে করে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَاتَكُوْنُوْا اِمَّعَةً، تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْنَا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ، اِنْ اَحْسَنَ اَنْ النَّاسُ اِنْ تُحْسِنُوْ وَاِنْ اَسَاؤُ اَفَلَا تَظْلِمُوْا–

তোমরা নিজেদের কর্মনীতিকে অন্য লোকদের কর্মনীতির অনুসারী বানিও না। এমন বলা ঠিক নয় যে, লোকজন ভালো করলে আমরাও ভালো করবো আর

অন্যেরা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করবো, বরং তোমরা নিজেদের মন ও নফসকে এক নিয়মের অনুসারী বানাও। লোকজন সৎকর্ম করলে তোমরাও সৎকর্ম করবে আর লোকজন অন্যায় করলেও তোমরা জুলুম করবে না।

আরেকটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার মালিক মহান আল্লাহ্ আমাকে নয়টি কথার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে চারটি নির্দেশ এমন যে, (১) আমি কারো প্রতি সন্তুষ্ট হই কি অসন্তুষ্ট, সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথাই বলবো। (২) যে আমার হক আত্মসাৎ করবে আমি তার হক আদায় করবো। (৩) যে আমাকে বঞ্চিত করবে আমি তাকে দান করবো। (৪) যে আমার ওপর জুলুম করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'

উল্লেখিত হাদীসে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা সবই 'সবর' বা ধৈর্যের সাথে সম্পর্কিত। ধৈর্যহীন লোকদের পক্ষে মহান আল্লাহর নির্দেশসমূহ কোনোক্রমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।' মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, 'তোমার সাথে যে ব্যক্তি কারবার করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না, তাকে শাস্তি দানের উত্তম পন্থা এই যে, তুমি তার সাথে আল্লাহকে ভয় করে কারবার করবে।'

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর নীতি ছিল, তিনি সব সময় ক্ষমতাসীন লোকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। নিজের কোনো প্রয়োজনেই তিনি কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের কাছে ধর্ণা দেননি। কিন্তু তৎকালীন শাসকবর্গ কামনা করতেন, তাঁর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রের শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শাসকদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করতেন। তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন লোক ছিল পেশায় জুতার কারিগর। লোকটি প্রতিদিন রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে হট্টগোল করতো। এতে করে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) অসুবিধা অনুভব করলেও কখনো লোকটির প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করেননি।

একদিন রাতে তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রতিবেশী সেই লোকটির বাড়ি থেকে কোনো হট্টগোল শোনা যাচ্ছে না। দীর্ঘ দিন ধরে যা ঘটে আসছে, আজ তার ব্যতিক্রম দেখে তিনি প্রতিবেশীর বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, নেশাগ্রস্ত হয়ে হট্টগোল করার কারণে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লোকটিকে জেলখানায় বন্দী

www.pathagar.com

করেছে। তিনি কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলেন খলীফার দরবারে। যাঁকে অনুরোধ করেও খলীফার দরবারে আনা যায় না, সেই লোকটি স্বয়ং খলীফার দরবারে আসছেন, এটা দেখে খলীফা এবং তার সভাসদবৃন্দ অবাক হয়ে গেলেন। স্বয়ং খলীফা উঠে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বিনয়ের সাথে বললেন, 'আপনি কেনো কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছেন, আমাকে সংবাদ দিলে আমিই আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সাথে দেখা করতাম।'

ইমাম বললেন, 'আমি আমার নিজের কোনো প্রয়োজনে আপনার দরবারে আসিনি। আমার একজন প্রতিবেশী পেশায় জুতার কারিগর। মদপান করে হট্টগোল করেছে আর সে কারণেই আপনার লোকজন তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করেছে। আপনি অনুগ্রহ করে তাকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দিন।'

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) তাঁর মদ্যপ প্রতিবেশীকে মুক্ত করে আনলেন। দিনের পর দিন লোকটির বিরক্তকর আচরণ ইমাম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। বাড়িতে ইমাম নামাযে দাঁড়িয়েছেন অথবা গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করছেন, এমন সময় লোকটি নেশাগ্রস্ত হয়ে হৈ-চৈ করেছে। তিনি অসুবিধা অনুভব করেছেন কিন্তু কখনো লোকটিকে তিরস্কার করেননি। লোকটির যাবতীয় অন্যায় আচরণ তিনি পরম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। ইতিহাস কথা বলে, সেই দিনের পর থেকে লোকটি আর কখনো মদ স্পর্শ করেনি। সহিষ্ণুতার এটাই উত্তম বিনিময়। ইমামের ধৈর্য ঐ মদ্যপ লোকটিকে চিরদিনের জন্যই মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করাও 'সবর'

অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করাও 'সবর'–কথাটি বর্তমান অসহিষ্ণু পরিবেশে লালিত-পালিত এক শ্রেণীর মানুষের কাছে অভিনব মনে হতে পারে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, এই অস্ত্র প্রয়োগ করেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বর্বর জাতির ওপরে সার্বিক দিক দিয়ে প্রধান্য বিস্তার করে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ।' অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করার বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ، اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

www.pathagar.com

فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَه عَدَاوَةٌ كَاَنَّه وَلِىٌّ حَمِيْمٌ، وَمَا يُلَقّهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا، وَمَا يُلَقّهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ-

হে নবী! সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান নয়। আপনি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করবেন যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখবেন যার সাথে আপনার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না। (সূরা হামীম সিজ্‌দা- ৩৪-৩৫)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নবী এবং নবীর অনুসারীদেরকে মক্কায় কোন্ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়াতে নির্দেশ দিলেন যে, 'সৎকাজ এবং অসৎকাজ এক ধরনের নয়। অসৎকাজকে মিটিয়ে দিতে হবে সবথেকে উত্তম সৎকাজের মাধ্যমে।' শুধু তাই নয়, অসৎকাজকে সৎকাজের মাধ্যমে মোকাবেলা করলে এর শুভ পরিণাম কি হবে, সে কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 'তুমি দেখবে, যারা তোমাকে চরম শত্রু মনে করতো, তারা তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যাবে।' অসৎকাজকে সৎকাজের মাধ্যমে কারা মোকাবেলা করতে সক্ষম, তাদের গুণাবলীও জানিয়ে দিলেন যে, 'যারা অতিমাত্রায় ধৈর্যশীল, কেবল তাদের পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব।' এই কাজ যারা করবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, 'এরা হলো ভাগ্যবান এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।'

উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে মক্কার সেই পরিস্থিতি সামনে রাখতে হবে, যে পরিস্থিতিতে এই নির্দেশ আল্লাহর নবীর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ কথা আমরা ইতিহাস থেকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সে সময় মুসলমান হবার অর্থই ছিলো, অর্থই ছিলো নিজেকে ব্যঘ্র-সিংহ তথা হিংস্র বন্য প্রাণীর মুখে নিজেকে সোপর্দ করা। তখন যে ব্যক্তিই মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করতো, তখনই সহসা অনুভব করতো যেন সে হিংস্র শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করেছে আর হিংস্র প্রাণীগুলো দন্ত-নখর বিস্তার করে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য তার দিকে ছুটে আসছে। মুসলমান হবার কারণে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, রাস্তা-পথে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হচ্ছে, কোথাও প্রাণের নিরাপত্তা থাকছে না। এরপরেও মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ অবতীর্ণ হলো, 'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো, 'আমি মুসলমানদের একজন।'

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী নির্যাতনের এমন কোনো পন্থা নেই যা তারা প্রয়োগ করেনি। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূলের অনুমোদনক্রমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশত্যাগ করে ভিন্ন দেশে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেও তাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেয়া হয়নি। মক্কা থেকে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো সে দেশে গিয়ে সে দেশের শাসকবর্গকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। চরম হঠকারিতা ও আক্রমণাত্মক বিরোধিতার মাধ্যমে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা করা হচ্ছিলো। আর বিরোধিতার ক্ষেত্রে মানবতা, ভদ্রতা ও নৈতকতার সর্বশেষ সীমাও ধৃষ্টতার সাথে লঙ্ঘন করা হচ্ছিলো।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর প্রিয়-সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে স্বকপোলকল্পিত অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিলো। আল্লাহর রাসূলকে অপমান-অপদস্থ করা, তাঁর সম্পর্কে দেশ বিদেশের লোকদের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার লক্ষ্যে যাবতীয় উপায় উপকরণ ও কলা-কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছিলো। বর্তমান যুগে যেমন দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত সংগঠন ও এর সাথে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে সাম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সে যুগেও একদল লোককে এই দায়িত্ব দিয়েই ময়দানে সক্রিয় করা হয়েছিলো, যারা আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করবে।

শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে নির্যাতনের যতগুলো ঘৃণিত পন্থা সে সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিলো, তার সবগুলোই ইসলামপন্থীদের ওপরে নির্মমভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিলো। একদল লোককে রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যারা দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াতী কাজে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে যে কোনো ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করতো। রাসূল যখনই কোনো মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, বা কোনো সমাবেশে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের কথা বলতেন, অমনি সেখানে এমন হট্টগোল সৃষ্টি করা হতো, যেন সাধারণ মানুষ আল্লাহর দ্বীনের কথা শুনতে না পারে। এভাবে করে এমনই এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিলো যে, দাওয়াতী কাজের সফলতা সম্পর্কে হতাশা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো আশা পোষণ করার উপায় ছিলো না।

ঠিক এই পরিবেশে রাসূল ও তাঁর সাথীদেরকে মহান আল্লাহ দিক নির্দেশনা দিয়ে জানিয়ে দিলেন, প্রতিপক্ষ যে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করছে, যে ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডে তারা লিপ্ত, যে দুষ্কর্ম তারা করছে, তাদের ঘৃণিত দুষ্কর্ম এর তোমাদের সৎকর্ম কখনোই সমান নয়। যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে, তাদের অপকর্ম আর তোমাদের অনুসৃত সৎনীতি ও সৎকর্ম সমান্তরাল নয়। যদিও তোমাদের সৎকর্ম

বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত। কিন্তু এ কথা তোমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, বর্তমানে সৎকর্ম ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত হলেও এর ভেতরে এমন শক্তি লুকায়িত রয়েছে, যা উপযুক্ত পরিবেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করে যাবতীয় অসৎকর্ম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে নিঃশেষ করে দেবে। আর দুষ্কর্মের নিজ দেহে এমন দুর্বলতা বিদ্যমান, অসৎকর্মের নিজ দেহ এমন ক্ষয় রোগে আক্রান্ত যে, নিজের রোগ যন্ত্রণায় অসৎকর্ম স্বয়ং আত্মহত্যা করতে বাধ্য। অর্থাৎ অসৎকর্মের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণেই তা স্বয়ং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং ইতোপূর্বে তাই হয়েছে।

কারণ মানুষের ভেতরে সৃষ্টিগতভাবেই এমন এক প্রকৃতি বিদ্যমান রয়েছে যে, যে প্রকৃতি অসৎকর্মকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। অসৎকর্ম যারা করে এবং যারা তার সহযোগী শক্তি, তাদের চেতনার জগতেও এ কথা জাগ্রত থাকে যে, তারা যা করছে তা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অসত্য। তাদের এই অন্যায় কর্মকান্ডের বিনিময়ে অন্য লোকদের মনে তাদের প্রতি সম্মান-মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হবে, এই আশা তারা নিজেরা পোষণ করা তো দূরে থাক, বরং নিজেদের কর্মকান্ডের কারণে নিজের বিবেকের কাছে তারা লজ্জিত থাকে, যদিও বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে সে লজ্জা তারা প্রকাশ পেতে দেয় না। এভাবে অসৎকর্মশীল লোকদের মনে এমন এক শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে, যে শক্তি তার অসৎ ইচ্ছা ও সঙ্কল্পকে প্রতি মুহূর্তে দুর্বল করতে থাকে।

এই অবস্থায় ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত সৎকর্ম বিরতিহীনভাবে তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই অসৎকর্মের ওপরে সৎকর্ম বিজয়ী হয়। কারণ সৎকর্ম স্বয়ং এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যা মানুষের মানস জগতে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রাণের দুশমনকেও শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত করে। প্রাণের দুশমন তার প্রতিপক্ষের সৎকর্মের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়–প্রত্যেক যুগের ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করেছে। সৎকর্মশীল লোকগুলোর সাথে যখন অসৎকর্মশীল লোকদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং তা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে, তখন এই উভয় দলের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের ভেতরে যারা অসৎকর্মশীল লোকদেরকে সমর্থন করতো, তারাও অসৎকর্মে লিপ্ত লোকদের বিভৎস গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখে তাদেরকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয় এবং সৎকর্মশীলদের লোকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সৎকর্মশীল এবং তাঁরা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত ছিলেন। আর প্রতিপক্ষ ছিলো অসৎকর্মশীল এবং তারা বিস্তীর্ণ অঙ্গনে সক্রিয় ছিলো। বছরের পর বছর ধরে উভয় দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংঘাত চললো। রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী যে কোনো ধরনের অসৎকর্মের জবাব সৎকর্মের

মাধ্যমেই দিতে থাকলেন। আর অসৎকর্মশীল লোকগুলো প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার আশায় তাদের যাবতীয় ঘৃণ্য উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে নিজেদের নিকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিলো। ফলে সাধারণ মানুষের ভেতরে তাদের প্রতি এক অবিমিশ্র ঘৃণা সৃষ্টি হলো এবং অসৎকর্মশীল লোকগুলোর ভেতর থেকে একটি বিরাট সংখ্যক লোক ক্রমশ নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করে নিজ দল ত্যাগ করে সৎকর্মশীল লোকদের দলে গিয়ে শামিল হতে থাকলো।

এভাবেই অসৎকর্ম নিজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে নিজের ঘরেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলো এবং শেষ পর্যন্ত অসৎকর্মের ওপরে সৎকর্ম বিজয়ী হলো। কিন্তু এই বিজয় এক দিনে বা এক বছরে আসেনি। এই বিজয় অর্জন করার জন্য প্রয়োজন পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠার। সময় যতো গড়াতে থাকে, অসৎকর্মের অভ্যন্তরীণ নোংরামী ততোই তার দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। এই দুর্গন্ধে এক সময় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে অসৎকর্মের উৎসমূলকে উৎখাত করে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে।

সূরা হামিম সিজ্‌দার উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অসৎকর্মের মোকাবেলা শুধুমাত্র সৎকর্মের মাধ্যমেই করতে বলেননি, বলেছেন সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে। পবিত্র কোরআনের গবেষকগণ এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির সাথে যদি কেউ অন্যায় আচরণ করে আর সে ব্যক্তি যদি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা হলো শুধুমাত্র সৎকর্ম। আর অন্যায় আচরণ যার সাথে করা হলো, সেই ব্যক্তি যদি অন্যায় আচরণকারীকে ক্ষমাও করে দিলো এবং সুযোগ বুঝে তার উপকারও করলো এটাই হলো সর্বোত্তম সৎকর্ম। অর্থাৎ অন্যায়কারীকে শুধু ক্ষমাই করা হলো না, তার প্রতি অনুগ্রহও করা হলো। এভাবেই অসৎকর্মের মোকাবেলা সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে করা হলো।

এই কাজের শুভ পরিণতি কি দাঁড়াবে, সে কথাও মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 'অসৎকর্মের মোকাবেলা যদি সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে করা হয়, তাহলে প্রাণের শত্রুও এক সময় পরম আপনজনে পরিণত হবে।' এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ মানুষের জন্মগত স্বভাবের মধ্যেই এই গুণটি নিহিত রয়েছে। একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে, যার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে ব্যক্তি সবকিছু জেনে শুনেও নীরব থাকে তাহলে অবশ্যই এটা সৎকাজের মধ্যে গণ্য হবে–কিন্তু তার এই সৎকাজ কটুবাক্য প্রয়োগকারীকে তার হীন কর্ম থেকে বিরত করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে ব্যক্তি যদি কটুবাক্য প্রয়োগকারীকে তিরস্কার না

www.pathagar.com

করে তার কল্যাণ কামনা করে, সুযোগ পেলে তার উপকার করে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই নিজের বিবেকের কাছে লজ্জিত হবে এবং হীন কর্ম থেকে নিজেকে বিরত করবে।

পৃথিবীতে এমন ধরনের মানুষও রয়েছে, যারা প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার সামান্য সুযোগও হাতছাড়া করে না। এরা সবসময় প্রতিপক্ষের দুর্বলতা অনুসন্ধান করতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই ক্ষতি করে। অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করতে হবে, এই নীতি অনুসরণ করে সে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকলো। প্রতিপক্ষ এই নীরবতাকে দুর্বলতা মনে করে দ্বিগুণ উৎসাহে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন সুযোগ যদি আসে যে, শত্রু লোকটি মারাত্মক বিপদে পড়েছে, এই অবস্থায় তার দ্বারায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি তার শত্রুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে গেলো। এই পরিস্থিতিতে শত্রুতায় লিপ্ত লোকটির পক্ষে পুনরায় কোনো ধরনের ক্ষতিকর কাজ করা তো দূরে থাক, সে বরং পরম আপনজনে পরিণত হবে এতে কেনো সন্দেহ নেই।

তবে সর্বক্ষেত্রে এই নীতি অবলম্বন করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম কোন্ পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে শত্রুর শত্রুতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই 'অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্ম দিয়ে করার' নীতি অবলম্বন করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল মক্কী জীবনে এই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং সেটা ছিল ঐ নীতি অবলম্বনের উর্বর ময়দান। কিন্তু মদীনার জীবনে সবর্ত্র আল্লাহর রাসূল ঐ নীতি অবলম্বন করেননি এবং সেই ময়দান ঐ নীতি অবলম্বনের অনুকূল ছিল না। মদীনার ও খায়বরের ইহুদীদের অসৎকর্মের জবাব আল্লাহর রাসূল দীর্ঘদিন যাবৎ সৎকর্মের মাধ্যমে দিয়েছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ রাসূলের এই নীতিকে দুর্বলতা মনে করে ইসলামী রাষ্ট্রকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত থেকেছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্রের জবাব অস্ত্র দিয়েই দিতে হয়েছে।

সুতরাং সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে যে কেনো ধরনের দুশমন অনিবার্যভাবে পরম আপনজনে পরিণত হয়ে যাবে, এই ধারণা করা ঠিক নয়। কারণ পৃথিবীতে এমন নিকৃষ্ট ও জঘন্য মানুষের অস্তিত্বও রয়েছে, যাদের অসৎকর্মের জবাব সৎকর্মের মাধ্যমে দিলে, তাদেরকে ক্ষমা করলে এবং তাদের উপকারের জন্য সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিলেও তারা এগুলোকে দুর্বলতা মনে করে কয়েকগুণ উৎসাহের সাথে

শত্রুতা করতেই থাকে। এসব নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোকদের অপকর্মের জবাবে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ যে পন্থায় দিয়েছেন, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে সেই পন্থাই গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তাবুকের ইতিহাস দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় আল্লাহর রাসূল যদি সে সময় তাবুকের প্রান্তরে বিপুল শক্তির সমাবেশ না ঘটাতেন, তাহলে প্রতিপক্ষ ইসলামী শক্তিকে নিতান্তই দুর্বল ভেবে চারদিক থেকে স্রোতের মতোই ইসলামের ওপরে আছড়ে পড়তো।

অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা, এটা কোনো মামুলি বিষয় নয়। এই কাজ করতে হলে অসীম সাহস, দৃঢ় মনোবল, অপরিবর্তনীয় সঙ্কল্প, নিজেকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এবং যাদের রয়েছে অপরিসীম সহনশীলতা, তাদের পক্ষেই অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা সম্ভব। মুসলিম হত্যাযজ্ঞের মহানায়ক নরঘাতক রিচার্ড–যে রিচার্ড হাজার হাজার মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-তরুণকে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল, যার সম্পর্কে তারই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক 'লেনপুল' তার বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত' বলে। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক 'গিবন' চিহ্নিত করেছেন, 'শোণিত পিপাসু' হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কক্সবার্টের ভাষায় রিচার্ড হলো, 'মানব জাতির নির্মম চাবুক'। যুদ্ধের ময়দানে এই নরঘাতকের অস্ত্র যখন ভেঙ্গে গিয়েছিল, মানবতার বন্ধু সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবী তখন তাকে হত্যা না করে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নরপশু রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার খৃষ্টান সাথীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। তখন মুসলিম বীর সালাহ্ উদ্দিন গোপনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর নাম অসৎকর্মকে সৎকর্মের মাধ্যমে মোকাবেলা করা।

সাময়িকভাবে বা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তির পক্ষে অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা সম্ভব হলেও কঠিন সঙ্কল্প ও অপরিসীম সহনশীলতা সহকারে জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে প্রত্যেক পদক্ষেপে এই নীতি বাস্তবায়ন করা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই কাজ কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব, যারা 'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে এবং এই পথের প্রত্যেক বাঁকে ওৎ পেতে থাকা বিপদ-মুসিবতকে মোকাবেলা করার মতো 'সবর বা ধৈর্য' নামক বর্মে নিজেকে আবৃত করেছে।

কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত লোকদেরকে ইসলাম বিরোধী এমন ধরনের নিকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়, যারা

www.pathagar.com

ন্যায়-নীতি, সততা, নৈতিকতা, সুন্দর আচরণ, ভালো ব্যবহার, উত্তম কথা তথা কোনো ধরনের সৎ গুণের তোয়াক্কা করে না। দাম্ভিকতা, মুর্খতা ও অহঙ্কার যাদের চরিত্রের ভুষণ, তাদের অপকর্মের মোকাবেলা শুধুমাত্র সৎকর্ম দিয়েই নয়, সর্বোত্তম সৎকর্ম দিয়ে করা ঐ লোকগুলোর দ্বারাই সম্ভব, যারা প্রত্যেক পদে রাসূল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্পবদ্ধ। মক্কায় অবস্থানকালে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সাথে যে আচরণ করা হয়েছিলো, মক্কা বিজয়ের পরে সেই অত্যাচারী লোকগুলো যখন আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথীদের সামনে অপরাধীর ভঙ্গিতে উপস্থিত ছিলো, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথীরা সামান্য কটুবাক্যও তাদের প্রতি প্রয়োগ করেননি।

এর নামই 'সবর বা ধৈর্য' এবং এই গুণকে নিজ চরিত্রের ভূষণে পরিণত করতে ব্যর্থ হলে দাওয়াতী কাজ যেমন সফলতা অর্জন করতে পারবে না, তেমনি মহান আল্লাহর দরবারে সেই সম্মান ও মর্যাদাও লাভ করা যাবে না, যে সম্মান ও মর্যাদা মহান আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদেরকে দান করবেন। দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত প্রত্যেকটি লোককে এই 'সবর বা ধৈর্য' নামক গুণ অর্জন করতে হবে, যারা এই গুণ অর্জন করতে সক্ষম হবে, পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি তাদের সফলতা ও কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা করে যে, পৃথিবীতে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করলে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করা গেলেও পৃথিবীর জীবনে কিছুই পাওয়া যাবে না, এই ধারণা মারাত্মক ভুল। কারণ এই নীতি অবলম্বন করলে কেবলমাত্র পরকালের জীবনেই সফলতা আসবে তা নয়, পৃথিবীর জীবনেও সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি লাভ করা যায়। যেসব লোক প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্কারী, কোনো ব্যাপারেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না, লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অবলম্বন করে, মানুষকে অর্থ, শক্তি, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে উপকার করে, তারা মানুষের কাছে সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করে। সাধারণ মানুষ তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। এই ধরনের কোন্ লোক বিপদে নিপতিত হলে সমাজের সবথেকে খারাপ লোকটিও তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। ধৈর্য অবলম্বনকারী সৎলোকগুলো অভাবের মধ্যে থেকেও যে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, তা দুষ্কৃতিতে নিমজ্জিত রাজপ্রাসাদের অধিকারী লোকগুলো লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধৈর্য অবলম্বনকারী লোকগুলোকে এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

www.pathagar.com

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। (সূরা নাহ্ল-৯৬)

ধৈর্যশীলদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ

ঈমানদার কখনও ধৈর্যহীন হয় না, তাঁর ঈমান তাকে ধৈর্যহীন হতে দেয় না। ধৈর্যহারা তারাই হয়, যাদের কোন অভিভাবক নেই। যাদের ওপরে কোন শক্তি নেই, যারা আশ্রয়হীন, যাদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই তারাই কেবল ধৈর্যহীন হতে পারে। কিন্তু ঈমানদার বান্দা জানে যে, তার অভিভবাক হলেন সকল ক্ষমতার অধিশ্বর স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا، يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ-

যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লাহ্। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনেন। (সূরা বাকারা)

মুমীন বান্দা জানে, তাঁর রুজির মালিক হলেন আল্লাহ্। 'হক'-এর পথ অবলম্বন করলে তার রুজির ওপরে আঘাত আসতে পারে, তার সন্তান-সন্ততি অনাহারে থাকতে পারে, এ ধরনের চিন্তায় ধৈর্যহারা হয়ে সে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ-

বলো, আমি আল্লাহকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে নিজের ইলাহ্ বানিয়ে নেব কি? সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি রুজী দান করেন, রুজী গ্রহণ করেন না? (সূরা আন'আম–১৪)

মুমীন বান্দারা বলে, আমি কি সেই আল্লাহর দাসত্ব ত্যাগ করে, তার বিধান অমান্য করে মানুষের বানানো বিধান ও আইন-কানুনের সামনে মাথানত করবো, যিনি ঐ বিশাল আকাশ সৃষ্টি করে তা সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন, যিনি এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন, প্রাণীকুলের আহার যিনি দিচ্ছেন তার আইন বাদ দিয়ে আমি

www.pathagar.com

অন্য কারো আইন মানতে পারি না। কারণ আমার আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে আদেশ দিয়েছেন–

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْامِنْ دُوْنِه اَوْلِيَاءَ–

সেই বিধানই অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতি তোমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তোমরা নিজেদের রব-কে বাদ দিয়ে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষককে অনুসরণ করো না। (সূরা আ'রাফ–৩)

ঈমান মানুষের ভেতরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয় যে, সবচেয়ে উত্তম বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হলেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তাঁর আল্লাহ তাঁকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন–

وَاِنْ تَوَلَّوْافَاعْلَمُوْااَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ، نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ–

জেনে রেখো, আল্লাহ-ই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক; তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও বন্ধু। (সূরা আন্‌ফাল–৪০)

ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আল্লাহ্ তা'য়ালা। তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আল্লাহর মোকাবেলায় এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ–يُحْىٖ وَيُمِيْتُ–وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ–

অবশ্যই আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব। তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। তোমাদের কোনো সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন নেই, যে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে। (সূরা তাওবা- ১১৬)

ঈমানদার হয় সহনশীল-সবরকারী এবং তার ভেতরে মানসিক প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। একজন মানুষ গোনাহ্ করবে এটাই স্বাভাবিক। গোনাহ্ করার কারণে মুমীন আল্লাহর ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। এ অবস্থায় শয়তান এসে তাকে এ কথা বলে প্রতারিত করতে চায় যে, 'তোমার আর কোনো উপায় নেই, তুমি এত গোনাহ্ করেছো যে, এই গোনাহ্ তোমাকে অবশ্যই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।'

এভাবে প্রতারণা করে মুমীনকে হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করার অপচেষ্টা করে শয়তান। কিন্তু ঈমানদার বান্দাকে শয়তান এ জন্য প্রতারিত করতে পারে না, কারণ সে জানে যে, অপরাধ করেছে সে, আর তার আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী। ক্ষমা করতে তিনি ভালোবাসেন। সে যে গোনাহ্ করেছে তার এই গোনাহের থেকে আল্লাহর রহমত অনেক বড়। সেই আল্লাহ্ই পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ–

(হে নবী) আপনি (তাদের) বলুন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো, তারা আল্লাহ তা'য়ালার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না। (সূরা ঝুমার-৫৩)

মহান আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার বান্দাকে জানিয়েছেন, আমার রহমত থেকে মুহূর্তের জন্যও নিরাশ হবে না। তুমি যদি পাহাড় সমান গোনাহ্ করে থাকো, তাহলে জেনে রেখো, আমার রহমত পাহাড়কে অতিক্রম করে আকাশে পৌঁছে যাবে। আর তোমার গোনাহ্ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় তাহলে আমার রহমত আমার আরশে আযীম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

সুতরাং গোনাহ্ করলে আল্লাহর কাছে তওবা করে ক্ষমা চাইলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন এই বিশ্বাস মুমীন অন্তরে পোষণ করে। ঈমানদারের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি হলেই সে নামাযে দাঁড়িয়ে যায় এবং নামাযের মাধ্যমেই সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে। সবর বা ধৈর্য হলো অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ। সবরই হলো সকল প্রকার সাফল্য ও সার্থকতার চাবিকাঠি। সবর ব্যতীত মানুষই কোনো ধরনের কল্যাণ লাভ করতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ، اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ، وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ، بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ، وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَ

اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ، قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ–

হে ঈমানাদরগণ! ধৈর্য ও নামাযে সাহায্যে প্রার্থনা করো, আল্লাহ্ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোনো চেতনা হয় না। আমি নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনাহার, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করবে, এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলবে, 'আমরা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, আল্লাহর রহমত তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথের যাত্রী। (সূরা বাকারা- ১৫৩-১৫৭)

হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

কোন ধরনের দূরারোগ্য রোগে ঈমানদার আক্রান্ত হলে সে ধৈর্যহারা হয় না। রোগের কারণে সে নিরাশ হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণে না। তার মনের ভেতরে এ আশা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে, আল্লাহ্ তাঁর রোগ অবশ্যই ভালো করে দেবেন। এভাবে ঈমান মানুষের ভেতরে মানসিক প্রশান্তি আর ধৈর্য সৃষ্টি করে দেয়। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) মূর্তি পূজায় লিপ্ত তাঁর জাতিকে বলেছিলেন–

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ–الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ، وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ، وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ، وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ–

তোমাদের ঐ মূর্তিগুলো তো আমার শত্রু আর আমার বন্ধু হলেন আল্লাহ–যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি যখন ক্ষুধার্ত হই তখন তিনি আমাকে খাওয়ান এবং আমি যখন তৃষ্ণার্ত হই তখন তিনি আমাকে পান

ক্‌রান। আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পরবর্তীতে পুনরায় জীবন দান করবেন। আমি তাঁর কাছেই আশা পোষণ করি যে, বিচারের দিনে তিনি আমার ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা শূ'আরা-৭৭-৮২)

সুতরাং কোনো ঈমানদার যখন দীর্ঘস্থায়ী রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে তখন সে মুহূর্তের জন্যও ধৈর্যহীন হয় না। ধৈর্যহারা তো হয় সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নিজের প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করে না। যে ব্যক্তি কাফের সেই কেবল আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হতে পারে বা ধৈর্যহারা হতে পারে। হতাশা ব্যক্ত করা, নিরাশ হওয়া ও ধৈর্যহীন হওয়া হলো কুফ্‌রী। ধৈর্যহীন হওয়া বা হতাশা ব্যক্ত করা, নৈরাশ্য প্রকাশ করা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ।

হযরত আয়ূব (আঃ) এর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, অকল্পনীয় রোগ যন্ত্রণায় তিনি দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁর গোটা শরীরে পচন ধরেছিল, তা থেকে যে দুর্গন্ধ নির্গত হতো, ফলে কোনো মানুষ তাঁর পাশে যেতে পারতো না। গোটা শরীরে রক্তাক্ত ক্ষত, তার ভেতরে পোকা বাসা বেঁধেছে। একদিকে রোগ যন্ত্রণা অপরদিকে পোকার কামড়ে তিনি জর্জরিত। তাঁর শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। প্রতিবেশীগণ সহ্য করতে পারলো না। তাঁকে এলাকা থেকে বের করে দেয়া হলো। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয় স্বজন তাকে ত্যাগ করলো। তবুও তিনি ধৈর্যহারা হলেন না।

নেই, কোথাও কেউ নেই তাঁকে এতটুকু সাহায্য করার। জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তিনি হতাশ বা ধৈর্যহারা হননি। নিরাশা-হতাশার ও ধৈর্যহীনতার সামান্যতম চিহ্নও তাঁর রোগাক্রান্ত চেহারায় প্রতিভাত হয়নি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিন্দু পরিমাণ স্থান তাঁর দেহে অবশিষ্ট ছিল না, যেখানে রোগ আক্রমণ করেনি। অবশেষে রোগ যখন তাঁর জিহ্বায় আক্রমণ করলো, জিহ্বায় পচন দেখা দিল তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যাকুলতা রোগের কারণে ছিল না। তাঁর ব্যাকুলতা এ জন্য ছিল যে, মুখের ভেতরে জিহ্বাও যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি ঐ মহান আল্লাহর নাম কি ভাবে উচ্চারণ করবেন! এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি কিভাবে আল্লাহকে ডাকলেন পবিত্র কোরআন বলছে-

اِذْنَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَابِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ

وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعَابِدِيْنَ–

স্মরণ করো, যখন সে তার রব-কে ডাকলো, আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী। আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করেছিলাম এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং সেই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে এটা একটি শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য। (সূরা আম্বিয়া- ৮৩-৮৪)

হযরত আয়ুব (আঃ) এর দোয়ার ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন, 'তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' পরে কোনো অভিযোগ ও নালিশ নেই, দোয়ার এই ভঙ্গিমা যে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোনো পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোনো পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়, 'আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।' এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলেন। সূরা সাদ-এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বললেন–

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ-هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ–

নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এতে ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য। (সূরা সা-দ-৪২)

এই আয়াত থেকে জানা যায় মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন। সে ঝরণার পানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময় এদিকে ইংগিত করে যে তাঁর কোন মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল। তাঁর সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল।

হযরত আয়ুব (আঃ) এর ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকলে মহান আল্লাহ উল্লেখ করতেন। যতটুকু মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন

ততটুকু মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। তিনি এক মহান পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁর সে ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সনদ দান করেছেন, তাঁর এই ভূমিকা চিন্তাশীলদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّا وَجَدْ نٰهُ صَابِرًا–نِّعْمَ الْعَبْدُ–اِنَّه اَوَّابٌ–

আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রব-এর অভিমুখী। (সূরা সা'দ- ৪৪)

উল্লেখিত আয়াতে হযরত আয়ুব (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করার পূর্বে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ হযরত সোলাইমান (আঃ) এর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, আমি সোলাইমানকে অগণিত নে'মাত দানে ধন্য করেছিলাম। কিন্তু সে কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি এবং আমাকে ভুলে যায়নি। কখনো সে অহংকার করেনি। এখানে একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বান্দার অহংকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ এবং ধৈর্য তাঁর কাছে ততো বেশী প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ করে এবং সতর্ক করার কারণে উলটো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা ইবলিস, ফেরাউন, নমরূদ, কারুণসহ যুগের বা শতাব্দীর ফেরাউনদের হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে তওবা করে দীনতা সহকারে তার রব-এর সামনে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতোপূর্বে দাউদ (আঃ) ও সোলাইমান (আঃ) এর ওপর প্রদর্শিত হয়েছে। হযরত সোলাইমান (আঃ) ইস্তিগ্ফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন মহান আল্লাহ তা পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জ্বিনদের ওপর কর্তৃত্ব এবং দু'টি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র তাঁকেই দান করা হয়েছে, অন্য কাউকে এর কোন অংশ দেয়া হয়নি।

এরপরেই হযরত আয়ূব (আঃ) এর ইতিহাস উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আমি যেমন সোলাইমানকে নে'মাত দান করে পরীক্ষা করেছিলাম, সে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল ঠিক তেমনি আয়ূবের কাছ থেকে সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে রোগগ্রস্থ করে পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। সে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে

www.pathagar.com

উত্তীর্ণ হয়েছিল। যখন সে প্রচুর নে'মাত লাভ করেছিল, তখনও সে কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি, আবার যখন তার কাছ থেকে ধন-দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাঁর আপনজনরা রোগের কারণে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, কঠিন রোগ তাকে দিনের পর দিন সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, তখনও সে আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি। ধৈর্যহীন হননি এবং নিরাশ হয়ে হতাশা ব্যক্ত করেননি। উভয় অবস্থাতেই সে আমার শোকর আদায় করেছে–আমার রহমতের ওপরে আশাবাদী থেকেছে।

বুখারী হাদীসে কিতাবুল আম্বিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো একদিন হযরত আয়ূব (আঃ) গোসল করছিলেন। এমন সময় স্বর্ণের তৈরী পঙ্গপাল তাঁর শরীরের ওপরে এসে আছড়ে পড়তে থাকে। তিনি তা দ্রুত হাতে ধরে নিজের কাপড়ের ভেতরে জমা করতে থাকেন। এ সময় মহান আল্লাহ তাকে বললেন, হে আয়ূব! তুমি দেখতে পাচ্ছো, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি?

অর্থাৎ আমি তো তোমাকে প্রচুর দান করেছি, তবুও কেনো এসব স্বর্ণের পঙ্গপাল ধরে জমা করছো? হযরত আয়ূব (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাকে অনেক দান করেছো, কিন্তু এরপরেও তো তোমার রহমত ও বরকত হতে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না।

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আয়ূব (আঃ) প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আবার এক সময় তিনি একেবারে কপর্দক শুন্য হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সন্তান-সন্ততি তাঁকে ত্যাগ করেছিল, পরীক্ষায় সফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরে মহান আল্লাহ তাঁকে পুনরায় সমস্ত কিছুই দান করেছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

কোরআনের বর্ণনার অর্থ এটা নয় যে, শয়তান আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, রোগের প্রচন্ডতা, ধন-সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়-স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রণা আমার জন্য হচ্ছে এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে আমাকে বিপদগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় রত থাকে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তাকে হুকুম দিলাম তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।'

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল হযরত আয়ূব (আঃ) এর জন্য তাঁর রোগের চিকিৎসা।

কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো।' হাদীস থেকে জানা যায়, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর হযরত আয়ূব (আঃ) এর স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল এমন কি সন্তানরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁর কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাঁকে আরো সন্তান দান করলাম।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো, নিজের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে।'

অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, সুসময়ে অনুকূল অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভাল-মন্দ সরাসরি একমাত্র ঐ আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি ইচ্ছে করলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে একেবারে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে একেবারে চরম দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় উপনীত করতে পারেন। সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য হলো, যে কোনো অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই ধৈর্যহীন হওয়া উচিত নয়। ধৈর্যহীন হওয়া ও হতাশা ব্যক্ত করা বড় ধরনের গোনাহ্।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

ঈমানদার ব্যক্তি কখনও বিপদে ধৈর্য হারায় না। জীবনের চরম মুহূর্তে সে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। যে কোন ধরনের বিপদই আসুক না কেন, ঈমানদার আল্লাহর ওপরে ভরসা করে। এটা হলো ঈমানের বাস্তব উপকারিতা। ঈমান মানুষের ভেতরে ধৈর্য সৃষ্টি করে দেয়। কারণ ঈমানদার এ কথা জানে যে, বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবনের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে তাঁর অন্যান্য ভাইগণ তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে গর্তে নিক্ষেপ করলো। জীবনের সে চরম

www.pathagar.com

মুহূর্তেও তিনি ধৈর্যহারা হননি। তাঁর এই বিপদের মধ্যে কতবড় কল্যাণ যে নিহিত ছিল তখন তিনি যেমন অনুভব করতে পারেননি তেমনি উপলব্ধি করতে পারেনি তাকে যারা হত্যা করার উদ্দেশ্যে গর্তে নিক্ষেপ করেছিল তারাও।

কেনান শহরের একটি গর্তে তাকে নিক্ষেপ করা হলো এরপর তিনি গিয়ে পৌঁছলেন সুদূর মিশরে। সেখানে তিনি প্রথমে হলেন সে রাষ্ট্রের অর্থ ও খাদ্যমন্ত্রী এবং তারপরেই তিনি সেদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন। তাঁর ওপরে যে বিপদ আপতিত হয়েছিল, সে বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু বিপদ যখন মুখ ব্যাদন করে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পৃথিবীর আলো-বাতাস তিনি আর কোনদিন দেখতে পাবেন, ভোগ করতে পারবেন, মুক্ত আলো-বাতাসে তিনি প্রাণভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, এমন কোন আশা-ই যখন ছিল না, তখনও তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত লোকগুলোর অবস্থা তেমনি হতে হবে। তাহলেই কল্যাণ লাভ করা যাবে–তার পূর্বে নয়।

মিশরেও উপনীত হয়ে বিপদ তাঁর পিছু ত্যাগ করলো না। অপূর্ব সুন্দর চেহারার কারণে একশ্রেণীর নারীর দল তাঁকে কলুষিত করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলো। তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হলো তখন তাঁর ওপরে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলো। এখানেও তিনি ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন।

প্রকৃতপক্ষে নীতি নৈতিকতা বিরোধী এবং আল্লাহ বিরোধী কোন কাজ নিজের দ্বারা সংঘটিত হবার পূর্বে ঈমানদার, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এমন স্থানকেই অধিক প্রাধান্য দিলেন, যে স্থান সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা থাকে যে সেখানে তাকে চরম কষ্টের মধ্যে দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হবে। সেখানে যতই কষ্ট হোক না কেন, এমন কাজ করতে ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই রাজী হবে না, যে কাজ করে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যাবে না। এ কারণেই নবী রাসূল ও তাদের দৃঢ় অনুসারী দ্বীনি আন্দোলনে নিবেদিত লোকগুলো প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুন্ডকে, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিকে, ফাঁসির রশিকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হবে, এমন কাজ তাঁরা করেননি। অন্যায়ের সামনে তাঁরা কখনো মাথানত করেননি।

যৌন উন্মাদ সেই নারীর কামনা-বাসনা পূরণ করতে হবে, নয় তো তাঁকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সামনে পথ খোলা ছিল দুটো। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি যত্নের সাথে ধৈর্যকেই লালন করলেন।

www.pathagar.com

কারাগারকেই তিনি বেছে নিলেন। এই অবস্থায় নিপতিত হয়ে ইউসুফ (আঃ) মহান আল্লাহর কাছে কি আবেদন করেছিলেন এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ–وَاِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَ هُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ–فَاسْتَجَابَ لَه رَبُّه فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ–اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

ইউসুফ বললো, হে আমার রব! এরা আমার কাছ থেকে যে কাজ পেতে চায় তার তুলনায় কয়েদ হওয়া আমি অধিক পছন্দ করি। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো। তাঁর রব তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং সেই স্ত্রীলোকদের কূট-কৌশলকে তাঁর কাছ হতে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চিতই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন। (সূরা ইউসুফ-৩৩-৩৪)

আল্লাহর কোরআন বলছে হযরত ইউসুফ (আঃ) বিপদে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন, তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো।

তাঁর এই আবেদনের ধরণ থেকেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, এই সময় হযরত ইউসূফ (আঃ) যে অবস্থার মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিলেন, এই আয়াত কয়টি এই ঘটনার এক আশ্চর্যজনক চিত্র পেশ করেছে । উনিশ-বিশ বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবক, যাযাবর জীবনের অবদানে এক অপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ডিত দেহ আর ভরা যৌবনের অধিকারী তিনি। দারিদ্র্য, পরদেশ, আপন ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার ও যবরদস্তিমূলক দাসত্ব প্রভৃতি পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে আসার পর ভাগ্য তাকে তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাধিক সভ্যতা-সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজ্যের রাজধানীতে এক বড় ধনবান ও পদাধিকারী ব্যক্তির ঘরে এনে পৌঁছিয়ে দিল।

এখানে এই ঘরের স্ত্রীলোকটির সাথে তার দিন-রাতের দেখা সাক্ষাতের ব্যাপার ছিল। প্রথমে সেই নারীই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর তার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা গোটা রাজধানী শহরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর গোটা শহরের অভিজাত ও ধনবান পরিবারের নারীগণ তাঁকে দেখে আত্মহারা হয়ে যায়। এই সময় তাঁর চতুর্দিকে অসংখ্য ছলনাময়ী জালের আকর্ষণ সবসময় এবং সবস্থানেই তাকে

www.pathagar.com

জড়াতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তার মনে আবেগ-উচ্ছ্বাসের বন্যা-প্রবাহ জাগিয়ে তোলার জন্য, তার আল্লাহ্‌ভীতি ভেঙ্গে চুরমার করে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য সীমাহীন ষড়যন্ত্র–চেষ্টা-সাধনা চলতে থাকে।

যেদিকেই তিনি যান সেদিকেই দেখেন গুনাহ্ ও দুষ্কৃতিপূর্ণ চাকচিক্য ও জাঁকজমক সহকারে তাকে গ্রাস করার জন্য দুয়ার খুলে অপেক্ষায় দন্ডায়মান। যাদের ভেতরে ঈমান নেই, তারা পৃথিবীতে পাপের পথ নিজেরা সন্ধান করে আর পাপ স্বয়ং তার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঈমানদারের সন্ধানে ফিরতে থাকে। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জন্যও তাই ঘটেছিল। পাপ অপেক্ষা করে আছে, যে মুহূর্তেই তার মনে অন্যায় ও পাপের প্রতি একবিন্দু ঝোক-প্রবণতা দেখা যাবে, ঠিক তখনই সে নিজেকে সামনে পেশ করে দেবে। রাতদিন অহর্নিশি তিনি এ ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাটাচ্ছেন। কোনো এক মুহূর্তে তার ইচ্ছা-বাসনায় একবিন্দু শিথিলতা দেখা দিলেই অপেক্ষমান পাপের শত-সহস্র দরজার যে কোনো একটিতে প্রবেশ করতে পারেন।

এ ধরনের অবস্থায় একজন ঈমানদার আল্লাহ-বিশ্বাসী বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী যুবক যে সাফল্যের সাথে এ ধরনের শয়তানী আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন, তা কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। ধৈর্য কোন পর্যায়ে উপনীত হলে, সেই চরম মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করা যায়, তা ভাষায় ব্যক্ত করার বিষয় নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বিষয়। আর ঈমান না থাকলে এ ধরনের ধৈর্য্যও সৃষ্টি হয় না এবং বিষয়টি অনুভবও করা যায় না।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর আত্মসংযমের এই বিস্ময়কর অভিব্যক্তির পরও আত্মচেতনা ও নৈতিক পবিত্রতার অতিরিক্ত অবদান এটাই ছিল যে, এতবড় একটি মারাত্মক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরও তার হৃদয়ে কখনো কোনো অহংকার জাগেনি। এ জন্য তিনি কখনো আত্মপ্রসাদ লাভ করেননি বা নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়ে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেননি। কখনো এই গৌরব তার মনে জাগেনি যে, কত শত রূপসী যুবতী নারী আমার জন্য পাগলপারা, অথচ এরপরও আমার পদস্খলন ঘটেনি।

এই ধরনের অহংকার প্রকাশের পরিবর্তে তিনি বরং স্বীয় মানবীয় দুর্বলতার কথা চিন্তা করে কেঁপে কেঁপে উঠতেন আর বারবার বিনয় ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্‌র কাছে কাতর প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ্! আমি বড়ই দুর্বল মানুষ, এতসব আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাতছানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। হে আমার প্রতিপালক! তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও, তুমিই আমাকে বাঁচাও! কখনই যেন আমার পদস্খলন না ঘটে, এই ভয়ে কম্পমান আমি!'

www.pathagar.com

আসলে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর নৈতিক প্রশিক্ষণের এটা এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুকতম অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, পবিত্রতা, সত্যানুরাগ, ধৈর্য, সত্য পথে চলা, আত্মসংযম, মানসিক ভারসাম্য প্রভৃতি যেসব অসাধারণ গুণাবলী তার মধ্যে এতদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল, এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত হয়ে তা প্রকাশ হয়ে পড়লো। এমন কঠোর ও কঠিন পরীক্ষার সময়ে সেসব গুণাবলী উৎকর্ষিত হয়ে উঠে-পূর্ণ শক্তিতে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ঈমান আনার পরে পরীক্ষা না এলে ঈমানদার অনুভব করতে পারে না, এই ঈমান তার ভেতরে কি কি গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছে। ঈমান আনার উপকারিতা কি, তা পরীক্ষায় নিমজ্জিত না হলে ঈমানদার অনুভব করতে পারে না। এ জন্য ঈমানদারের জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা অনিবার্য।

হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন এবং তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে মহান আল্লাহ ঐ সকল নারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কারাগারের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে যাবতীয় অপকৌশল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। এভাবে হযরত ইউসূফ (আঃ) এর কারারুদ্ধ হওয়া ছিল মূলত তাঁর এক বিরাট নৈতিক বিজয় এবং মিসরের রাজন্যবর্গ ও শাসক শ্রেণীর লোকদের চরম নৈতিক পরাজয়ের চূড়ান্ত ঘোষণা। ইউসূফ (আঃ) কোনো অপরিচিতি ও অজ্ঞাত-কুলশীল লোক ছিলেন না। সমগ্র দেশে-অন্তত রাজধানীতে সর্বশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে জানতো ও চিনতো। বস্তুত যে ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি অধিকাংশ পদস্থ ও অভিজাত ঘরের নারীগণই ছিল পাগল প্রায়, যার রূপ-সৌন্দর্যের অগ্নিজ্বালায় নিজেদের ঘর-বাড়ি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে দেখে মিসরের শাসক শ্রেণী তাকে জেলে প্রেরণ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত মনে করলো, এমন ব্যক্তির দেশব্যাপী পরিচিতি যে কতটা ব্যাপক ছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে।

তার সম্পর্কে যে মিসরের প্রতিটি নগরে, জনপদে আলোচনা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। উপরন্তু এই লোকটি যে কত উন্নত, মজবুত ও নির্মল চরিত্রের মানুষ, সেটাও সবাই জেনে গিয়েছিল। তারা এটাও জানতে পেরেছিল যে, লোকটিকে তার নিজের কোনো অপরাধের কারণে কারারুদ্ধ করা হয় নি; বরং কারারুদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র এ জন্য যে, মিসরের রাজন্যবর্গ নিজেদের ঘরের নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার তুলনায় এই নির্দোষ ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণ করার সবচেয়ে সহজতম পথটি অবলম্বন করেছিল।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই অকারণে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে রাখা

www.pathagar.com

বেঈমান ও স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যন্ত প্রাচীন ও চিরন্তন রীতি। এ ব্যাপারেও বর্তমানের স্বৈরাচারী গণতন্ত্রের আলখেল্লাধারী শাসকগণ চার হাজার বৎসর পূর্বের স্বৈরশাসকদের তুলনায় স্বতন্ত্র কিছু নয়। যদি কোন পার্থক্য সেকালের স্বৈরাচার আর এ কালের স্বৈরাচারের মধ্যে থেকেই থাকে, তা হলো শুধু এটুকু যে, সেকালের শাসকেরা 'গণতন্ত্রের' দোহাই দিত না আর একালের জালিম শাসকগণ তাদের যাবতীয় স্বৈরাচারী কর্মকান্ড বৈধ করার লক্ষ্যে গণতন্ত্রের লেবাস ব্যবহার করে। সেকালের স্বৈরশাসকগণ আইনের কোন মাধ্যম ব্যতীতই বে-আইনী কর্মকান্ড পরিচালিত করতো, আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ তাদের প্রতিটি অবৈধ বাড়াবাড়ির 'বৈধতা' প্রমাণের জন্য পূর্বেই একটা আইন তৈরী করে নেয়। সেকালের স্বৈরশাসকগণ নিজেদের স্বার্থের জন্য সরাসরি লোকদের ওপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাতো আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ যার ওপর হামলা করে, তার সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এই লোকটির দ্বারা শুধু তাদের নয়, দেশ ও জাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক কথায়, সেকালের স্বৈরশাসকগণ শুধু জালিম ছিল আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ জালিম তো বটেই সেই সঙ্গে মিথ্যাবাদী ও নির্লজ্জও।

হযরত ইউসুফ (আঃ) কে কারাগারে বন্দী করা হলো। তাঁর অপরাধ, তিনি ঐসব নারীদের যৌবনের কামনা-বাসনা পূরণ করেননি। তথাকথিত এই অপরাধে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্য আল্লাহর নবীকে তারা বন্দী করেছিল। কারাগারের ভেতরেও তিনি নীরবে বসেছিলেন না। কারা কর্তৃপক্ষ ও সমস্ত কারাবন্দীদের কাছে তিনি আকাশের উজ্জ্বল সূর্যের মতই দেখা দিলেন। তাঁর ভেতরে মহান আল্লাহ যে গুণাবলী নিহিত রেখেছিলেন, জান্নাতের যে সুবাস দিয়ে দিয়েছিলেন, তা গোটা কারাগারকে আমোদিত করে তুলেছিল।

সেখানের সমস্ত বন্দী এবং কারা কর্তৃপক্ষের কাছে এক সময় তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের রব বা প্রতিপালক হতে পারে না। প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। কারাগারের সকল লোকজন তাঁর কাছে যে কোনো সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতো। জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য তাঁর কাছেই তারা পরামর্শের জন্য ধর্ণা দিত। তিনি কারা-জীবনে কিভাবে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন এবং তাঁর কারাগারের সাথীরা তাঁর কাছে পরামর্শ গ্রহণের জন্য কিভাবে আসতো এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

www.pathagar.com

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيـنِ، قَالَ اَحَدُ هُمَا اِنِّىْ اَرنِى اَعْصِرُ خَمْرًا، وَقَالَ الاخَرُ اِنِّى اَرنِىْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِي خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْله، انَّانَرك مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ، قَالَ لاَ يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقنه اِلاَّ نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِه قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا، ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبّى، اِنّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّه وَهُمْ بِالاخِرَةِ هُمْ كَفِرُوْنَ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَاءِ ىْ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ، مَاكَانَ لَنَاَانْ نُّشْرِكَ بِاللّه مِنْ شَىءٍ، ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلى النَّاسِ وَلكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ، يصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِه اِلاَّ اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَ ابَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّه، اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ، ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ اَكْثَرَا لنَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ، يصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُ كُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّه خَمْرًا، وَاَمَّاالاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِه، قُضِىَ الامْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِينِ، وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِى عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّه فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ –

www.pathagar.com

কারাগারে তাঁর সাথে আরো দু'জন দাস প্রবেশ করেছিল। একদিন তাদের একজন তাকে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মদ প্রস্তুত করছি। অপরজন বললো, আমি দেখেছি যে, আমার মাথার ওপর রুটি রাখা আছে আর পাখি তা খাচ্ছে। উভয়েই বললো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি বলুন, আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি।

ইউসুফ বললো, এখানে তোমরা যে খাবার লাভ করো, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দেবো। আমার রব আমাকে যে জ্ঞান-ভান্ডার দান করেছেন, এটা সেই জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনা ও পরকালকে অস্বীকার করে, আমি তাদের নিয়ম নীতি পরিত্যাগ করেছি। আর আমার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানবতার প্রতি এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যতীত আর অন্য কারো দাস বানাননি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাঁর শোকর আদায় করে না। হে কারাগারের বন্ধুরা আমার ! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না সেই এক আল্লাহ–যিনি সব কিছুর ওপরে বিজয়ী–মহাপরাক্রমশালী।

তাঁকে ত্যাগ করে তোমরা যাদের দাসত্ব করো, তারা কয়েকটি নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছো। আল্লাহ এদের পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য নয়। তাঁর আদেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা আর কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাঁটি জীবন-যাপন পন্থা, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

হে কারাগারের বন্ধুরা আমার! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন নিজের প্রভু (মিসর অধিপতি)-কে শরাব পান করাবে। আর আরেকজনকে শূলে চড়ানো হবে। আর পাখি তার মাথার মগজ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলে, তার ফয়সালা হয়ে গেল। (সূরা ইউসুফ-৩৬-৪২)

হযরত ইউসূফ (আঃ) কে যখন বন্দী করা হয়, তখন তার বয়স সম্ভবত কুড়ি-একুশ বৎসরের বেশি ছিল না। ইতিহাস বলে, জেল থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি যখন মিসরের শাসক হলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। আর কোরআন বলে যে, জেলখানায় তিনি 'বিদআ' ছিনিন' অর্থাৎ কয়েক বছর পর্যন্ত ছিলেন। আরবী ভাষায় 'বিদআ' শব্দটি দশ সংখ্যা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

যে দুইজন গোলাম জেলখানায় হযরত ইউসূফ (আঃ) এর সঙ্গে প্রবেশ করেছিল, ইতিহাসে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের একজন ছিল মিসর অধিপতির শরাব পরিবেশনকারীদের প্রধান আর অপরজন ছিল রুটি প্রস্তুতকারীদের প্রধান। এই দুই ব্যক্তিকে মিসর অধিপতি এই অপরাধে জেলে প্রেরণ করেছিল যে, একবার এক খাওয়ার মজলিসে পরিবেশিত রুটিগুলো তিক্ত লেগেছিল আর শরাবের একটা পাত্রে মাছি পাওয়া গিয়েছিল।

আল্লাহর কোরআনের বর্ণনা হলো, 'উভয়েই বললো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি বলুন, আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি।'

জেলখানায় হযরত ইউসূফ (আঃ) কে কি দৃষ্টিতে দেখা হত, এই কথা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উপরে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্মুখে রেখে বিবেচনা করলে এ সম্পর্কে আশ্চর্য বোধ হয় না যে, এরা হযরত ইউসূফ (আঃ) এর কাছেই কেনো স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইতে এসেছিল এবং 'আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ লোক' বলে তাঁর খেদমতেই বা কেন এত ভক্তি-শ্রদ্ধা পেশ করলো।

কারণ কারাগারের ভেতরের ও বাইরের সব লোকেরই জানা ছিল যে, এই ব্যক্তি কোন অপরাধ করে জেলে আসেন নি; বরং তিনি একজন সদাচারী ও পবিত্র চরিত্রের লোক। অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ও তিনি নিজের পবিত্রতা ও আল্লাহভীরুতার প্রমাণ দিয়েছেন। একালে সমগ্র দেশে তাঁর অপেক্ষা পবিত্রতর ব্যক্তি একজনও নেই। এমনকি দেশের ধর্ম-নেতাদের মধ্যেও তাঁর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণে কেবল কয়েদীরাই যে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো তাই নয়, বরং জেলখানার অফিসার ও কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এই লোক দু'জনের ভেতরে একজনের অর্থাৎ খাদ্য বিভাগের প্রধানের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল এবং মদ পরিবেশনকারী তার পূর্ব পদে বহাল হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক 'হক'-এর দাওয়াত

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার পূর্বে হযরত ইউসুফ (আঃ) যে ভাষণ দিলেন, তাঁর এই সুদীর্ঘ কাহিনীর মূল প্রাণবস্তুই হলো তাঁর সেই ভাষণ। আর স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত তওহীদ সংক্রান্ত ভাষণগুলোর মধ্যেও এটা অতি উত্তম সম্পদ। কোরআন আমাদেরকে জানায় যে, ইউসূফ (আঃ) এর ছিল নবী-জনোচিত এক 'মিশন' এবং এর দাওয়াত ও প্রচার কার্য তিনি জেলখানা থেকেই শুরু করেছিলেন।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই ঘটনাটিকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ময়দানে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে আগ্রহী, তাদেরকে অবশ্যই এই ঘটনাটি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা-বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় এবং এ থেকে আন্দোলনের উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র কাহিনী শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এ ঘটনা কোরআনে বর্ণনা করেননি। এর একাধিক দিক এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-গবেষণা করলে এমন কতকগুলো দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, যা অবগত হওয়া আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সেদিকগুলো হচ্ছে–

এই প্রথমবার আমরা হযরত ইউসূফ (আঃ)কে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে দেখতে পাই। এর পূর্বে তাঁর জীবন কাহিনীর আর যেসব দিক কোরআন মজীদ উজ্জ্বল রূপে আমাদের সম্মুখে পেশ করেছে, তাতে আমরা শুধু তাঁর উন্নত চরিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তাতে 'হক'-এর প্রচার ও দাওয়াত দেয়ার কোনো চিহ্নই আমরা দেখতে পাই না। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলো নিছক প্রস্তুতি ও আত্মগঠনের মধ্যে সীমিত ছিল। নবুয়াতের দায়িত্ব এই কয়েদখানার পর্যায়েই তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়। আর নবী হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম দাওয়াতী ভাষণ।

নিজের মূল পরিচয়ও তিনি এই প্রথমবার লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন। এর পূর্বে আমরা দেখতে পাই, তিনি অত্যন্ত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে সম্মুখে আসা যে কোনো অবস্থাকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে কবুল করেছেন। কাফেলার লোকেরা যখন তাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিসরে আনিত হলেন, যখন তাঁকে আযীযে-মিসর-এর কাছে বিক্রি করা হলো, যখন তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হলো-এর কোনো একটি পর্যায়েও তিনি নিজেকে ইবরাহীম (আঃ) এর প্রপৌত্র ও ইসহাক (আঃ) এর পৌত্র ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর পুত্র ছিলেন বলে কোনো পরিচয়ই দেননি। তাঁর বাপ-দাদা কোনো অপরিচিত লোক ছিলেন না। কাফেলার লোক মাদিয়ানবাসীই হোক কি ইসমাঈলী, তারা উভয় পরিবারের সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মিসরের লোকেরাও অন্তত হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল না, বরং হযরত ইউসূফ (আঃ) যে ভংগীতে তাঁর ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) এর উল্লেখ করছেন, তাতে অনুমান করা যায় যে, এই তিন মহান ব্যক্তির খ্যাতি মিসর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত ইউসূফ (আঃ) বিগত চার পাঁচ বছর যাবৎ যেসব দুরাবস্থায় পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন কখনো নিজের বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে সেসব হতে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করেন নি।

www.pathagar.com

সম্ভবত তিনি নিজেও অনুভব করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা কিছু বানাতে চান সে জন্য এই ধরনের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে থেকে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে নিছক 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের খাতিরে তিনি এই মহাসত্য উদঘাটন করলেন যে, তিনি কোনো নতুন ও অপরিচিত দ্বীন পেশ করছেন না; বরং হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-এর পরিচালিত তওহীদের দাওয়াত ও প্রচার কার্যের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সাথেই তাঁর সম্পর্ক। এ ধরনের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়েছিল যে, অতীতের সব কালে ও সব যুগেই সত্যপন্থী লোকেরা যেদিকে আহ্বান জানিয়ে এসেছেন তিনি সেই শাশ্বত চিরন্তন মহাসত্যের দিকেই লোকদের আহ্বান জানাচ্ছেন। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই তিনি নবী নির্বাচিত হয়েছেন।

হযরত ইউসূফ (আঃ) যেভাবে তাঁর দাওয়াত পেশ করার সুযোগ বের করেছিলেন তাতে 'হক'-এর দাওয়াত প্রচারের এক চমৎকার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থা এই ছিল যে, দুইজন লোক তাঁর কাছে স্বপ্নের কথা বলে নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রমাণ দিয়ে তাঁর কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চায়। জওয়াবে তিনি বলেন, 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো আমি তোমাদের বলবোই, কিন্তু আমি যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলবো তা কোন্ উৎস হতে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তা পূর্বেই জেনে নাও।'

এভাবেই তিনি তাদের কথার ভেতর থেকেই কথা বলার সুযোগ বের করে তাদের সম্মুখে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন শুরু করলেন। 'হক' প্রচারের এই ধরণ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, কারো মনে যদি সত্যই 'হক' প্রচারের আগ্রহ বর্তমান থাকে এবং এর কৌশলও তার জানা থাকে, তাহলে সে অতি সহজেই কথার ধারাবাহিকতাকে খুব সুন্দরভাবে নিজের কথার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর যার মনে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কোন চিন্তা বা আগ্রহই নেই, তাদের সম্মুখে সুযোগের পর সুযোগ এসে চলে যায়; বিরাট বিরাট মাহফিলে তারা বক্তা হিসেবে গমন করে, কিন্তু সেটাকে নিজের কথা বলার সুযোগ হিসেবে কখনো গ্রহণ করে না। এমন ধরনের ওয়াজ তারা করে যে, নিজেরা কি বলছে তাও তারা জানে না এবং অগণিত শ্রোতাদেরকে কোনদিকে নিয়ে যেতে চায় সে লক্ষ্যও তাদের থাকে না।

পক্ষান্তরে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে যে প্রচার করতে আগ্রহী হয়, সে তো সুযোগের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে থাকে আর সে সুযোগ এলেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুযোগ সন্ধান আর নির্বোধ লোকের অমার্জিত প্রচার-সময় জ্ঞান এবং উপযুক্ত পরিবেশের জ্ঞান যাদের নেই, মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে, রাস্তা-পথে যে কোন পরিবেশে, কার মন-মানসিকতা কেমন আছে

www.pathagar.com

তার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে দাওয়াত দেয়া শুরু করে–এই দুইয়ের মাঝে শত যোজন পার্থক্য রয়েছে। এই শেষোক্ত লোকেরা সময় ও সুযোগের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই লোকদের কানে জোরপূর্বক নিজের দাওয়াত ঠেসে দেয়ার চেষ্টা করে এবং এভাবে ইসলাম প্রচারের নামে লোকদের মধ্যে অযথা মতপার্থক্য সৃষ্টি ও বাকবিতন্ডা সৃষ্টি করে উল্টো ইসলামের প্রতিই তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ বানিয়ে দেয়।

এ ঘটনা থেকে লোকদের কাছে দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াত প্রচারের সঠিক পদ্ধতি কি হতে পারে, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত ইউসূফ প্রথমেই দ্বীনের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি পেশ করতে শুরু করেননি; বরং লোকদের সামনে তিনি দ্বীনের সেই মূল সূচনা বিন্দুর কথাই পেশ করেন যেখান থেকে সত্য দ্বীনের পথ বাতিল পন্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। এই সূচনা বিন্দুটি হলো তওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য। এমনকি এই পার্থক্যকেও তিনি এমন যুক্তিসংগত পন্থায় স্পষ্ট করে তোলেন যে, সাধারণ বুদ্ধির কোনো লোকই তা অনুভব না করে থাকতে পারবে না। বিশেষ করে এই সময় যাদের লক্ষ্য করে তিনি কথা বলছিলেন, তাদের মন-মগজে তো এই কথাটি তীরের মত বসে গিয়েছিল। কেননা তারা ছিল চাকরিজীবি গোলাম আর তারা এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করছিল যে, একজন মনিবের গোলাম হওয়া অনেক মনিবের গোলাম হওয়া অপেক্ষা ভালো। অনুরূপ ভাবে তারা আরো উপলব্ধি করেছিল যে, বান্দাদের বন্দেগী করা অপেক্ষা সারা জাহানের মালিক ও মনিবের গোলামী করাই অধীক কল্যাণকর।

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম এখানে শ্রোতাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে ও তাঁর ধর্ম অবলম্বন করতেও বলেন নি। তাঁর দাওয়াত দেয়ার ভঙ্গি ছিল বড়ই বিস্ময়কর ধরনের। তিনি লোকদেরকে বললেন, 'চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। তিনি কেবল নিজের ছাড়া আমাদেরকে আর কারোই বান্দাহ্ বানান নি, কিন্তু লোকেরা তাঁর শোকর করে না, বরং শুধু শুধুই তারা মনগড়াভাবে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নেয় ও সেগুলোরই দাসত্ব করে।'

এমন কি তিনি শ্রোতাদের ধর্মমতেরও সমালোচনা করেন, কিন্তু তা করেন খুবই বুদ্ধিমত্তা সহকারে। তাতে কারো মনে একবিন্দু কষ্ট দেয়ার নীতি তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি শুধু এটুকুই বলেন যে, এই যে সব মাবুদকে তোমরা অন্নদাতা, নে'মাত দাতা, দুনিয়ার মালিক, ধন-সম্পদের প্রভু, বা রোগ-স্বাস্থ্যের নিয়ামক ইত্যাদি বলে অভিহিত করো, এ সবই অন্তঃসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নামগুলোর পেছনে কোন প্রকৃত অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী মালিক ও প্রতিপালক বলে কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। আসলে সবকিছুরই মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, যাকে

www.pathagar.com

তোমরাও বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী বলে মানো। তিনি অপর কারো জন্য প্রভু, উপাস্য বা মাবুদ হওয়ার কোন সনদই নাযিল করেন নি। জগত পরিচালনার সমস্ত অধিকার ও ইখতিয়ার তিনি নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশই এই যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারোই বন্দেগী করবে না।

এভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবনের মূল্যবান প্রায় দশটি বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনগুলো পার হয়ে গেছে। কারাগারে তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেননি। ইসলামী আদর্শ কারা-কর্তৃপক্ষ এবং বন্দীদের মাঝে প্রচার করেছেন। তাদেরকে আল্লাহর গোলামী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর যমীনে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাঁরা যে কোনো অবস্থাতেই থাকুন না কেনো, মুহূর্ত কালের জন্যও তাঁরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে গাফিল হন না।

হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর রহমতের ওপরে নির্ভরশীল ছিলেন, তিনি ধৈর্যহারা হননি। সমস্ত পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন তারপরে কারাগার থেকে তাকে সম্মানের সাথে বের করে এনেই মহান আল্লাহ তাঁকে দেশের শাসকের পদে আসীন করেছিলেন।

ফুল যেখানেই ফোটে তার আপন সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ সে ফুলের সৌরভ অনুভব করে। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে মহান আল্লাহ সে যুগের সুগন্ধ যুক্ত ফুল হিসেবেই শুধু প্রেরণ করেননি, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সেই ইউসুফ নামক ফুল থেকে সুগন্ধি গ্রহণ করবে। সে ফুল যুগ যুগান্তরে সৌরভ ছড়াবে। সে ফুল আজ পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তাঁর অমোছনীয় সেই সুবাস রয়ে গেছে এবং থাকবে।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

শুধু ইউসুফ আলাইহিস্ সালামই নন, তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই, তিনিও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি, সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে হারিয়েও তিনি এতটুকু ধৈর্যহারা হননি। মানুষের কাছে তিনি তাঁর হৃদয়ের ব্যথা বেদনা প্রকাশ করেননি। আল্লাহর কাছেই তিনি আবেদন পেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর অন্যান্য ছেলেদের কি বলেছিলেন, কোরআন আমাদেরকে শোনাচ্ছে–

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ –

আমি সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ করবো (সূরা ইউসুফ-১৮)

www.pathagar.com

তিনি তাঁর অন্যান্য সন্তানদেরকে বলেছিলেন, আমি আমার মনের যন্ত্রণার কথা এক মাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছেই করছি না এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হচ্ছি না। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় শুধু তারাই যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সে কথা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে শুনাচ্ছেন–

قَالَ اِنَّمَاَ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ، يٰبَنِيَّ اذْ هَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلاَ تَا يْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ، اِنَّه لاَيَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ–

আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার আবেদন আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো কাছেই করছি না। আর আল্লাহ্র কাছ থেকে আমার যা জানা আছে তা তোমাদের নেই। হে আমার ছেলেরা ! তোমরা গিয়ে ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সন্ধান করো। আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় শুধু কাফেররাই। (সূরা ইউসুফ)

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বয়সের একটা প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর অন্যান্য ভাইগণ খাদ্যের সন্ধানে মিসরে যেতে বাধ্য হলেন, এক পর্যায়ে যখন তাঁর সাথে ভাইদের পরিচয় হলো, তখন তিনি মিসরের শাসক। ভাইদেরকে তিনি কোন শাস্তি দেননি এমনকি কোনো কটু কথাও বলেননি। তাদের কাছ থেকে তিনি যখন শুনলেন, পিতার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছে। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতার জন্য নিজের শরীর মোবারকের জামা তাঁর ভাইদেরকে দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা এই জামা আব্বার চেহারার ওপর রাখলেই আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর হারানো দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। তখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর পবিত্র জামা নিয়ে মিসর থেকে বাড়ির পথে অর্থাৎ কেনআনে যাত্রা করেছিল।

মিসর এবং কেনআন, এই দুইটি দেশের মাঝে বেশ ব্যবধান। তবুও মহান আল্লাহ্ তাঁর কুদরতী ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর শরীরের গন্ধ হযরত

www.pathagar.com

ইয়াকুব (আঃ) এর নাসারন্ধ্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই অনুভূতির কথা প্রকাশ করতেই তাঁর পরিবারের লোকজন তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল, এটা আপনার মনের কল্পনা। যেদিন থেকে ইউসুফ হারিয়ে গেছে, সেদিন থেকে আপনি তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করছেন। সেই চিন্তা আপনাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, আপনি এখন পর্যন্ত আশায় আছেন, ইউসুফ একদিন ফিরে আসবেই। এটা আপনার সেই পুরনো কল্পনা। এ সম্পর্কে কোরআন বলছে–

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلاَ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ، قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ–فَلَمَّآ اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصِيْرًا، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ، اِنِّىْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ، قَالُوْا يٰاَبَانَا اسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ، قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ، اِنَّه هُوَالْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ–

এই কাফেলা যখন (মিসর থেকে) যাত্রা করলো, তখন তাদের পিতা (কেনানে বসে) বললো, আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি। তোমরা যেন বলে না বসো যে আমি বয়সের কারণে দিশাহারা হয়ে পড়েছি। ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহর কসম ! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন। তারপর যখন সুসংবাদ বহনকারী এসে পৌঁছলো, তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখের ওপর রাখলো আর সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলো। তখন সে বললো, আমি না তোমাদেরকে বলছিলাম, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না। সবাই বলে উঠলো, আব্বাজান ! আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন। আমরা সত্যই অপরাধী। সে বললো, আমি আমার রব-এর কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা ইউসুফ-৯৪-৯৮)

আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর এই কথা থেকে নবী-রাসূলদের অসাধারণ শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কাফেলা হযরত ইউসূফ (আঃ) এর জামা নিয়ে সবেমাত্র মিসর থেকে রওয়ানা করলো আর এই দিকে শত শত মাইল দূরত্বে থেকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) আপন সন্তান ইউসুফ

www.pathagar.com

(আঃ) এর শরীরের 'সুবাস' পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও জানতে পারা যায় যে, নবী-রাসূলদের এই শক্তি তাঁদের নিজস্ব ও স্ব-উপার্জিত নয়; এটা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র দান। আল্লাহ্‌ই দান করেছেন বলে তারা এই শক্তির অধিকারী হয়েছেন। আর আল্লাহ্ যখন যে পরিমাণ চান, তাদেরকে সেই শক্তি কাজে লাগানোর সুযোগ দেন। হযরত ইউসূফ (আঃ) অনেক বছর ধরে মিসরে রয়েছেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইয়াকুব (আঃ) তাঁর কোনো গন্ধ অনুভব করলেন না। কিন্তু সহসাই অনুভূতি শক্তি এত বেশী তীব্র হয়ে উঠলো যে, তাঁর জামা নিয়ে মিসর থেকে রওয়ানা হতেই তিনি বাড়িতে বসেই ইউসুফ (আঃ) এর সুবাস লাভ করতে শুরু করলেন।

ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহর কসম! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন, এই কথাগুলো ইয়াকুব (আঃ) এর পরিবারের লোকদের। তাদের কথার ধরণ দেখে মনে হয় যে, গোটা পরিবারে ইউসূফ (আঃ) ছাড়া আর কেউ পিতার মর্যাদা ও মূল্য বুঝতো না এবং ইয়াকুব (আঃ) নিজেও তাঁর পরিবারের লোকদের মানসিক ও নৈতিকহীনতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছিলেন।

পক্ষান্তরে যে ঘরের প্রদীপের আলো বাইরের জগতকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলছিল; কিন্তু স্বয়ং সে ঘরের লোকেরা ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর তাদের দৃষ্টিতে সে 'প্রদীপ' এক টুকরা কয়লার অধিক কিছু নয়। প্রকৃতির এই নির্মম পরিহাসের সাথে ইতিহাসের প্রায় সকল বড় বড় ব্যক্তিত্বেরই সাক্ষাত ঘটেছে। এই পৃথিবীতে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য যারা আগমন করেছেন, নবী-রাসূলদের অবর্তমানে যারা ইসলামী মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য অক্লান্ত শ্রম দান করছেন, আগামীতেও করবেন, ইসলামকে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা নিজের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তাদের অধিকাংশের পরিবারের লোকজনের অবস্থা হলো, তারা সত্য পথ অবলম্বন করতে আগ্রহী হয় না। অথচ তাদের ঘরের ভেতরেই মহাসত্যের মশাল আলো বিকিরণ করতে থাকে। যেমন ইয়াকুব (আঃ) এর কয়েকজন সন্তান, তাদের পিতা এবং ভাই হলেন আল্লাহর নবী। কিন্তু তারা সেই পিতার কাছ থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেদেরকে পূর্ণ মুসলিমে পরিণত করতে পারেনি।

এখানে এ কথাও চরম সত্য যে, অধিকাংশ নবীগণ যখন দায়িত্ব পালনের নির্দেশ লাভ করেছেন, তখন তারা অবিবাহিত বা সন্তান-সন্ততিহীন ছিলেন না। তাদের সন্তান সন্ততিও নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে পরিবার গঠনের শুরু

www.pathagar.com

থেকেই তাদেরকে আল্লাহর আইন পালনে অভ্যস্থ করার কোন সুযোগ ছিল না। তবুও নবীগণ তাদের সন্তানদের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যেন তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

বর্তমানে পরহেজগার হিসেবে পরিচিত এমন কিছু লোকজন দেখা যায়, যাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী। তাদের সন্তান কেনো এমন হলো, এ প্রশ্ন তাদের কাছে করলে তারা নবীদের সন্তানদের উদাহরণ পেশ করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু পারিবারিক জীবন গঠন করার পূর্বেই যিনি দ্বীনি আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়েছেন, তিনি তো তার পরিবারে ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করে এমন ধরনের ব্যবস্থা প্রথম থেকেই গ্রহণ করবেন। যেন সেই পরিবারে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারে। দ্বীনি আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ লোকজন এ দায়িত্ব পালন করেন না। ফলে তাদের সন্তান-সন্ততি দ্বীনি আন্দোলন থেকে বিরত থাকে। সন্তানকে তারা শিশু বয়সে সাথে নিয়ে আন্দোলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে অভ্যস্থ করে তুলেন না। এমনকি অনেকে মসজিদেও সাথে করে নিয়ে যান না। শিশু বয়স থেকে শিশুকে যে কাজে অভ্যস্থ করে তোলা হয়নি, ইসলাম বিরোধী এই পরিবেশে তারা বড় হয়ে দ্বীনি আন্দোলন পসন্দ করবে কিভাবে? এ কথা ভালোভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, এসব সন্তানদের পিতাগণ নবীদের সন্তানদের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

ঈমানদার ব্যক্তির গোটা জীবনই হলো ধৈর্যের জীবন। আল্লাহর ওপরে সে থাকে আশাবাদী। কারণ সে জানে, তার ওপরে যতবড় বিপদই আসুক না কেন আশ্রয় লাভ করার একটি স্থান তার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে উন্মুক্ত রয়েছে, তাঁর আশ্রয় দাতা হলেন আল্লাহ। আমরা হযরত ইউনুস (আঃ) এর জীবনে দেখতে পাই, যখন তাঁকে বিশাল আকৃতির একটি মাছ উদরস্থ করে পানির অতল তলদেশে চলে গেল–এমন বিপদ তার ওপরে নেমে এলো যে, এমন ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদে কোন মানুষ কখনও নিমজ্জিত হয়নি। কোন মানুষ এই ধরনের বিপদের কথা কল্পনাও করেনি। তার ওপরে যখন এমন বিপদ দেখা দিল তখন তিনি অধৈর্য হননি। আল্লাহর ওপরে ছিল তার অবিচল আস্থা।

www.pathagar.com

ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে তিনি বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একদিকে রাতের ঘন অন্ধকার। অপরদিকে পানির নিচের অন্ধকার। আরেকদিকে মাছের পেটের অন্ধকার। এই ত্রিবিধ অন্ধকারে বিপদে নিমজ্জিত হয়ে তিনি মাছের পেটের ভেতরে বসে স্থির বিশ্বাসে আর্তচিৎকার করে উঠেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকেই শুধু বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলেন বিষয়টি এমন নয় বরং আয়াতে বলা হয়েছে, আমার মুমিন বান্দাদের মধ্যে যারা ভুল করবে এবং সেই ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা ও সাহায্য চাইবে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে সাহায্য করবো। মহান আল্লাহ বলেন−

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لاَّاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ، اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَه، وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ−

আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো, 'তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।' তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া-৮৭-৮৮)

এমন একস্থান থেকে হযরত ইউনুস (আঃ) সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, যেখান থেকে আবেদন করলে সে আবেদন কেউ শুনতে পাবে না এবং সে আবেদন শোনার মত শক্তি ও ক্ষমতাও কারো নেই। তার সে করুণ আর্তনাদ পানির ভেতরে কেউ শুনতে পেলো না, পৃথিবীর কেউ শুনতে পেলো না। আকাশের কেউ শুনলো না। কিন্তু সর্বশ্রোতা মহান আল্লাহ সে আবেদন শুনেছিলেন। তিনি মাছের পেটের ভেতরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে দিলেন যে, মাছ বাধ্য হলো তাকে উদগীরণ করে দিতে।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার ইউনুসের ডাকে সাড়া দিলাম, তাকে বিপদ মুক্ত করলাম। এমনিভাবে আমার কোনো মুমিন বান্দাহ্ যখন কোন অপরাধ করে বসে এবং এ কারণে সে পৃথিবীতে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর সে নিজের ভুল অনুভব করতে পেরে আমার কাছে যখন সাহায্য কামনা করে, তখন আমি তাকে সাহায্য

www.pathagar.com

করি। এটাই আমার নীতি, আমি আমার বিপদগ্রস্ত বান্দার আহ্বান শুনে নীরব থাকি না। আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন–

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا–اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا–

জেনে রাখো, দুঃখ আর কষ্টের পরে রয়েছে সুযোগ সুবিধা আর অস্বচ্ছলতার সাথেই রয়েছে উদার সস্বচ্ছলতা। (সূরা আলাম নাশরাহ্)

যতবড় বিপদই আসুক না কেন, এই বিপদের পরেই মহান আল্লাহ তাঁর গোলামদের ওপরে রহমত নাযিল করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, অন্ধকার যত গভীর হয়, পূর্বাশার প্রান্তে সূর্যের উদয় লগ্ন ততই এগিয়ে আসে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর গোলামদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন–

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ–

তোমরা মনভাঙা হয়োনা, চিন্তাগ্রস্থ হয়োনা, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরাণ- ১৩৯))

হতাশা মানুষের চিন্তার জগতে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে আসে, বিবেক বুদ্ধি প্রকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ডক্টর আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

না-হো-না-উমিদ, না উমিদি জাওয়ালে ইল্‌ম ও ইরফান হ্যায়
উমিদে মর্দে মুমিন হ্যায় খোদাকে রাজদানুঁ মে।

হতাশাবাদীদের অন্তর্গত হয়ো না, হতাশা-নৈরাশ্য মানুষের জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিকে ধ্বংস করে। মুমিনদের আশা আল্লাহ তা'য়ালার রহস্যবিদ বান্দাগণের অন্তর্গত।

শয়তানের প্ররোচনা ও 'সবর'

শয়তান স্বয়ং অস্থির চিত্তের ও অহঙ্কারী। এ জন্য যারা ধৈর্য অবলম্বন করে, শয়তান নানাভাবে তাদের ভেতরে অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে তাদেরকে মহান আল্লাহর রহমতের ছায়া থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, বিশ্বনবীর উপস্থিতিতে একবার একজন লোক হযরত আবু বকর (রাঃ) এর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করতে থাকে। তিনি নীরবে প্রতিপক্ষের কটুবাক্য শুনতে থাকেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকর (রাঃ) এর নীরবতা দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষ কটুবাক্য প্রয়োগ করেই চলেছে। এক সময় হযরত আবু বকরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো এবং তিনি প্রতিপক্ষকে কঠোর ভাষায় জবাব দিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের গালিগালাজের জবাব দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো এবং বিরক্তির ভাব ছেয়ে গেলো। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর আল্লাহর রাসূলের এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। পথিমধ্যে তিনি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি যখন আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করছিলো, তখন আপনি নীরবে হাসছিলেন, কিন্তু যখনই আমি তার গালির জবাব দিলাম আপনি অসন্তুষ্ট হলেন, এর কারণ কি?

আল্লাহর রাসূল বললেন, তুমি যতক্ষণ নীরব থেকে প্রতিপক্ষের কটুবাক্য সহ্য করছিলে ততক্ষণ তোমার সাথে থেকে একজন ফেরেশ্‌তা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু তুমি যখনই লোকটির গালির জবাব দিলে তখনই সেই ফেরেশ্‌তার স্থানে শয়তান এলো। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

শয়তান নানাভাবে প্ররোচিত করে ধৈর্যশীলদেরকে ধৈর্যহীনতার পথে ঠেলে দিতে চায়। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা অনুভব করতে পারো তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন। (সূরা হামীম সিজ্‌দা)

(শয়তান কিভাবে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের দ্বারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এ বিষয়ে আমরা তাফসীরে সাঈদী-আমপারা-সূরা নাস-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সূরা নাস-এর তাফসীর একত্রে পাঠ করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা সহজ হবে।)

www.pathagar.com

মুমিনের জীবন ও 'সবর'

ঈমান আনার পরে একজন মানুষকে তার মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক পদে ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'ঐ তিন সময় ধৈর্য অবলম্বন করার সর্বোত্তম সময় হলো, বিপদ-মুসিবতে নিপতিত হলে ধৈর্য ধারণ করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং এই বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে কিভাবে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে, যেমন নামাযের ক্ষেত্রে। নামাযে যখন কোনো মানুষ দন্ডায়মান হয়, তখন তো সে মহান আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয়। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যেমন ধৈর্যহীনতার পরিচয় তেমনি মহান আল্লাহর শানে বেয়াদবির শামিল।

রাষ্ট্রপ্রধান, কোনো মন্ত্রী বা রাষ্ট্রীয় পদে আসীন ক্ষমতাবান কোনো লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। কখনো দেখা পাওয়া যায় কখনো পাওয়া যায় না। নানাজনের কাছে ধর্ণা দিয়ে যদিও কারো ভাগ্যে দেখা করার সুযোগ ঘটে তবুও সংক্ষিপ্ত সময়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হয়। যাদের ভাগ্যে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটে তারা কেউ তাড়াহুড়া করে না। বরং কতটা বেশী সময় তার সামনে থেকে নিজের অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করতে পারবে মানুষ সেই সুযোগ খুঁজতে থাকে। যিনি সাক্ষাৎ করছেন এবং যার সাথে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে তারা উভয়ে মানুষ এবং মানুষের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

কিন্তু নামাযের মাধ্যমে যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে, তিনি অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের যে কোনো প্রয়োজন মুহূর্তকালের মধ্যে পূরণ করতে সক্ষম। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কারো কাছে ধর্ণা দিতে হয় না, লাইন ধরতে হয় না এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সাক্ষাতের জন্য সময় ভিক্ষা চাইতে হয় না। গোপনে-প্রকাশ্যে, আলোয়-অন্ধকারে এবং যমীনে ও আকাশে যেখানে খুশী, সেখানেই তাঁকে সিজ্‌দা দিয়ে যে কোনো প্রয়োজনের কথা তাঁর দরবারে পেশ করা যায়। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'বান্দা ঐ সময়ে মহান আল্লাহর সবথেকে কাছাকাছি হয়ে যায় যখন সে আল্লাহকে সিজ্‌দা করে।' নামায এমনই এক ইবাদাত যে, কোনো মাধ্যম ব্যতীতই বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়। বান্দা যখন নামাযে দাঁড়াবে, তখন তার মনে এই চেতনা জাগ্রত থাকতে হবে যে, সে আল্লাহকে দেখছে না, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে দেখছেন।

www.pathagar.com

সে আল্লাহর কথা শুনছে না কিন্তু সে যা বলছে তা তিনি শুনছেন এবং জবাব দিচ্ছেন। সে শূন্য কোনো স্থানে সিজ্‌দা দিচ্ছে না বরং সে আল্লাহ্ তা'য়ালার পায়ের ওপরে মাথা রেখে তাঁকে সিজ্‌দা দিচ্ছে। তার প্রত্যেকটি স্পন্দন আল্লাহ্ তা'য়ালা লক্ষ্য করছেন এই চেতনা তার ভেতরে জাগ্রত রাখতে হবে। সম্মান-মর্যাদা, হায়াত, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা তথা সমস্ত কিছু চাওয়া-পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায। এই নামাযে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর মানুষ এই নামাযেই সর্বাধিক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করে। যথাযথভাবে চার রাকাআত ফরজ নামায আদায় করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তার চার ভাগের এক ভাগ সময়ে চার রাকাআত নামায শেষ করে।

নামায আদায় করতে হবে পরম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভয়ের সাথে। যখন যে ওয়াক্তের নামায আদায় করা হচ্ছে, সে সময় মনে এই চেতনা জাগ্রত থাকবে যে, এরপরের ওয়াক্ত নামায আদায় তথা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা করার সুযোগ নছিবে আর না-ও জুটতে পারে। মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। সুতরাং এই নামাযই তার জীবনের শেষ নামায। এই চেতনা যদি মনে জাগ্রত থাকে, তাহলে তো স্বাভাবিকভাবেই সে ব্যক্তি পরম যত্নের সাথে গভীর শ্রদ্ধায় আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা করবে। কিন্তু অধিকাংশ নামাযীর মধ্যে এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদ থেকে কখন ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে, এই চিন্তায় তারা অস্থির থাকে।

শুধু নামাযই নয়, মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে পরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। রোযা পালনের ক্ষেত্রে অনাহারে সারা দিন অতিবাহিত করা–এ ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। রোযা রেখে অস্থিরতা প্রকাশ করা, কথায় কথায় ক্রোধান্বিত হওয়া, চেহারায় মলিনতা ফুটিয়ে তোলা অসহিষ্ণুতার নামান্তর। যে উদ্দেশ্যে রোযা ফরজ করা হয়েছে, এসব কাজ সেই উদ্দেশ্যের বিপরীত। মানুষের দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের মধ্যে হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের গুরুত্ব যেমন, রোযা পালনের ক্ষেত্রে পানাহার ত্যাগ করার গুরুত্বও অনুরূপ। শুধুমাত্র পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নামই রোযা নয়। রোযা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ইবাদাতের দুটো দিক রয়েছে। একটি হলো বাহ্যিক দিক অন্যটি হলো অভ্যন্তরীণ দিক। যেমন নামায, মানুষ আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেও নামায আদায় করতে পারে আবার প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যেও নামায আদায় করতে পারে।

জিহাদের ময়দানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেও জিহাদ করতে পারে আবার লোক সমাজে প্রশংসা অর্জন, নিজের বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যেও জিহাদ করতে পারে। কিন্তু রোযা এমন একটি ইবাদাত, যা প্রদর্শন করার কোনো উপায় নেই। এই

www.pathagar.com

জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, রোযার পুরস্কার মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং প্রদান করবেন। যে আল্লাহর ভয়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসের খর-তাপের মধ্যে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ার পরও সামনে উপস্থিত ঠান্ডা পানির পেয়ালার দিকে আল্লাহর ভয়ে রোযাদার হাত বাড়ায় না। যে আল্লাহর ভয়ে রোযাদার ধৈর্যের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানি পানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সেই আল্লাহর ভয়েই রোযাদার ব্যক্তি মিথ্যা বলা থেকে, গীবত, চোগলখুরী, পরচর্চা-পরদিন্দা, অপরের দোষ অনুসন্ধান, লজ্জাহীনতা, সুদ-ঘুষ তথা যাবতীয় অবৈধ কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে এবং এসব কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তা অবলম্বন করবে। রোযা পালনের জন্য পেটকে যেমন খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে, অনুরূপভাবে দেহের মন-মস্তিষ্কের দ্বারাও রোযা পালন করতে হবে। চোখ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কিছু না দেখার অর্থ হলো চোখের রোযা। মহান আল্লাহর অপসন্দীয় স্থানে গমন করা থকে পা-দুটোকে বিরত রাখা হলো পায়ের রোযা। আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কর্ম থেকে হাত দুটোকে বিরত রাখা হলো হাতের রোযা। মন-মস্তিষ্ক দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের বিপরীত কিছু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা হলো মন-মস্তিষ্কের রোযা।

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হলে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। এই ধৈর্য অবলম্বন করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সফলতা। বাড়িতে বৃদ্ধা মাতা অসুস্থ, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করা যাচ্ছে না। স্ত্রীর পরনে কাপড় নেই, সন্তান-সন্ততি ছিন্ন পোষাকে রয়েছে, অর্থের অভাবে ভালো স্কুলে পড়ানো যাচ্ছে না। নিজের মাথা গোঁজার মতো একটি বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে বাস করতে হয়, বাড়ির মালিক কটু কথা শোনায়। অবৈধ সুযোগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অবৈধ পথে অর্থোপার্জনের অনেক পথ খোলা রয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এসব অবৈধ পথ অবলম্বন করলেই অভাব মোচন হয়। কিন্তু যে কোনো অবৈধ পথ থেকে নিজেকে পরম ধৈর্যের সাথে বিরত রেখে সততার পথে অটল অবিচল থাকতে হবে।

যখন থেকে ঈমান আনা হলো, সেই মুহূর্ত থেকেই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানদারকে জীবনের প্রত্যেক পদে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। এদিক ওদিক হাত বাড়ালেই বিপুল অর্থের মালিক হওয়া যায়। সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাউকে একটু অবৈধ সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেই অঢেল অর্থ লাভ করা যায়, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করলেই অনেক কিছু লাভ করা যেতে পারে। এসব সুযোগ যখন সামনে উপস্থিত হয়, শয়তান তখন অভাব আর দৈন্যতার চিত্রগুলো দৃষ্টির সামনে প্রকট করে তোলে।

www.pathagar.com

সুস্বাদু ফলের মৌসুম চলে যাচ্ছে, প্রতিবেশীর সন্তান সেই ফল খাচ্ছে আর নিজের সন্তান অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখছে। ছিন্ন পোষাকের কারণে সন্তানকে স্কুলের সহপাঠিরা বিদ্রুপ করে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর পরনের দামি শাড়ির দিকে নিজের স্ত্রী করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভালো তরকারী নেই, সন্তান-সন্ততি পেট ভরে ভাত খায় না। অসুস্থ বৃদ্ধা মাতা ওষুধের অভাবে রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। এসব যন্ত্রণাদায়ক চিত্রগুলো শয়তান ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখের সামনে প্রকট করে তুলবে, যখন অবৈধ অর্থ লাভের সুযোগ সামনে এসে উপস্থিত হবে। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করা বড়ই কঠিন, তবুও ঈমানদারকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে ইসলামের বিপরীত শক্তি বিশাল বিপুল শক্তি ও জাঁকজমক সহকারে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। অর্থ, জনশক্তি, উপায়-উপকরণ ও প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করে তারা ময়দানে তৎপরতা প্রদর্শন করে। অপরদিকে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত লোকগুলো সংখ্যায় তাদের তুলনায় নিতান্তই অল্প। এদের অর্থ নেই, জনশক্তি নেই, বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার মতো তেমন কোনো উপায়-উপকরণও নেই। এই অবস্থায় এক শ্রেণীর লোক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে বলতে থাকে, এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে ঐ বিশাল শক্তির সাথে কি মোকাবেলা করা সম্ভব? বদরের প্রান্তরে মুমিনদের সংখ্যা ছিল প্রতিপক্ষের তুলনায় নিতান্তই অল্প। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন–

يَاَيُّهَاالنَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْامِائَتَيْنِ، وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا–

হে নবী! মুমিন লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে দশ ব্যক্তি যদি ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুই শতের ওপর জয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এমন থাকে, তাহলে সত্য অবিশ্বাসীদের এক হাজার লোকের ওপর তারা বিজয়ী হতে পারবে। (সূরা আনফাল-৬৫)

ধৈর্যই সফলতার চাবিকাঠি। অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্য নামক সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করতে না পারলে কোনোক্রমেই সফলতা অর্জন করা যাবে না। প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁর জাতির পক্ষ থেকে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তারা ধৈর্যের বর্ম দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করেছেন। হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ)

www.pathagar.com

বলেন, যে সময় ইসলাম বিরোধিদের নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না?' অর্থাৎ আমরা তো প্রতিপক্ষের নির্যাতনে শেষ হয়ে গেলাম, এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির জন্য আপনি কি মহান আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করেন না? আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) বলেন, আমার এ কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মোবারক আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, 'তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিন দল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর থেকেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়। আল্লাহর শপথ! এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বরামাউত পর্যন্ত নিশঙ্ক চিত্তে ভ্রমণ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

অর্থাৎ ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে, তাহলেই সফলতা অর্জন করা যাবে। ধৈর্যের মধ্যে বিরাট বরকত রয়েছে। সূরা আনফালে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلْـئٰنَ خَـفَّـفَ اللّٰـهُ عَـنْـكُـمْ وَعَـلِـمَ اَنَّ فِـيْـكُـمْ ضَـعْـفًـا-فَـاِنْ يَّـكُـنْ مِّـنْـكُـمْ مِّـائَـةٌ صَـابِـرَةٌ يَّـغْـلِـبُـوْا مِـائَـتَـيْـنِ-وَاِنْ يَّـكُـنْ مِّنْـكُـمْ اَلْفٌ يَّـغْـلِـبُـوْٓا اَلْـفَـيْـنِ بِـاِذْنِ اللّٰهِ-وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

অতএব তোমাদের মধ্যে যদি এক শত লোক ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুইশতের ওপর আর হাজার লোক এমন হলে দুই হাজার লোকের ওপর আল্লাহর আদেশে বিজয়ী হবে। কিন্তু আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সঙ্গী হন, যারা ধৈর্য ধারণকারী।

স্বাধীনভাবে আল্লাহর গোলামীর ক্ষেত্রে 'সবর'

এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পসন্দ করে কিন্তু বিষয়টি তার পরিচিত মহল বা কর্মক্ষেত্রে গোপন রাখে। মনে মনে চিন্তা করে, সে

www.pathagar.com

যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পসন্দ করে, এই কথাটি জানাজানি হয়ে গেলে লোকজন তাকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়ীক, পশ্চাদপদ বলবে। কোনো ধরনের বিপদ-মুসিবত আসবে বা কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি চাকরী থেকেও বরখাস্ত করতে পারে, তখন অনাহারে থাকতে হবে। অথচ সাহাবায়ে কেরামদের ওপরে যখন নির্যাতন চলেছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তবুও তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা যে লোকগুলোকে খুঁজে বের করে নির্যাতন করছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

ধৈর্যের কোন্ সীমায় উপনীত হলে একজন মানুষ এভাবে নিজেকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পারে, তা অনুধাবন করার বিষয়। আল্লাহর গোলাম হিসাবে নিজেকে গড়তে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে আল্লাহর গোলামী করতে হবে। আর আল্লাহর গোলামী স্বাধীনভাবে করতে গেলে যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে হয়, তাহলে তাই করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ، كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا، نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ، الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُوْنَ، وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا
وَاِيَّاكُمْ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো! আমার যমীন প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই বন্দেগী করো। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি জান্নাতের উঁচু ও উন্নত ইমারতের মধ্যে রাখবো, যেগুলোর নিচে দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কতই না উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের জন্য–তাদের জন্য যারা সবর করেছে এবং

যারা নিজেদের রব-এর প্রতি আস্থা রাখে। কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহ্ই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা আনকাবুত-৫৬-৬০)

মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের লক্ষ্য করে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা যেখানে অবস্থান করছো, সেখানে যদি তোমরা আল্লাহর গোলামী করতে অপারগ হও, আল্লাহর গোলামী করার পরিবেশ না থাকে, আপন প্রভুর আইন-বিধান অনুসরণ করতে না পারো, তাহলে সেস্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহর পৃথিবী বিশাল-বিস্তীর্ণ, কোনো সঙ্কীর্ণ স্থান নয়। যেখানেই তোমরা স্বাধীনভাবে আপন প্রভুর গোলামী করতে পারবে, আল্লাহ্র বিধান স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে, সেখানে চলে যাও অর্থাৎ হিজরত করো। দেশ, জাতি ও চাকরীর মায়ায় এমন স্থানে থেকো না, যেখানে থাকলে আল্লাহ্র গোলামী করা যায় না। সুতরাং দেশ, জাতি ও চাকরীর গোলামী করো না, আল্লাহর গোলামী করো।

চাকরী, দেশ ও জাতিকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে যদি আল্লাহ্র গোলামী করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহলে এসব কিছুকে ত্যাগ করে আল্লাহ্র গোলামী করার দাবীকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এটাই ঈমানের পরিচয়। এই ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী, তারা চাকরী, দেশ ও জাতিকে অগ্রাধিকার দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা প্রকৃতই মহান আল্লাহ্র গোলামী করতে আগ্রহী, তারা দেশ ও জাতি প্রেমিক হতে পারে কিন্তু দেশ, জাতি ও চাকরীর পূজারী হতে পারে না। তার কাছে আল্লাহ্র গোলামী হয় সমস্ত কিছুর থেকে অধিক প্রিয় এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে সে আল্লাহ্র গোলামীর মোকাবেলায় বিকিয়ে দেয় কিন্তু পৃথিবীর কোনো স্বার্থের কাছে আল্লাহ্র গোলামীকে বিকিয়ে দেয় না।

আল্লাহর গোলামীকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে, নিজেকে কোরআনের অনুসারী বলে পরিচয় দিতে গেলে বা কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজে জড়িত, এই পরিচয় দিতে গেলে সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে অথবা প্রাণও হারাতে হতে পারে, এসব অমূলক চিন্তা যেনো তোমাদেরকে দুর্বল করতে না পারে। কারণ সম্মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ বা পৃথিবীর কোনো একটি স্বার্থও চিরস্থায়ী কোনো জিনিস নয়। এমনকি তোমার নিজের প্রাণও চিরস্থায়ী নয়। তোমার চোখের সামনেই দেখছো, একজন মানুষও চিরঞ্জীব নয়। একদিন না একদিন সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। চিরকাল থাকার জন্য কোনো একটি প্রাণের আগমনও এই পৃথিবীতে ঘটেনি।

www.pathagar.com

সুতরাং এই পৃথিবীতে আল্লাহর গোলামীর পথ পরিহার করে কিভাবে নিজের সম্মান মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা অক্ষুন্ন রাখবে এবং নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে চলবে, এসব বিষয় নিয়ে অযথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না। বরং চিন্তা করো, ঈমানকে কিভাবে হেফাজত করবে, আল্লাহর গোলাম হিসাবে কিভাবে নিজেকে সঠিক পথে অটুট রাখবে। কারণ শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। যদি পৃথিবীতে নিজের সম্মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের আশায় ঈমানের পথ পরিহার করো, নিজের প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে ঈমান বিকিয়ে দাও, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং আমার দরবারে যখন তোমাদেরকে উপস্থিত হতেই হবে, তখন কি সম্পদ নিয়ে আমার সামনে দন্ডায়মান হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে জীবন পরিচালিত করো। দেশ, জাতি, সম্মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা ও প্রাণের জন্য ঈমানকে কোরবানী দেবে, না ঈমানকে হেফাজত করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত স্বার্থকে কোরবানী দেবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি মনে করে থাকো যে, পৃথিবীতে আমার বিধান অনুসরণ করে জীবন পরিচালিত করলে তোমরা পৃথিবীতে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, সম্মান-মর্যাদা তথা যাবতীয় নে'মাত থেকে বঞ্চিত হবে, লোকজন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদেরকে ব্যর্থ বলে উপহাস করবে–করুক না, কোনো পরোয়া করো না। যাবতীয় পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করো এবং বিশ্বাস করো তোমরা ব্যর্থ নও। হাশরের ময়দানে তোমাদের যাবতীয় অভাব শুধু পূরণ করাই হবে না, বরং তোমাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।

আপন রব-এর গোলামী করার কারণে যদি তোমাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হয়, নিজ জাতিকে ত্যাগ করতে হয়, ত্যাগ করো। এর উত্তম প্রতিদান আমি তোমাদেরকে দেবো। তোমাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম যদি এমন হয় যে, সেখানে আমার গোলামী করতে পারছো না। তাহলে সে মাধ্যম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও। জীবিকার চিন্তায় আমার গোলামী থেকে বিরত থেকো না। পৃথিবীতে তোমাদের দৃষ্টির সামনে অসংখ্য-অগণিত পশু-প্রাণী রয়েছে, তারা জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি তাদেরকে প্রতিপালন করছে বা তাদের খাদ্য যোগাচ্ছে। আমি আল্লাহ তাদের খাদ্য যুগিয়ে থাকি। পানির অতল তলদেশে বা পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় ছোট্ট একটি পোকাও না খেয়ে থাকে না। যখনই তার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আমি আল্লাহ তার রিযিক সরবরাহ করে থাকি।

www.pathagar.com

সুতরাং স্বাধীনভাবে আমার গোলামী করার জন্য যদি তোমাদেরকে চাকরী হারাতে হয়, দেশ ত্যাগ করতে হয়, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তাহলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করো। ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করো। অসহায় প্রাণীকূলকে আমি রিযিক দিচ্ছি, তোমাদেরকেও আমিই রিযিক দেবো। রিযিক্-এর ব্যাপারে পেরেশান হয়ো না, ধৈর্য ধারণ করো–আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবো।

'হক'-এর দাওয়াতের ময়দানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন একটি সময় সামনে এসে উপস্থিত হয়, যখন একজন ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সহায়-সম্পদ ও নির্ভরতা থেকে একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ উন্মুক্ত থাকে না। এই অবস্থায় যারা আগামী দিনে কিভাবে জীবন বাঁচাবে, রিযিক কোথা থেকে আসবে, মাথা গোঁজার ঠাঁই কোত্থেকে জুটবে, পরিবার, পরিজনের মুখে কি তুলে দেবে এসব চিন্তায় অস্থির হয়ে যায়, তাদের পক্ষে সফলতা অর্জন কখনো সম্ভব নয়।

এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে যারা একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে অসীম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে এবং প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দৃঢ়পদে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, যে কোনো বিপদ-মুসিবতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকে, সফলতা তাদেরই পদচুম্বন করে। এই শ্রেণীর লোকদের অসীম ত্যাগ, কোরবানী আর অপরিসীম ধৈর্যের বিনিময়ে পৃথিবীর বাতিল শক্তি মাথানত করে এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।

অভিযোগহীন 'সবর'

বিপদ-মুসিবত, রোগ-শোক, ত্যাগ-তিতীক্ষা ইত্যাদির কঠিন ও বিভিষীকাময় স্তর অতিক্রম করলেই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করা যাবে। আর এসব পর্যায় অতিক্রম করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অভিযোগ না করে, চোখের পানি না ফেলে, কাকুতি-মিনতি না জানিয়ে, অস্থিরতা প্রকাশ না করে এবং চিত্ত চাঞ্চল্য না ঘটিয়ে অটল ও অবিচল থেকে যে ধৈর্যের প্রকাশ ঘটানো হয়, তাকেই সর্বোত্তম ধৈর্য বলা হয় এবং পবিত্র কোরআনে এই ধরনের ধৈর্যকে 'সাবরুন জামিল' বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই ধরনের ধৈর্যই সবথেকে অধিক পসন্দনীয়। নবী রাসূলদের জীবনে এই ধরনের 'সবর' ছিল তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে আগুনের কুন্ডে ফেলে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তাঁর চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটেনি।

www.pathagar.com

হযরত ইয়াকুব (আঃ) সন্তান হারিয়ে এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লেন, তিনি কোনো অভিযোগ করলেন না। হযরত আইয়ুব (আঃ) এর গোটা দেহে পচন ধরলো, তাঁর আপনজন তাঁকে ত্যাগ করলো, তিনি কোনো অভিযোগ করলেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হলো, তায়েফে হতাশাব্যঞ্জক কথা দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হলো, তায়েফের ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ উচ্ছৃঙ্খল যুবকদেরকে আল্লাহর রাসূলের পেছনে লেলিয়ে দিলো। তারা একটির পর একটি পাথর ছুড়ে আল্লাহর নবীর পবিত্র দেহ মোবারক ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। আঘাতের যন্ত্রণায় রাসূলের পবিত্র পা দুটো আর উঠতে চায় না। তিনি হাঁটতে পারছেন না, বেঈমান-কাফিররা তাঁকে হাঁটতে বাধ্য করছে, তিনি যখনই হাঁটা শুরু করছেন অমনি তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকের ওপর পুনরায় পাথরের বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন তায়েফে আল্লাহর রাসূল তিনবার জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন।

জ্ঞান ফিরে আসা মাত্র তিনি রক্তাক্ত দুটো হাত আল্লাহর দরবারে উঠালেন, কিন্তু আঘাতকারীদের প্রতি কোনো অভিশাপ দিলেন না। বরং তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এই লোকগুলো আমাকে চিনতে পারেনি। ওরা জানে না যে আমি তোমার নবী। ওরা না জেনে আমাকে আঘাত করেছে। আমাকে আঘাত করা হয়েছে, এ কারণে তুমি ক্রোধান্বিত হয়ে ওদের ওপরে গযব নাযিল করো না। তুমি যদি ওদেরকে গযব দিয়ে ধ্বংস করে দাও, তাহলে আমি দ্বীনের দাওয়াত দেবো কার কাছে?'

আল্লাহর ফেরেশ্তা দল মারাত্মকভাবে আহত নবীর কাছে এসে বলেছেন, 'আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন। আমরা এই পাহাড়গুলো উঠিয়ে তায়েফের কাফিরদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেই।' আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'ওদেরকে যদি তোমরা শেষ করে দাও, তাহলে আমি 'হক'-এর দাওয়াত কার কানে পৌঁছাবো?' এভাবে করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের চূড়ান্ত নমুনা দেখিয়েছেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া। ওহুদের ময়দানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ সাহাবা নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর নবীকে ঘিরে রেখেছেন। শত্রুদের অস্ত্রের সমস্ত আঘাত রাসূলের পবিত্র শরীরে যেন না লাগে, এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে ঘিরে মানববন্ধন তৈরী করে নিজেদের শরীরকে

www.pathagar.com

ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছেন। তাঁকে হেফাজত করতে যেয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলেন। কাফির বাহিনী নানা ধরনের অস্ত্র দিয়ে আল্লাহর নবীর ওপর আক্রমন করছিল।

এ সময় কাফেরদের তীরের আঘাতে হযরত কাতাদা ইবনে নুমান (রাঃ) এর চোখ কোটর ছেড়ে বের হয়ে এলো। মুখের কাছে এসে চোখ ঝুলতে থাকলো। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) আল্লাহর নবীর পাশে থেকে কাফিরদের দিকে তীর ছুড়তে থাকলেন। আল্লাহর রাসূল তুনীর থেকে তীর বের করে হযরত সা'দের হাতে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'হে সা'দ! তোমার ওপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক, তুমি তীর চালাও।'

হযরত আবু দুজানা (রাঃ) নবীকে এমনভাবে বেষ্টন করেছিলেন যে, কাফিরদের সকল আঘাতগুলো যেন তাঁর দেহেই লাগে, আল্লাহর রাসূল যেন অক্ষত থাকেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) এক হাতে তরবারী ও অন্য হাতে বর্শা নিয়ে আল্লাহর নবীর ওপর আক্রমনকারী কাফিরদেরকে প্রতিহত করছিলেন। এক সময় শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র হলো যে, মাত্র ১২ জন আনসার আর মক্কার মোহাজির হযরত তালহা (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ নবীর পাশে স্থির থাকতে পারলেন না।

এ অবস্থায় কাফিরদের প্রচন্ড আক্রমনের মুখে আল্লাহর রাসূল ঘোষনা করলেন, 'আক্রমনের মুখে শত্রুদেরকে যে ব্যক্তি পিছু হটতে বাধ্য করবে সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।' হযরত তালহা (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি শত্রুদেরকে আক্রমন করবো।' আল্লাহর রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন না। আনসারদের মধ্যে একজন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আক্রমন করতে যাবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সে শাহাদাতবরণ করলো। আল্লাহর রাসূল পুনরায় পূর্বের অনুরূপ ঘোষনা দিলেন। হযরত তালহা পুনরায় এগিয়ে এলেন। এবারও আল্লাহর রাসূল তাঁকে নিষেধ করলেন। এভাবে পরপর ১২ জন আনসারই শাহাদাতবরণ করলেন। এবার আল্লাহর রাসূল হযরত তালহাকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। তিনি সিংহ বিক্রমে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মক্কার জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ সাহাবায়ে কেরামের বেষ্টনীর ওপর দিয়ে রাসূলকে আঘাত করার জন্য বারবার তরবারীর আঘাত হানছে। হযরত তালহা (রাঃ) শূন্য হাতে সে তীক্ষ্নধার তরবারীর আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তরবারীর আঘাতে তাঁর একটা হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বেঁচে থাকার আর কোনো আশা নেই, ঘাতকরা আল্লাহর রাসূলকে আঘাত করছে। আর

করুণার সিন্ধু সেই চরম মুহূর্তেও মহান আল্লাহর কাছে ঘাতকদের জন্য দোয়া করছেন, 'রাবিগ্‌ফিরলি ক্বাওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা যে কিছুই বুঝে না।'

সাহাবাগণ রাসূলকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁরা আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তীর বিদ্ধ হতে পারে, আমরা আমাদের বুক দিয়েই তীর প্রতিরোধ করবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করছেন, সেই জালিমের দলই রাসূলকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এসে আঘাতের পরে আঘাত করছে। জালিম ইবনে কামিয়া তরবারী দিয়ে বিশ্বনবীর পবিত্র চেহারায় আঘাত করলো। তার তরবারীর আঘাতে আল্লাহর নবীর মাথার লোহার শিরস্ত্রাণের দুটো কড়া ভেঙ্গে চেহারা মোবারকে প্রবেশ করলো। তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে বললেন, 'ঐ জাতি কি করে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়! অথচ সে নবী তাদেরকে আল্লাহর দিকেই আহ্বান করছে।'

কোনো কোনে বর্ণনায় এসেছে, হযরত তালহা স্বয়ং মারাত্মকভাবে আহত, একটি হাত দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং গোটা দেহে তীর ও তরবারীর আঘাত। তবুও তিনি আল্লাহর রাসূলকে নিজের কাঁধের ওপরে নিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন। হযরত তালহা (রাঃ) এর নিজের দেহের প্রতি সামান্য খেয়াল ছিল না। তাঁর দেহ থেকে ঝর্ণাধারার মতই রক্ত ঝরছিল।

সেদিকে তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি তখন অনুভব করছিলেন, আল্লাহর নবীকে হেফাজত করতে হবে। আল্লাহর নবীকে নিয়ে পাহাড়ের এক গুহায় পৌঁছে নবীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েই তিনি জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, 'আমি আর হযরত উবাইদাসহ অনেকেই অন্য দিকে যুদ্ধ করছিলাম। নবীর সন্ধানে এসে দেখলাম তিনি আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমরা তাঁর সেবা-যত্ন করতে অগ্রসর হতেই তিনি বললেন, 'আমাকে নয়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো।'

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমরা দেখলাম তাঁর জ্ঞান নেই এবং শরীর থেকে একটা হাত বিচ্ছিন্ন প্রায়। গোটা শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। ৮০ টিরও বেশী

www.pathagar.com

আঘাত ছিল তাঁর শরীরে। আল্লাহর রাসূল পরবর্তী কালে হযরত তালহা সম্পর্কে বলতেন, 'কেউ যদি কোন মৃত মানুষকে পৃথিবীতে বিচরণশীল দেখতে চায়, তাহলে সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।'

হযরত তালহাকে 'জীবন্ত শহীদ' বলা হত। ওহুদের প্রসঙ্গ উঠলেই হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন, 'সেদিনের যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন হযরত তালহা।' আল্লাহর নবী হযরত তালহাকে পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, কাফিরদের আঘাতে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র দান্দান মোবারক শাহাদাতবরণ করেছিল। তাঁর চেহারা মোবারকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর ঢাল ভর্তি করে পানি আনছিলেন আর হযরত ফাতিমা (রাঃ) নবীর ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। রক্ত যখন বন্ধ হলো না, তখন বিছানার একটা অংশ পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে দেয়ার পরে রক্ত বন্ধ হয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে যারা তৎপর রয়েছেন, 'সবর' তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। আল্লাহর জান্নাত এমনিতেই লাভ করা যাবে না। বাতিলের মোকাবেলায় ও বিপদ-মুসিবতে 'সবর' তথা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ–

তোমরা কি মনে করেছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি, তোমাদের মধ্যে কারা তাঁর পথে জিহাদ করতে এবং 'সবর' অবলম্বন করতে প্রস্তুত? (সূরা ইমরাণ-১৪২)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতই মুজাহিদ এবং কোন্ ব্যক্তি যাবতীয় বিপদ-মুসিবত ও শত্রুর মোকাবেলায় হিমাচলের মতোই অটল অবিচল থেকেছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ–

অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো, যাতে করে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুজাহিদ এবং দৃঢ়তা ও সবর অবলম্বনকারী কে তা আমি দেখে নিতে পারি এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি। (সূরা মুহাম্মাদ-৩১)

'সবর'-এর উত্তম প্রতিদান

'সবর' পবিত্র কোরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি শব্দ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থানে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। সাধারণত 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে, অবিচলতা, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, মন-মেজাজের সমতা, ধীরতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও বরদাস্ত করা। এ ছাড়াও 'সবর' শব্দটি বহুবিদ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, 'সবর' শব্দের অর্থ হলো ধৈর্য। 'সবর'-এর একটি অর্থ ধৈর্য এ কথা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু ধৈর্যের অর্থ এটা নয় যে, কেউ একজন অন্যায়ভাবে আঘাত করলো আর আঘাতকারীর প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে বলা হলো, আপনি স্বয়ং আঘাত পাননি তো!

এর নাম 'সবর' নয়, বরং 'সবর' হলো বিপদে হতাশ না হয়ে, ভেঙ্গে না পড়ে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে অটল অবিচল থাকা। ঠান্ডা মাথায়, ধীর স্থির মস্তিষ্কে বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলা করে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার কৌশল অবলম্বন করার নামই হলো 'সবর'। অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে অবিচলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে। বিষয়টি স্পষ্ট অনুধবান করার জন্য সেই গল্পটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়, যে গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি বিষধর সাপ একজন পীর সাহেবের কাছে গিয়ে বলেছিলো, 'হুজুর, আমি আপনার মুরীদ হতে এসেছি।' পীর সাহেব সেই সাপকে বললেন, 'আমি তো কোনো সাপকে মুরীদ করিনা।'

সাপ অনুনয় করে বললো, 'হুজুর আমি বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি মুরীদ হবার জন্য। আপনি দয়া করে আমাকে মুরীদ করে নিন।' সাপের পীড়াপিড়ীতে অবশেষে পীর সাহেব বললেন, 'আমি তোমাকে আমার মুরীদ করতে পারি এক শর্তে। সে শর্তটি হলো, তুমি কাউকে দংশন করতে পারবে না।' সাপ বিনয়ের সাথে জানালো, 'আপনার শর্ত আমি মেনে নিলাম। আর কখনো কাউকে আমি দংশন করবো না।'

পীর সাহেব সাপকে মুরীদ বানিয়ে তাকে কিছু যিকর শিখিয়ে দিলেন। সাপ বিদায় নিয়ে চলে গেলো এবং একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পীর সাহেবের শিখানো যিকর করতে থাকলো। সেই ক্ষেতের মালিক ক্ষেতে এসে ধান কাটতে লাগলো। সন্ধ্যার পরে লোকটি কাটা ধানের গোছাগুলো বোঝা বেঁধে

www.pathagar.com

বাড়িতে নিয়ে যাবে, কিন্তু বোঝা বাঁধার রশি সে সাথে আনেনি। এদিক ওদিক সে রশির আশায় তাকালো। সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে ছেয়ে গিয়েছে। সাপকে লোকটি রশি মনে করে উঠিয়ে নিয়ে ধানের গোছাগুলো একত্রিত করে শক্ত করে বাঁধলো। লোকটি রশি মনে করে সাপকে দিয়ে যখন ধানের গোছা বাঁধছিলো, সাপ তখন রাগে ফুঁসছিলো আর মনে মনে বলছিলো, 'ব্যাটা আহাম্মক, আমাকে তুমি রশির মতো ব্যবহার করছো। আমি যদি পীর সাহেবের মুরীদ না হতাম, তাহলে এতক্ষণে তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দিতাম।'

রশি হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে সাপকে দুমড়ানো মোচ্ড়ানো হয়েছে। ফলে সাপের ঘাড় মচ্কে গেলো। লোকটি ধানের বোঝা বাড়িতে নিয়ে সেই সর্প রূপী রশি ফেলে দিলো। সাপ অনেক কষ্টে পীর সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে করুণ স্বরে জানালো, 'আপনি এমন এক যিকর আমাকে শিখিয়েছেন, যে যিকর করতে গিয়ে আমার ঘাড় মচকে গিয়েছে।' পীর সাহেব অবাক কণ্ঠে বললেন, 'আশ্চর্য কথা! যিকর করলে মন-মানসিকতা পবিত্র হয়, কারো ঘাড় তো মচ্কে যায় না। তোমার ঘাড় কেমন করে মচ্কালো?'

সাপ তখন সম্পূর্ণ ঘটনা পীর সাহেবকে শুনালো। ঘটনা শুনে পীর সাহেব সাপকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ব্যাটা আহাম্মক! আমি তোমাকে দংশন করতে নিষেধ করেছি কিন্তু ফোঁস করতে তো নিষেধ করিনি। যখন তোমাকে রশি ভেবে তোমার শরীরে হাত দিয়েছিলো, তখন যদি তুমি ফোঁস করে উঠতে, তাহলে তিন লাফ দিয়ে লোকটি ছুটে পালাতো, তোমার ঘাড় মচ্কাতো না।'

সুতরাং ধৈর্যের অর্থ এটা নয় যে, অকারণে একজনের ওপরে নির্যাতন করা হবে আর নির্যাতিত ব্যক্তি নীরবে তা সহ্য করে বলবে, 'আমি ধৈর্য ধারণ করছি, কারণ আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে বলেছেন, তিনি ধৈর্যশীল লোকদের সাথে থাকেন।' এর নাম ধৈর্য নয়। যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি, বিপদ-মুসিবত মোকাবেলা করতে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, অবিচলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে, আর এটার নামই হলো 'সবর'। এই 'সবর' যারা অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ–

তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো তাহলে অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (সূরা নাহ্ল-১২৬)

www.pathagar.com

ধৈর্য ধারণকারীদের বা 'সবর' অবলম্বনকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, এর অর্থ হলো–যারা লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার মোকাবেলায় সত্য ও সততা এবং ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়-নীতির পথ অবলম্বন করলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এসব ক্ষতি যারা কোনো ধরনের অভিযোগ ব্যতীতই বরদাশ্ত করে। পৃথিবীতে অবৈধ পথ অবলম্বন করলে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যেতো, তা সবই যারা ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করেছে। যারা ভালো কাজের শুভ প্রতিদান লাভ করার জন্য পরম ধৈর্যের সাথে মৃত্যুর পরের জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। ধৈর্য ধারণকারী এসব লোকদের জন্য মহান আল্লাহ্ বিরাট নে'মাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ-وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র কাছে যা কিছু রয়েছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা 'সবর'-এর পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। (সূরা নাহ্ল-৯৬)

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যারা 'সবর' অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে হিসাব করে কোনো প্রতিদান দেবেন না। সীমা সংখ্যাহীন বেশুমার প্রতিদান 'সবর' অবলম্বনকারীদেরকে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

ধৈর্যশীলদেরকে তো অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে। (সূরা যুমার-১০)

ঈমান এনে, আমলে সালেহ্ করে এবং 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যারা ইসলাম বিরোধিদের জুলুম-নির্যাতন ও অপবাদ-মিথ্যাচারের মোকাবেলা সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সাথে করবে, আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত ও তার সম্মান মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে যে কোনো ধরনের বিপদ-মুসিবত এবং কষ্ট বরদাশ্ত করবে, যাবতীয় ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সততা অবলম্বন করে দৃঢ়পদ থাকবে, শয়তানের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা-বাসনাকে অবদমিত করে দ্বীনি আন্দোলনে অটল থাকবে, অবৈধ পথ থেকে দূরে থেকে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করবে, পাপের যাবতীয় স্বাদ ও লাভ প্রত্যাখ্যান করবে এবং সৎকাজ ও সঠিক পথে অবস্থানের প্রত্যেকটি ক্ষতি ও তার

www.pathagar.com

পরিবর্তে অর্জিত অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করবে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে সম্বর্ধনা দেবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا-

এরা হলো সেসব লোক, যাদের প্রদান করা হবে উন্নত মন্‌জিল। এটা তাদের সবরের প্রতিফল। অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস! (সূরা ফুরকান-৭৫-৭৬)

'সবর' অবলম্বনকারীদেরকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা জান্নাত দান করবেন। জান্নাতে ফেরেশ্‌তারা চারদিক থেকে এসে তাদেরকে সালাম জানাবেন এবং এই সুসংবাদ দেবেন যে, তোমরা এখন এমন স্থানে এসে পৌঁছেছো যেখানে শান্তি আর নিরাপত্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই। এখানে তোমরা যাবতীয় বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। কোনো শঙ্কা বা ভয়-ভীতির আশঙ্কা এখানে নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ-سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

ফেরেশ্‌তাগণ চারদিক থেকে তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে। এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষনের ধারা অব্যাহত থাক। তোমরা পৃথিবীতে যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, তার বিনিময়ে তোমরা এর অধিকারী হয়েছো। সুতরাং কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর! (সূরা রা'দ-২৩-২৪)

প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারদের সারা বৈষয়িক জীবনই হলো 'সবর'-এর জীবন, ধৈর্য সহিষ্ণুতার কঠিন জীবন। জ্ঞানের উন্মেষ হওয়া অথবা ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের নফস-এর অবৈধ কামনা-বাসনা দমন করা, মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে চলা, যে কাজগুলো আল্লাহ্ তা'য়ালা ফরজ করে দিয়েছেন তা তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পালন করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের সময়, মেধা, শ্রম, ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা-প্রতিভা, প্রয়োজনে নিজের প্রাণ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য কোরবান করা, যে কোনো বিপদ-মুসিবতে অটল-অবিচল থাকা। অর্থাৎ

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি কাজই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যারা করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ، وَجَزٰهُمْ بِمَا
صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ، مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الاَرَائِكِ، لاَيَرَوْنَ فِيْهَا
شَمْسًا وَّلاَ زَمْهَرِيْرًا ، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً،
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَاْ، قَوَارِيْرَاْ
مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَاتَقْدِيْرًا ، وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ
مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً، عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً، وَيَطُوْفُ
عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ، اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ، وَاِذَا
رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ، عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
وَّاِسْتَبْرَقٌ، وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا
طَهُوْرًا ، اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا–

অতএব আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে সেদিনের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ-স্ফূতি দান করবেন। আর তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। সেখানে তারা উচ্চ আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তাদেরকে সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে না, শীতের প্রকোপও নয়। জান্নাতের বৃক্ষ রাজির ছায়া তাদের ওপর অবনত হয়ে থাকবে এবং তার ফলমূল সবসময় তাদের আয়ত্তাধীনে থাকবে (তারা ইচ্ছানুসারে তা ভোগ করতে পারবে)। তাদের সম্মুখে রৌপ্য-নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা পরিবেশন করানো হবে। সেই কাঁচ পাত্রও রৌপ্য জাতীয় হবে। এবং সেগুলো (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মত পূর্ণ করে রাখবে! তাদেরকে সেখানে এমন সূরাপাত্র পরিবেশন করানো হবে যাতে শুকনা আদার সংমিশ্রণ থাকবে।

www.pathagar.com

এটা হবে জান্নাতের একটি নির্ঝর, যাকে সালসাবীলও বলা হয়। তাদের সেবাকার্যে এমন বালক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা। তোমরা সেখানে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, শুধু নে'মাত আর নে'মাতই তোমাদের চোখে পড়বে এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমারা দেখতে পাবে। তাদের ওপর সুক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক অথবা মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন পরানো হবে এবং তাদের রব তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন। এটাই হলো তোমাদের শুভ প্রতিফল। কারণ তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবান রূপে গৃহীত হয়েছে। (সূরা দাহার)

মানুষ মাত্রেই ভুল-ত্রুটি রয়েছে, তার আমলনামায় কম-বেশী গোনাহ্ রয়েছে। তবে যারা ঈমান এনেছে, আমলে সালেহ্ করেছে, 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছে এবং এই কাজ করতে গিয়ে যেসব বিপদ-মুসিবত এসেছে, তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوْا الصّلِحتِ-اُوْلَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ-

যারা ধৈর্য অবলম্বন করেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান। (সূরা হূদ-১১)

ধৈর্যশীলদের প্রধান দুটো গুণ

কোরআনুল কারীমে ঈমানদারদের দল তথা দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের দুটো গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, এরা একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উৎসাহ উদ্দিপনা দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, এরা একজন আরেকজনের প্রতি দয়া-মায়া, সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রেরণা দিয়ে থাকে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একজন মুমিন তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামীর গোটা জীবনই ধৈর্য অবলম্বনের জীবন। ঈমান আনার সাথে সাথেই তাকে ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হয়। হযরত মূসা (আঃ) এর যুগে ফেরাউনের যাদুকররা যখন ঈমান আনলো এবং

সেই সাথে সাথে তাদের ওপরে যে কঠিন পরীক্ষা নেমে এলো, অসীম ধৈর্যের সাথে তারা সেই ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পৃথিবী থেকে ঈমান নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছিল।

সুতরাং ঈমান আনার সাথে সাথেই ঈমানদারকে সমস্ত কিছুতেই অসীম ধৈর্য ধারণ করতে হয়। মহান রব আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ পালন করার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, নিজের প্রবৃত্তিকে অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, চরম দরিদ্রতার মোকাবেলা করে অবৈধ অর্থ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন। দ্বীনি আন্দোলন থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তি লোভ-লালসা দেখিয়ে থাকে, তাদের পাতা ফাঁদে পা দিলে পৃথিবীর জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ হাতের মুঠোয় ধরা দেয়। এই ঘৃণ্য পথ থেকে বিরত থাকতে গেলে ধৈর্যের প্রয়োজন। একমাত্র আল্লাহর গোলামী করার কারণে বাতিল শক্তি জুলুম নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে দেয়, এই কঠিন অবস্থাতেও ধৈর্যের প্রয়োজন। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, ঘৃণা, অর্থ-সম্পদ, দৈহিক শক্তি, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি বার বার অন্যায় পথে ধাবিত হতে থাকে, এসব কিছুকে অন্যায় পথ থেকে বিরত রেখে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করারও অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন।

ধৈর্যের এই প্রশিক্ষণ একাকী নির্জনে গ্রহণ করাও যায় না এবং একাকী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য নামক দুর্লভ গুণ সৃষ্টিও হয় না। ঈমানদার ব্যক্তি যখন দলবদ্ধভাবে, একটি আন্দোলনে- সংগঠনে অবস্থান করে, সেখান থেকেই সে প্রশিক্ষণ লাভ করে। এই ব্যক্তি যখন দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর ভেতরে প্রতিটি ব্যাপারে অসীম ধৈর্যের নিদর্শন দেখতে পায়, স্বাভাবিকভাবেই তার ভেতরে ঐ গুণ সংক্রামিত হয়। এই ব্যক্তি যখন একাকী কোন বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন তার ভেতরে সংক্রামিত সেই গুণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইসলাম বিরোধী শক্তি ঐ ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন নির্জন ফাঁসি কক্ষে ফাঁসির রশি কণ্ঠে পরিয়ে দেয়, তখন অসীম ধৈর্যের সাথে বলতে থাকে, 'আমি কোথায় কি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলাম, এটা আমার দেখার বিষয় নয়, আমি আল্লাহর গোলাম হিসাবে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছি, এটাই আমার জীবনের সবথেকে বড় সফলতা।'

দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, মায়া-মমতা, বদান্যতা ও সহানুভূতি। প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারদের সমন্বয়ে যে দল, সমাজ ও জাতি গড়ে ওঠে, এরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়। একে অপরের প্রতি মমতা ও করুণা প্রবণ হয়।

www.pathagar.com

আর্তমানবতার সেবায় এরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। এই দুর্লভ গুণও সৃষ্টি হয় ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমে। ব্যক্তি যখন নিজেকে এই দলে শামিল করে তখন সে দেখতে পায়, সংগঠনের প্রতি নেতা-কর্মী একে অপরের সাথে অত্যন্ত মমতা প্রবণ। একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে মমতা সিক্ত ভাষায়। এদের আচরণে ও কথায় কঠোরতার কোন স্থান নেই। মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসি জড়িয়ে রয়েছে পরস্পরের ঠোঁটে। মমতার আদ্রতাপূর্ণ এই আচরণ ঐ ব্যক্তির চরিত্রেও সংক্রামিত হয়। সে একাকী যখন অন্যের সাথে আচরণ করে, তখন তার আচরণে মমতার প্রকাশ ঘটে।

বস্তুত ইসলামী দল ও এই দলের সংগ্রামের ফলে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরেই মমতার ফল্গুধারা বইতে থাকে। গোটা জাতি রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে শাসক হিসাবে না পেয়ে কর্তব্য পরায়ণ- সেবাপরায়ণ সেবক পেয়ে থাকে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামলে রাষ্ট্রের একজন খৃষ্টান কর্মচারী তাঁর কাছে একদিন নিজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদন পত্র দিয়েছিল। প্রায় একমাস পরে ইসলামী সাম্রাজ্যের কর্ণধার গেলেন খৃষ্টানদের গির্জা পরিদর্শনে। সেখানে ঐ খৃষ্টান কর্মচারী খলীফার সাথে দেখা করে বললেন, 'আমি সেই খৃষ্টান যুবক- এই রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী। আমি আমার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় একমাস পূর্বে আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম।'

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতাপশালী শাসক হযরত ওমর (রাঃ) খৃষ্টান যুবকের দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'আমিও ওমর–সেই মুসলমান। তোমার আবেদন পত্র সেই মুহূর্তেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে যথাস্থানে প্রেরণ করেছি। আগামী মাসের প্রথম তারিখ থেকেই তুমি তোমার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।' এই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারের মমতাসিক্ত আচরণ।

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।'

বোখারী শরীফে এসেছে, 'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে অন্যায় অবিচার করে না, তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত থাকবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণের কাজে নিযুক্ত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে

www.pathagar.com

কিয়ামতের বিপদসমূহের মধ্যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'

একজন আরেকজনের দোষ-ক্রুটি গোপন তখনই রাখে, যখন সে তার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হয়, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। আবু দাউদ ও তিরমিজী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দয়া-মায়া প্রবণ লোকদের ওপরে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করুণা করে থাকেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর ওপরে দয়া করো, তাহলে আকাশ ওয়ালা (আল্লাহ্ তা'য়ালা) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।'

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজে দয়া করে না তার প্রতি অন্য কেউ দয়া করে না।' পরস্পরের প্রতি সালামের রীতি, ছোটদেরকে স্নেহ করার নীতি ও বড়দেরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করার রীতি ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এবং ইসলামী সংগঠন এসবের প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজে এই ভাবধারা প্রবর্তন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া ও স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।' তিনি আরো বলেছেন, 'তিন ধরনের লোক জান্নাতে গমন করবে। তার মধ্যে এক ধরনের লোক হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজের আত্মীয় ও মুসলমানদের জন্যে দয়াশীল ও নমনীয় হয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'একজন মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিন ব্যক্তির জন্যে এক প্রাচীরের মতো। এই প্রাচীরে প্রতিটি অংশ অপর অংশকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে রাখে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি অখন্ড শরীরের মতোই দেখতে পাবে। যেমন শরীরের একটি অঙ্গে কোন ব্যথা দেখা দিলে সেই ব্যথা সমস্ত শরীরে সংক্রামিত হয়, মুমিনদের অবস্থাও অনুরূপ হয়। কেউ একজন বিপদগ্রস্ত হলে, সবাই সেই বিপদে এগিয়ে আসে।'

এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে মুসলিম সমাজ। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই ব্যক্তিকে ঈমান আনার পরেই ইসলামী সমাজ গড়ার কাজে শামিল হতে হয়। আর

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার কাজে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। ঈমানের দাবি অনুসারে জীবনের প্রত্যেক বিভাগে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণের লক্ষ্যে ঈমানদারকে ইসলামী সংগঠনে শামিল হতে হবে। এ জন্যে ইসলামী সংগঠন থেকে দূরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়না, পরিশেষে আদালতে আখিরাতে তার পক্ষে কল্যাণ লাভ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنِ الْحَارِثِ الاَشْعَرِىْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ الْجَمَاعَةَ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَّىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّه مُسْلِمٌ–

হযরত হারেসুল আশ'আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে আদেশ করেছেন– সে কাজগুলো হলো, জামায়াতবদ্ধ (সাংগঠনিক) জীবন, (নেতার) আদেশ শ্রবণে (অনুসরণে) প্রস্তুত থাকা ও (সংগঠনের নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো– যতক্ষণ না সে পুনরায় জামায়াতের (সংগঠনের) মধ্যে শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত যুগের কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামাজ আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে।' (তিরমিযী-মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে ইসলামী সংগঠনভুক্ত হয়ে ঈমানের দাবী অনুসারে এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করার তাওফীক এনায়েত করুন- আমীন।

www.pathagar.com

মৃতদেহ নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা কি করবেন?

(একটি তাত্ত্বিক আলোচনা)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মৃত্যু এক মহাসত্য- এ থেকে কেউ পালাতে পারবে না

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ–

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তারপর তোমরা সকলে আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আনকাবুত-৫৭)

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّه مُلَقِيْكُمْ–

(হে নবী!) এদেরকে বলুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো, (একদিন) সে মৃত্যুর সামনা-সামনি তোমাদের হতেই হবে। (সূরা জুমুয়া-৮)

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ–

তুমি যেখানেই থাকো– তা যদি দূর্ভেদ্য দুর্গও হয় তবুও মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করবেই। (সূরা নিসা-৭৮)

মৃত্যুর সময় এলে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না

فَلَوْلاَ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ، وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ، فَلَوْلاَ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ، تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صدِقِيْنَ–

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, 'এখন তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো এবং এই ধারণায় যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রাণ যখন তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়– আর তোমরা নিজেদের চোখে তা দেখতে থাকো যে সে মৃত্যুবরণ করছে, তখন তার নির্গমনকারী প্রাণকে ফেরৎ নিয়ে আসোনা কোনো? বরং তখন তোমাদের তুলনায় আমিই তার নিকটবর্তী হয়ে থাকি, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাওনা'। (সূরা ওয়াকিয়া-৮৩-৮৭)

www.pathagar.com

দুনিয়া পূজারী লোকেরা মৃত্যুর সময় আফসোস করবে

পৃথিবীতে শুধুমাত্র ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগাড়ের জন্য যারা বৈধ-অবৈধ পথে অর্থ সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত থেকেছে, মৃত্যুর সময় তারা আক্ষেপ করে বলবে–

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ، لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ–

তাদের যখন মৃত্যু আসে তখন তারা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু সময় দাও, যাতে আমি কিছু সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। (সূরা মু'মিনুন-৯৯-১০০)

দুনিয়া পূজারী লোকদের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ، فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ–

যে রিয্ক আমি তোমাদের দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করো এর পূর্বে যে তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে যাবে আর বলবে, হে আমার রব! তুমি আমাকে আরো কিছুটা সময় দিলেনা কেনো? তাহলে আমি দান-সাদাকাহ্ করতাম এবং নেক্কার চরিত্রবান লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। (সূরা মুনাফিকুন-১০)

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا، وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ م بِمَا تَعْمَلُوْنَ–

অথচ যখন কারো কর্ম সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত এসে যায় তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আর মোটেই অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা'য়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। (সূরা মুনাফিকুন-১১)

www.pathagar.com

মৃত্যুযন্ত্রণা অসহনীয় অবর্ণনীয়

মৃত্যুযন্ত্রণা অকল্পনীয়- অবর্ণনীয় কঠিন যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। কম হোক বেশী হোক-এ যন্ত্রণা সবাইকে সহ্য করতেই হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন-

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ-

অতঃপর লক্ষ্য করো, এই মৃত্যুযন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে উপস্থিত। এ হচ্ছে সেই মহাসত্য যে মৃত্যু থেকে পালাচ্ছিলে। (সূরা ক্বাফ-১৯)

'পরম সত্য উপস্থিত' অর্থাৎ এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তোমার পরকালীন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হবে, যাকে তোমরা অনেকেই অস্বীকার বা মিথ্যা বলে মনে করতে।

মৃত্যু কোনো সহজ বিষয় নয়, তবে মুমিনের মৃত্যু কম কষ্টকর হবে এবং এতে থাকবে মুমিনের জন্য শান্ত্বনা ও অভয়বাণী। পবিত্র কোরআন মজীদে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُعَدُوْنَ-

নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব অতঃপর এ কথার ওপর অবিচল থাকে; মৃত্যুর সময় তাদের কাছে ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়ে বলে, ভয় করো না, চিন্তা করো না বরং তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। (সূরা হা- মীম আস্ সিজ্দা-৩০)

মৃত্যুর সময় নবী করীম (সাঃ) পানিতে বার বার হাত ভিজিয়ে নিজের পবিত্র মুখমন্ডলে লাগাচ্ছিলেন আর বলছিলেন-

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتْ-

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যুতে রয়েছে বড়ই কষ্ট। (বোখারী)

মৃত্যুকালে মুমিনগণ ফিরিশ্তার কাছ থেকে সালাম পায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ

ادْ خُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

সেই মুত্তাকীদের যাদের রুহ্ পবিত্র অবস্থায় থাকে ফিরিশ্‌তারা তাদের জান্ কবজ করার সময় বলে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো তোমাদের আমলের বিনিময়ে। (সূরা আন্ নাহ্‌ল-৩২-৩৩)

নাস্তিক, মুরতাদ, মুনাফিক, কাফির এবং মহান আল্লাহর বিধান লংঘনকারীদের মৃত্যুকালীন অবস্থা হবে উল্লেখিত বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মৃত্যুর সময় থেকেই তাদের শাস্তি শুরু হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন-

وَ لَوْ تَرى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ، ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ-

তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে যখন ফিরিশ্‌তারা কাফিরদের রুহ্ কবজ করছিলো; তারা ওদের মুখমন্ডলে ও পশ্চাতে আঘাত করছিলো আর বলছিলো, এখন আগুনে জ্বলার শাস্তি ভোগ করো। এটা সেই শাস্তি যা তোমাদের কৃতকর্মের পাওনা। নতুবা আল্লাহ্ তা'য়ালা তো বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন। (সূরা আন্‌ফাল- ৩২-৩৩)

মৃত ব্যক্তির পরকাল যাত্রা

মৃত্যুর পর মরদেহকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, কাউকে অনাড়ম্বর ভাবে আবার কাউকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার দিয়ে। কিভাবে দাফন করা হলো, জানাযায় কত সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করলো, কতবার জানাযা হলো, কত বার তোপধ্বনি হলো বা কত ফুলের তোড়া দেয়া হলো, এগুলোর কোনোই গুরুত্ব নেই। কারণ এসব কর্মকান্ডের সাথে মৃত ব্যক্তির শান্তি বা অশান্তির কোনোই যোগসুত্র নেই।

মৃত ব্যক্তি নেক্‌কার হলে সে পছন্দ করে তাকে তাড়াতাড়ি দাফন করা হোক, আর বদকার হলে সে অস্থিরতা বোধ করে, কারণ উভয়েই তাদের পরিণতি সম্পর্কে অনুভব করতে পারে। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ

www.pathagar.com

وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِى وَاِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْئٍ اِلاَّ الاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ-

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জানাযার লাশ যখন খাটিয়ার ওপর উঠিয়ে লোকেরা বহন করে কবরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে সে বলতে থাকে, আমাকে নিয়ে দ্রুত চলতে থাকো (অর্থাৎ আমার দাফন ক্রীয়া দ্রুত সম্পন্ন করো) আর বদকার হলে সে চিৎকার করে বলতে থাকে আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? মানুষ ব্যতীত সবাই এ চিৎকার শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতে পেতো তাহলে জ্ঞানহারা হয়ে যেতো।' (বোখারী)

মৃত্যুর পর আখিরাতের জগতে প্রবেশের প্রথম মঞ্জিল কবরের ভয়াবহতা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقَبْرُ اَوَّلُ مَنَازِلِ الاخِرَةِ فَاِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرَ قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ-

আখিরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর হলো প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ কবর নামক মঞ্জিল সহজে অতিক্রম করতে পারে তার জন্য অবশিষ্ট মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করা সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি কবরেই গ্রেফতার হয়ে যায় তাহলে এরপরের মন্জিলসমূহ তার জন্য আরো কঠিন হবে। আল্লাহর কসম! আমি যতটা লোমহর্ষক, বিভিষীকাময় ভীতিকর দৃশ্য দেখেছি এর মধ্যে কবর হচ্ছে সব থেকে বেশী ভয়ঙ্কর। (আহ্মাদ)

কবর সম্পর্কে আরেকটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ-

www.pathagar.com

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কবর হলো জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত। (তিরমিযী)

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَتُ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقِى مَعَهُ وَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقِى عَمَلُهُ–

মৃতের সাথে তিনটি জিনিস তার কবর পর্যন্ত যায়। এক. মৃতের পরিবার পরিজন। দুই. ধন-সম্পদ। তিন. আমল। কিন্তু তাকে দাফনের পর তার পরিবার- পরিজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে। সাথে থাকে শুধু আমল। (বোখারী)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা কিভাবে আনন্দ-ফূর্তি করবো!

اَلْمَوْتُ مِنْ وَّرَاءِ نَا وَالْقَبْرُ اَمَامَنَا وَالْقِيَامَةُ مَوْعِدُنَا وَعَلى جَهَنَّمَ طَرِيْقُنَا وَبَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ مَوْقِفُنَا–

মৃত্যু আমাদের পেছনে ধাবমান, কবর আমার সামনে মুখ হা করে আছে, কিয়ামত আমাদের প্রতিশ্রুত সময়সীমা, জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পারের কঠিন পরীক্ষা এবং আল্লাহ তা'য়ালার সামনে দাঁড়িয়ে করতে হবে জবাবদীহীতা।

সুতরাং পৃথিবী খেল-তামাশার জায়গা নয়, এ কথা সকলকে প্রত্যেক মুহূর্তে মনে রেখেই ক্ষণস্থায়ী এ জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ–

প্রকৃতপক্ষে সেই বুদ্ধিমান যে নিজের নাফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নিজের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে সুন্দর করার জন্য নেক কাজ করেছে, পক্ষান্তরে নির্বোধ ও অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নফ্সের অধীনে ছেড়ে দিয়ে অযথা আল্লাহর রহমতের আশা করেছে। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

কবর বলতে কি বুঝায়?

কবর সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে, মৃত্যুর পর মানুষের রুহ্ বা আত্মা কোথায় যায় এবং কোথায় অবস্থান করে। কিয়ামত সংঘটিত হবার পরে বিচার শেষে মানুষ জান্নাত বা জাহান্নামে অবস্থান করবে। কিন্তু এর পূর্বে সুদীর্ঘকাল মানুষের আত্মা কোথায় অবস্থান করবে? কোরআন-হাদীসে এর স্পষ্ট জবাব রয়েছে। মৃত্যুর পরের সময়টিকে যদিও পরকালের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, তবুও কোরআন-হাদীস মৃত্যু ও বিচার দিনের মধ্যবর্তী সময়কে 'আলমে বরযখ' নামে অভিহিত করেছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ–

এবং তাদের পেছনে রয়েছে বরযখ- যার সময়কাল হচ্ছে সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদেরকে পুনর্জীবিত ও পুনরুত্থিত করা হবে। (সূরা মুমিনুন-১০০)

এই আয়াতে যে 'বরযখ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ হলো যবনিকা পর্দা। অর্থাৎ পর্দায় আবৃত একটি জগৎ– যেখানে মৃত্যুর পর থেকে আখিরাতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের রুহ্ অবস্থান করবে। ইসলাম পাঁচটি জগতের ধারণা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে। প্রথম জগৎ হলো 'রুহ্' বা আত্মার জগৎ– যাকে 'আলমে আরওয়াহ্' বলা হয়েছে। দ্বিতীয় জগৎ হলো মাতৃগর্ভ বা 'আলমে রেহেম'। তৃতীয় জগৎ হলো 'আলমে আজসাম' বা বস্তুজগৎ– অর্থাৎ এই পৃথিবী। চতুর্থ জগৎ হলো 'আলমে বরযাখ' বা মৃত্যুর পর থেকে আখিরাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সুক্ষ্ম জগৎ রয়েছে, যেখানে মানুষের আত্মা অবস্থান করছে। পঞ্চম জগৎ হলো 'আলমে আখিরাত' বা পুনরুত্থানের পরে অনন্তকালের জগৎ।

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, রুহ্ বা আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর পর এই পৃথিবী থেকে আত্মা 'আলমে বরযখে' স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ আত্মা দেহ ত্যাগ করে মাত্র, তার মৃত্যু হয় না।' আলমে বরযখের' বিশেষভাবে নির্দিষ্ট যে অংশে আত্মা অবস্থান করে সে বিশেষ অংশের নামই হলো কবর।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে কবর একটি মাটির গর্ত মাত্র যার মধ্যে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই দেহ পচে গলে যায়। মাটি এই দেহ খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত কবর এক অদৃশ্য সুক্ষ্ম জগৎ। যা মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কল্পনারও অতীত। প্রকৃত ব্যাপার হলো, মৃত্যুর পর মানুষ কবরস্থ হোক, চিতায় জ্বালিয়ে দেয়া হোক, বন্য জন্তুর পেটে যাক অথবা পানিতে ডুবে মাছ বা পানির অন্য কোনো প্রাণীর

পেটে যাক, সেটা ধর্তব্য বিষয় নয়। মানুষের দেহচ্যুত আত্মাকে যে স্থানে রাখা হবে সেটাই তার কবর। অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে আখিরাতের পূর্ব পর্যন্ত যে অদৃশ্য জগৎ রয়েছে, সেই জগতকেই 'আলমে বরযখ' বলা হয় এবং 'আলমে বরযখের' নির্দিষ্ট অংশ, যেখানে মানুষের আত্মাকে রাখা হয়- সেটাকেই কবর বলা হয়। শুধু মাটির গর্তই কবর নয়– 'আলমে বরযখে' দুটো স্থানে মানুষের আত্মাকে রাখা হবে। একটি স্থানের নাম হলো ইল্লীন আর আরেকটি স্থানের নাম হলো সিজ্জীন। ইল্লীন হলো মেহমানখানা, অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করেছে, তারাই কেবল ঐ মেহমানখানাই স্থান পাবে। আর যারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে, নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে চলেছে, মানুষের বানানো আইন-কানুন অনুসারে জীবন চালিয়েছে, তারা স্থান পাবে সিজ্জীনে। সিজ্জীন হলো কারাগার। আল্লাহর কাছে যারা আসামী হিসেবে পরিগণিত হবে, তারা বিচার না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে অবস্থান করবে।

কোরআন-হাদীস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কবরে ভোগ-বিলাস অথবা ভয়ঙ্কর আযাবের ব্যবস্থা থাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাকে তার অন্তিম বাসস্থান সকাল-সন্ধ্যায় দেখানো হয়। সে জান্নাতী হোক বা জাহান্নামী হোক। তাকে বলা হয়, এটাই সেই বাসস্থান যেখানে তুমি তখন প্রবেশ করবে যখন আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিনে দ্বিতীয়বার জীবনদান করে তাঁর কাছে তোমাকে উপস্থিত করবেন। (বোখারী, মুসলিম)

ইন্তেকালের পরপরই কবরে বা 'আলমে বরযখে' গোনাহ্গারদের শাস্তি ও আল্লাহর বিধান অনুসরণকারী বান্দাদের সুখ-শান্তির বিষয়টি মহাগ্রন্থ আল কোরআন এভাবে ঘোষণা করেছে–

وَلَوْتَرٰى اِذْيَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا–الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ–وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ–

যদি তোমরা সে অবস্থা দেখতে যখন ফেরেশ্তাগণ কাফিরদের আত্মা হরণ করছিলো এবং তাদের মুখমন্ডলে ও পার্শ্বদেশে আঘাত করছিলো এবং বলছিলো, নাও, এখন আগুনে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা আনফাল-৫০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের আরেক আয়াতে বলেন–

www.pathagar.com

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّبِيْنَ-يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

ঐসব আল্লাহ্ভীরু লোকদের রুহ্ পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশ্তাগণ বের করেন তখন তাদেরকে বলেন, আস্সালামু আলাইকুম। আপনারা যে সৎ কাজ করেছেন এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করুন। (সূরা নহল-৩২)

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আলমে বরযখে বা কবরে মানুষকে শ্রেণী অনুসারে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশের কথা শুনানো হয়। আখিরাতে বিচার শেষে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে আলমে বরযখে বা কবরে আযাবের মধ্যে সময় অতিবাহিত করবে আল্লাহ্র বিধান অমান্যকারী লোকজন এবং যারা কোরআনের বিধান অনুসারে চলেছে তারা পরম শান্তির পরিবেশে সময় অতিবাহিত করবে। সুতরাং মৃত্যুর পরে মানুষের দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এটা কোনো বিষয় নয়, যা কিছু ঘটবে তা আত্মার ওপর ঘটবে অথবা আল্লাহ্ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে ঐ দেহ তৎক্ষণাত প্রস্তুত করতেও সক্ষম। কবর ভেঙ্গে যাক বা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাক এটা ধর্তব্য বিষয় নয়। কবরে শান্তি বা আযাবের বিষয়টি অবধারিত সত্য, কোরআন হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে।

পরকালীন জগৎ কাল্পনিক কোনো জগৎ নয়

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবীর জীবন হলো একজন মুসাফীরের অনুরূপ। এই জীবন মাকড়সার জালের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে কোনো মুহূর্তে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর এই জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই দৃশ্য আমরা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে অবলোকন করছি। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা কারো নেই। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি পর্যন্ত কেউ-ই মৃত্যুর অমোঘ ছোবল থেকে সুরক্ষিত কোনোকালে থাকেনি। মহান আল্লাহর চিরন্তন বিধানে প্রাণীজগতের সকল প্রাণীকেই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, হতে হচ্ছে এবং আগামীতেও হতে হবে। গতকাল সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় সমাসীন ব্যক্তি আজ কফিনে আবৃত হয়ে নিরব-নিস্তব্ধ অবস্থায় পরকালের অনন্ত জগতে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে অবোধ শিশুটি এই পৃথিবীর বিশালত্ব সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা লাভ করেনি, তাই বলে এই চলমান পৃথিবীর

www.pathagar.com

ক্রিয়াকলাপ অস্তিত্বহীন ছিলো না। অনুরূপভাবে বুঝতে হবে, মানুষ এই পৃথিবীতে অবস্থানকালে পরকালীন জগৎ সম্পর্কে কোনো কিছু অনুভব করতে সক্ষম না হলেও পরকালীন জগৎ কাল্পনিক কোনো জগৎ নয়। মৃত্যুর পরের জগৎ একটি অটল বাস্তবতা, একটি কঠিন সত্য এবং অনঢ় অবিচল বাস্তব সত্য। পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকান্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে এবং হিসাবের পরে কেউ সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে জান্নাত লাভ করবে আবার কেউ অসৎ কর্মের শাস্তি হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এসব বিষয় কোনো উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, অবশ্যই পরকাল ঘটবে এবং মহান আল্লাহর সামনে সমস্ত মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ওপর পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিতে হবে। দুনিয়ার জীবনে পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম না হলে কোরআন সুন্নাহর বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আর পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিতে না পারলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে এই পৃথিবী থেকেই মুক্তির যাবতীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। এ জন্য দুনিয়ার এই স্বল্পকালীন জীবনকে মুক্তির সম্বল হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ–

হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেক ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হলো, সে যেনো পরকালের জন্য পূর্বেই কি সম্বল সংগ্রহ করেছে তা ভেবে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া। (আবার শোন) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই তোমরা যা করছো আল্লাহ তা'য়ালা তার সবটাই জানেন। (সূরা হাশর- ১৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসন্তুষ্ট হতে পারেন, এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ড তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হলে সেটাও তিনি পরিপূর্ণরূপে দেখেন ও জানেন। পৃথিবীর জীবনে অন্যায় ও অপরাধমূলক কর্মের সমুদ্রেও যদি তোমরা নিমজ্জিত হও, তাহলে পরকালের জীবনে আল্লাহ তা'য়ালাকে বিচার এড়িয়ে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে না। কারণ তিনি তোমাদের আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-গোপন, ন্যায়-অন্যায় ও ইনসাফ-জুলুম সমস্ত কিছুই জানেন ও দেখেন। সুতরাং সাবধান! আল্লাহর সাথে হঠকারিতা করো না। অনন্ত অসীম পরকালের জীবনে চিরস্থায়ী শান্তির স্থান জান্নাত লাভ ও মহান আল্লাহ তা'য়ালার দর্শন লাভের সম্বল সংগ্রহের স্থান এই পৃথিবীর

www.pathagar.com

জীবনকে অবহেলায় কাটিয়ে দিও না। পৃথিবীর জীবনের সদ্ব্যবহার করো তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে পারবে। পৃথিবীর জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত পরকালের জীবনে মুক্তির পথে ব্যয় করবে।

পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে গনীমত বলে গণ্য করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে। (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে। (৩) অভাবের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে। (৪) অধিক ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে। (৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে। (তিরমিযী)

অর্থাৎ সৎকাজে অলসতা করো না, গোনাহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমার জীবন আর কতক্ষণ অবশিষ্ট রয়েছে, তুমি কতক্ষণ সুস্থ্ থাকবে আর অবসর পাবে কিনা তুমি জানো না। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করো। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দুই পা কোনো দিকে নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (১) পৃথিবীতে তাকে যে হায়াত দেয়া হয়েছিলো, সে হায়াত কোন্ পথে ব্যয় করা হয়েছে। (২) সে তার যৌবনকে কোন্ পথে ব্যয় করেছে। (৩) সম্পদ কোন্ পথে উপার্জন করেছে। (৪) সম্পদ কোন্ পথে ব্যয় করেছে। (৫) যে জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছিলো, তা কোন্ কাজে লাগিয়েছে।' (তিরমিযী)

এই পাঁচটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব না দেয়া পর্যন্ত আখিরাতের ময়দানে কোনো মানুষের পক্ষে এক কদমও এদিক-ওদিক যাওয়া সম্ভব হবে না। আর যে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যে একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনকালের পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্ট দেখা যাবে। প্রথম প্রশ্ন করা হবে, পৃথিবীতে তাকে যে হায়াত বা জীবনকাল দেয়া হয়েছিলো, এই জীবনকাল সে কিভাবে কোন্ পদ্ধতি অনুযায়ী বা কোন্ বিধান অনুসারে পরিচালিত করেছে? পৃথিবীতে একজন মানুষও কোনো ধরনের আইন-কানুন ও বিধান ব্যতীত নিজের জীবন পরিচালনা করতে পারে না। সন্তান যখন মাতৃগর্ভে আগমন করে, তখন সেই মা'কে পারিবারিক বা সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত কারণে কিছু না কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। সন্তান যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখনও কোনো না কোনো নিয়ম-কানুন মা'কে

www.pathagar.com

পালন করতে হয়। এরপর সেই সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এসব নিয়ম অনুসরণ করা ব্যতীত মানুষ চলতে পারে না।

এরপর সেই মানুষকে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতে হয়। এখানেও তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। সেই মানুষ যদি রাজনীতি করে, তাহলে তাকে একটি রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণ করতে হয়। সে যদি কোনো দল করে, তাহলে সেই দলের আদর্শ তাকে মেনে চলতে হবে অথবা সমর্থন দিতে হবে। সে যদি সক্রিয়ভাবে কোনো দল না-ও করে, তাহলে দেশের নাগরিক হিসেবে তাকে অন্তত ভোট দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হয়। ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাকে একটি নিয়ম অনুসরণ করতে হয় এবং বিশেষ কোনো প্রার্থীকে ভোট দিতে হয়। পৃথিবীতে জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে মানুষকে কোনো কোনো পেশা অবশ্যই গ্রহণ করতে হয় এবং সেই পেশাও কোনো না কোনো নিয়মের অধীন। সেই নিয়ম অনুসরণ করেই তাকে জীবিকা অর্জন করতে হয়। কোনো কারণবশতঃ কোনো মানুষকে যদি আইন-আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে সেখানে তাকে আইনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে। এভাবে করে প্রত্যেকটি মানুষকে পৃথিবীতে বিশেষ আইন-কানুন, বিধান, নিয়ম-পদ্ধতি মেনে নিয়েই জীবন পরিচালনা করতে হয়। আখিরাতের ময়দানে প্রথম প্রশ্ন এটাই হবে যে, সে যেসব নিয়ম-পদ্ধতি বা বিধানের অধীনে পৃথিবীতে জীবনকাল অতিবাহিত করেছে, সেই জীবনকাল কি সে মহান আল্লাহর বিধানের অধীনে অতিবাহিত করেছে না মানুষের বানানো বিধানের অধীনে অতিবাহিত করেছে?

প্রশ্নের জবাব যদি এটা হয় যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে যে জীবনকাল দিয়েছিলেন, সে জীবনকাল আল্লাহর বিধানের অধীনে অতিবাহিত করেছে অথবা এমন দেশে সে বাস করতে বাধ্য হতো, যেখানে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত ছিল না, কিন্তু সে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য আমরণ আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। তাহলে আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির আমলনামা অনুসারে মুক্তির ফয়সালা গ্রহণ করবেন। আর যদি দেখা যায় যে, পৃথিবীর জীবনকাল সে অন্য মানুষের বানানো বিধান অনুসারে অতিবাহিত করেছে, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানার চেষ্টাও করেনি, এই বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রামও করেনি এবং যারা করেছে, তাদের প্রতি সমর্থনও দেয়নি। বরং অন্য মানুষের বানানো মতবাদ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার জীবনকাল অতিবাহিত করেছে। তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির আমলনামা অনুসারে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

প্রথম প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাওয়া গেলে পরবর্তী চারটি প্রশ্নের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কিন্তু অন্য চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের দুর্বল দিক তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন থাকবে যৌবন কাল সম্পর্কে। জানতে চাওয়া হবে, সে তার যৌবনকাল কোন্ পথে ব্যয় করেছে। কারণ যৌবনকাল মানব জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাল তথা স্বর্ণালী সময়। এ সময়ই মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হয়, দৈহিক যাবতীয় বৃত্তিনিচয় বিকশিত হয়, স্বভাবগত কামনা-বাসনা অদম্য হয়ে ওঠে, উৎসাহ, উদ্দীপনা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়, ক্লান্তিহীন কর্ম ক্ষমতা দেহ যন্ত্রকে সচল রাখে এবং যাবতীয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার দুর্বার সাহস পূর্ণ অবয়বে বিকশিত হয়। এই যৌবনকালকে মানুষ আল্লাহর বিধানের অধীনে ব্যবহার করেছে না মনের অদম্য কামনা-বাসনা অনুসারে অথবা আল্লাহদ্রোহী নেতা নেত্রীদের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত করেছে, এর জবাব জানতে চাওয়া হবে।

এরপর প্রশ্ন করা হবে, পৃথিবীতে সম্পদ সে কোন্ পথে উপার্জন করেছে? পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্য অর্থ সম্পদ একান্ত প্রয়োজন এবং এসব উপার্জন করাও মানুষের স্বভাবগত চাহিদা। জানতে চাওয়া হবে, এই অর্থ-সম্পদ সে কিভাবে, কোন্ পথে উপার্জন করেছে। অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি তার মধ্যে ছিলো কিনা। কাউকে ঠকিয়ে, সমাজ ও দেশের ক্ষতি করে সে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করেছে কিনা। সুদ-ঘুষ বা অবৈধ কোনো ব্যবসার মাধ্যমে অথবা অন্যকে শোষণ করে উপার্জন করেছে কিনা। এসব বিষয়ে মানুষকে চুলচেরা হিসাব দিতে হবে।

এরপরে আসবে ব্যয়ের প্রশ্ন। যে অর্থ সম্পদ সে উপার্জন করেছিলো, তা সে কোন্ পথে ব্যয় করেছে? তার অর্জিত ধন-সম্পদে নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী ও অভাবীদের যে অধিকার ছিলো, তা সে আদায় করেছে কিনা। আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন, তা প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সম্পদের কতটুকু অংশ সে ব্যয় করেছে? অথবা আল্লাহর দেয়া এই অর্থ-সম্পদ সে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করেছে কিনা। এই সম্পদ সে নিছক ভোগ-বিলাস বা পাপাচারের পথে ব্যয় করেছে কিনা। এই সম্পদ সে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্জনের কাজে বা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করেছে কিনা। এসব অর্থ-সম্পদ মানুষের চরিত্র বিনষ্ট করার কাজে সে ব্যবহার করেছে কিনা, এসব প্রশ্নের জবাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে হবে।

সর্বশেষ প্রশ্ন থাকবে, যে জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছিলো, তা কোন্ কাজে লাগিয়েছে। মানুষের পৃথিবীর জীবনকালে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে যে

জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তাকে দিয়েছিলেন, যতটুকু জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি তাকে দিয়েছিলেন, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের যে সুযোগ তাকে দিয়েছিলেন, সেই জ্ঞান, শিক্ষা, বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সে কোন্ কাজে ব্যবহার করেছে? এসব কিছু সে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে ব্যবহার করেছে– না আল্লাহ তা'য়ালার সন্তোষ অর্জনের পথে ব্যবহার করেছে?

এই পাঁচটি প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে হবে এবং সন্তোষজনক জবাবের ওপর নির্ভর করবে মানুষের মুক্তি ও পুরস্কার। আর যথাযথ জবাব দিতে ব্যর্থ হলে, তাকে ভোগ করতে হবে অবর্ণনীয় শাস্তি এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষকেই উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে, কারণ প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে যাকিছু পৃথিবীতে করছে, এর দায়-দায়িত্ব একান্তভাবেই তার নিজের ওপর বর্তাবে এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ–

'ভালো করে জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন–

فَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى
فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى–

যে ব্যক্তি তার রব-এর মহাবিচারের সম্মুখে উপস্থিতিকে ভয় করলো এবং নিজের সত্তাকে কু-প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখলো তার ঠিকানা হলো জান্নাত। (সূরা নাযিয়াত- ৪০-৪১)

পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুর পরের জীবনকে অবিশ্বাস, অবহেলা ও অবজ্ঞা করে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে একমাত্র জীবন বলে ভোগ-বিলাসে মেতে থাকবে, ন্যায় অন্যায়বোধ বিসর্জন দেবে, ইনসাফকে উপেক্ষা করে চলবে, আল্লাহর দাসত্ব ত্যাগ করে শিরক্-এ লিপ্ত হবে, হারাম-হালালবোধ বিস্মৃত হয়ে অন্যের অধিকার হরণ করে সম্পদের স্তুপ গড়বে, মানুষের সম্মান-মর্যাদাবোধের প্রতি আঘাত হানবে, জুলুম-অত্যাচার করবে তথা পরকালীন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য

www.pathagar.com

দিবে, তারা অবশ্যই মৃত্যুর পরের জীবনে এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখিন হবে। এসব লোকদেরকে আখিরাতের ময়দানে মহান আল্লাহ্ শুনিয়ে দেবেন–

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ–

তোমাদের (জন্য বরাদ্দকৃত) নে'মাতসমূহ তোমরা দুনিয়ার জীবনে শেষ করে এসেছো, আর সবকিছু তোমাদের ইচ্ছা মতোই ভোগ করেছো। আজ তোমরা অপমানকর শাস্তি পাচ্ছো এ জন্য যে, তোমরা দুনিয়ার যমীনে অহঙ্কার করতে আর এ জন্য যে, তোমরা অপরাধ করছিলে। (সূরা আহ্কাফ- ২০)

প্রথমে মুসলমান হতে হবে

আখিরাতের ময়দানে মানুষকে যে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে এবং এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাবের ওপর নির্ভর করবে মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ– এ সম্পর্কে আমি কোরআন-হাদীস থেকে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আখিরাতের ময়দানে উল্লেখিত পাঁচটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব কেবলমাত্র তারাই দিতে সক্ষম হবে, যারা কোরআন-হাদীসের মানদন্ডে মুসলমান হিসেবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে। বর্তমানে মুসলিম হিসেবে পরিচিত পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে আগমন করলেই মুসলিম পরিচিতি লাভ করা যায়। কোরআন-হাদীস অনুযায়ী মুসলিম দাবীদার ব্যক্তি আদৌ মুসলিম কিনা– তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় না। বর্তমানে মুসলিম নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ এই ধারণার জন্ম দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম নামে পরিচিত পিতামাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায়। মুসলমান হওয়ার জন্য কোরআন-হাদীস তথা ইসলামী নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজন নেই এবং খান, সর্দার, চৌধুরী, ভূঁইয়া, শেখ, কাজী, দেওয়ান, শিকদার, সরকার ইত্যাদি পদবিধারী ব্যক্তির সন্তান যেমন স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখিত পদবি ব্যবহার করতে পারে, তেমনি মুসলিম হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির সন্তানও নিজেকে মুসলিম হিসেবেই দাবী করতে পারে।

এ কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, চিকিৎসকের সন্তান যেমন চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন না করে চিকিৎসক হতে পারে না, প্রকৌশলীর সন্তান যেমন প্রকৌশল

বিদ্যা অর্জন না করে প্রকৌশলী হতে পারে না, আইনজ্ঞের সন্তান যেমন আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী অর্জন না করে আইনজ্ঞ হতে পারে না অনুরূপভাবে মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবী করতে হলে প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেটুকু জ্ঞান অর্জন করলে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য বুঝা যায়। মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি– তা বুঝার মতো জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মুসলিম হতে হলে তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি এবং কি কি কাজ করলে মুসলমান থাকা যাবে এবং কোন্ কাজ করলে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করা যাবে না, সেটুকু জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলে বা কালেমা পাঠ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। যে কালেমা পাঠ করা হলো, সেই কালেমার অর্থ, গুরুত্ব, তাৎপর্য, এই কালেমার দাবী কি– তা জানতে হবে এবং কালেমার দাবী অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে হবে, তাহলেই নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া যাবে। আর এই মুসলমানরাই আখিরাতের ময়দানে উল্লেখিত পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

ইসলাম ও মুসলিম শব্দের অর্থও যে বুঝে না, মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কোন্ কারণে পার্থক্য রেখা টানা হয়েছে, এ সম্পর্কে যার নূন্যতম ধারণাও নেই, কোরআন-হাদীস কি– এ সম্পর্কে যার ভাসাভাসা জ্ঞানও নেই, আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশ্তা, আখিরাত এসব বিষয় সম্পর্কে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অন্ধকারে, সে ব্যক্তিও মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করার কারণে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করছে এবং মৃত্যুর পর তাকে কবরস্থ করা হচ্ছে ইসলাম প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে। তার মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় বলা হচ্ছে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ–

আল্লাহ্র নামের ওপরে এবং রাসূলের দলের ওপরে।

অথবা –بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ্র নামের ওপরে এবং রাসূলের সুন্নাতের ওপরে।

জীবিতকালে যে ব্যক্তির সাথে কোরআনের পরিচয় ঘটেনি, সেই ব্যক্তির কবরে যখন মাটি দেয়া হচ্ছে তখন কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হচ্ছে–

www.pathagar.com

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى–

এই মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং এই মাটি থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো। (সূরা ত্বা-হা-৫৫)

কবরে নামানোর সময় কি বলা হচ্ছে?

কবর বলতে কি বুঝায়– এ ব্যাপারে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কবর হলো পৃথিবীর জীবনের শেষ মঞ্জিল আর আখিরাতের জীবনের প্রথম মঞ্জিল। এই কবরের জগতে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পাঠানো ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে, সেই ব্যক্তি আখিরাতের জীবনে মুক্তি লাভ করবে। আর কবরের জগতে যে ব্যক্তি ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে না, আখিরাতের জীবনে সে গ্রেফতার হয়ে জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। কবরের জগতে কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তিই ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হবে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জীবনকালে নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করেছে। এ বিষয়টি অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, ঐ ব্যক্তিকেই মুসলমান বলা হয়, যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করে। এ জন্যই মৃত্যুর পরে একজন মুসলমানের মৃতদেহকে কবরে নামানোর সময় বলা হয়– 'তোমাকে মহান আল্লাহর নামে এবং রাসূলের আদর্শের ওপরে এখানে রাখা হচ্ছে।'

একজন মুসলমানের মৃতদেহ কবরে নামানো হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, 'তোমাকে মহান আল্লাহর নামে এবং রাসূলের আদর্শের ওপরে এখানে রাখা হচ্ছে।' পৃথিবীতে জীবনকালে যে ব্যক্তি রাসূলের আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করেছে, মৃত্যুর পরও সেই রাসূলের আদর্শের ওপরেই তাকে দুনিয়ার শেষ মঞ্জিলে ও আখিরাতের প্রথম মঞ্জিলে প্রেরণ করা হলো। যে কথা বলে একজন মুসলমানের মৃতদেহ কবরে রাখা হলো, সেই কথাটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানের জন্যই প্রযোজ্য এবং একজন মুসলমানের জন্যই সামঞ্জস্যশীল। একজন মুসলমানের জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে কবরে নামানোর সময় বলা কথাটির কোনো ধরনের স্ববিরোধিতা নেই। বরং সত্য সঠিক কথা বলেই তাকে কবরে নামানো হলো।

এরপর কবরে যখন মাটি দেয়া হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে, 'এই মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো

www.pathagar.com

এবং এই মাটি থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো।' যে মুসলমানের কবরে মাটি দেয়ার সময় পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তাকে শোনানো হচ্ছে, সেই মুসলমানের কাছে এই কথাটি মোটেও নতুন নয়। কারণ সে তার জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআনে অনেকবার পড়েছে, তার আল্লাহ তাকে বলছেন- বান্দা! তোমাকে আমি এই মাটির সার-নির্যাস থেকেই সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাকে হায়াত দেয়া হয়েছে, এই হায়াত শেষ হলে পুনরায় তুমি এই মাটির মধ্যেই মিশে যাবে। এখানেই তুমি শেষ হয়ে যাবে না, পৃথিবীর জীবনকাল তুমি কিভাবে কোন বিধান অনুসারে পরিচালিত করেছো এবং তোমার জীবনের যাবতীয় কাজের চুলচেরা হিসাব আদালতে আখিরাতে দেয়ার জন্য তোমাকে এই মাটি থেকেই উঠানো হবে। অর্থাৎ তোমার পুনরুত্থান ঘটবে।

উল্লেখিত এই কথাগুলো একজন মুসলমান সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণে রাখতো বলেই সে পৃথিবীতে কখনো কোনো অন্যায় কাজে নিজেকে জড়িত করেনি। কোনো ব্যাপারে সামান্যতম মিথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেনি। অপরের স্বার্থে আঘাত করেনি, কারো সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করেনি। সত্য-সঠিক পথে জীবন-যাপন করেছে। কারণ তার মধ্যে এই অনুভূতি ক্রিয়াশীল ছিলো যে, তার জীবনের সকল কর্মের হিসাব আদালতে আখিরাতে তাকে দিতে হবে- যখন তাকে পুনরায় এই মাটি থেকেই উঠানো হবে। এই বিশ্বাসই তাকে পৃথিবীতে সৎ ও চরিত্রবান রেখেছে।

আর যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়েছে অথচ মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি জানতো না, কোরআন-হাদীসের সাথে জীবনে কখনো পরিচয় ঘটেনি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতো না, সেই ব্যক্তির কাছে উল্লেখিত কথাগুলো সম্পূর্ণ নতুন মনে হবে। পৃথিবীতে সে ব্যক্তি যেভাবে জীবন যাপন করেছে, আর মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় যে কথাগুলো বলা হলো, এই কথাগুলোর সাথে তার জীবন-যাপন পদ্ধতির কোনো সাদৃশ্য ছিলো না। পৃথিবীতে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করেনি এবং রাসূলের আদর্শের সাথে পরিচয়ই ছিলো না। অথচ তারই মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় বলা হচ্ছে 'তোমাকে আল্লাহর নামে এবং রাসূলের আদর্শের ওপরে রাখা হলো।' এর থেকে বড় অসত্য কথা আর কি হতে পারে?

যে ব্যক্তি জীবনের কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি যে, সে এই পৃথিবীতে যা কিছু করছে, এর প্রত্যেকটি কাজের হিসাব আখিরাতের

www.pathagar.com

ময়দানে দিতে হবে, তাকে এই মাটি থেকেই উঠানো হবে। আদালাতে আখিরাত সে অবিশ্বাস করেছে। আখিরাতের বিষয় নিয়ে সে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছে, পুনরুত্থান অসম্ভব বলেছে। আর সেই ব্যক্তির কবরে মাটি দেয়ার সময় বলা হচ্ছে, তোমার জীবনকালের যাবতীয় হিসাব দেয়ার জন্য তোমাকে এই মাটি থেকেই পুনরায় উঠানো হবে। এই কথাটি পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী এই ব্যক্তির জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণ স্ববিরোধী এবং অসামঞ্জস্যশীল।

আপনি একজন ছাত্র, আপনার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন

আপনি একজন ছাত্র হিসাবে লেখাপড়া করছেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আশায়। দেশে বা বিদেশে একটি সম্মানজনক চাকরী পাবেন, প্রভূত অর্থ উপার্জন করবেন, সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করবেন, বাড়ি-গাড়ির মালিক হবেন এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল জীবন-যাপন করবেন, এই আশায় আপনি আপনার শারীরিক ও মানসিক শক্তি, মেধা-মননশীলতা সবকিছু লেখাপড়ার পেছনে ব্যয় করছেন। আপনি যে সনদপত্র লাভ করবেন, সেখানে নিজের পরিচয় উল্লেখ করবেন একজন মুসলিম হিসেবে, সমাজে পরিচয়ও দিবেন মুসলিম হিসেবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রেও নিজেকে মুসলিম হিসেবেই উল্লেখ করবেন।

কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, মুসলিম বলতে কি বুঝায়, একজন মুসলমানের দায়িত্ব-কর্তব্য কি, কোন্ কোন্ কাজ করলে মুসলিম হওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ কাজ করলে মুসলিম হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয়া যায় না?

একজন মুসলিম আর অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি– এ কথা কি কখনো আপনি ভেবে দেখেছেন? আপনি কি কখনো আপনার নিজের স্রষ্টা এবং এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় জানার চেষ্টা করেছেন? যে রাসূলের মাধ্যমে আপনার-আমার সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা জীবন বিধান আল কোরআন প্রেরণ করেছেন, আপনি কি সেই রাসূলকে জানার চেষ্টা করেছেন?

আপনার মনে কি কখনো আপনার-আমার তথা মানব জাতির জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে বুঝার জন্য আগ্রহ জেগেছে?

আপনি একজন ছাত্র হিসেবে দেখছেন, পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক সভ্যতা-সংস্কৃতি রয়েছে এবং তারা তা অনুসরণ করছে। আপনি নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু আপনি কি কখনো মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন?

www.pathagar.com

আপনি ছাত্র হিসেবে কারো না কারো আবিষ্কৃত শিক্ষানীতি অবশ্যই অনুসরণ করছেন এবং বিভিন্ন জনের আবিষ্কৃত মতবাদ বা চিন্তাধারা পড়ছেন। আপনার মনে কি কখনো এই প্রশ্ন জেগেছে, যে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো শিক্ষানীতি দিয়েছেন কিনা? অথবা বিষয়ভিত্তিক যেসব মতবাদ বা চিন্তাধারা পড়ছেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল কি বলেছেন?

মনে করুন উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে আপনার মনে কখনো কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হলো না, যাদের মনে উল্লেখিত ব্যাপারে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো এবং তারা কোরআন-হাদীস পড়ে প্রকৃত সত্য জেনে তা অনুসরণ করার শপথ গ্রহণ করলো, আপনি তাদের বিরোধিতা করলেন। কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র হিসেবে আপনি আপনার যৌবনকালকে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যয় করছেন, নিজেকে কতক মরা ও জীবিত নেতার আদর্শের সৈনিক হিসেবে বক্তৃতায়, পোষ্টারে ও দেয়াল লিখনে প্রচার করছেন, অথচ মুসলমান কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সৈনিক ব্যতীত আর কারো সৈনিক হতে যাবে কোনো?

কেউ যদি অন্য কারো সৈনিক হিসেবে নিজেকে দাবী করে, তাহলে তার ঈমানের শপথ থাকে কোথায়? এ অবস্থায় আকস্মিকভাবে আপনি মৃত্যুবরণ করলেন। আপনার মরদেহ গোছল করিয়ে কাফন পরিয়ে কবরে নামানো হচ্ছে আর বলা হচ্ছে, 'তোমাকে আল্লাহর নামে রাসূলের আদর্শের ওপরে রাখা হচ্ছে।'

বলুন তো, কবরে নামানোর সময় বলা কথাটি কি আপনার জন্য প্রযোজ্য? ঐ সময় যদি আপনার বাকশক্তি থাকতো, তাহলে আপনি আপনার কবরের আশেপাশে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতেন– তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, আমি আমার জীবনকালে কখনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জানার চেষ্টা করিনি এবং রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করা দূরে থাক, যারা রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করেছে, আমি তাদের বিরোধিতা করেছি। আমি রাসূলকে অনুসরণ না করে নেতা-নেত্রীকে অনুসরণ করেছি এবং তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মিছিল-মিটিং করেছি, দেয়ালে দেয়ালে লিখেছি, পোষ্টার লাগিয়েছি। হরতাল-ধর্মঘট করেছি এবং প্রয়োজনে মারামারি করেছি।'

এরপর যখন আপনার কবরে মাটি দেয়ার সময় বলা হবে, তোমার জীবনের সকল কাজের হিসাব দেয়ার জন্য আদালতে আখিরাতে এই মাটি থেকেই তোমাকে উঠানো হবে। তখন যদি আপনার বাকশক্তি থাকতো, আপনি প্রতিবাদ করে বলতেন, আমি কখনো পরকালকে বিশ্বাসই করিনি। বরং এমন শিক্ষানীতিতে

www.pathagar.com

বিশ্বাসী ছিলাম, যে শিক্ষানীতি আমাকে শিখিয়েছে, পরকাল বলে কিছু নেই, এই পৃথিবীই সবকিছু এবং পৃথিবীর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তা যে কোন কিছুর বিনিময়ে হলেও অর্জন করতে হবে। যৌন অনাচারের মাধ্যমে যদি প্রভূত অর্থ আমদানী করা যায়, তাহলে তা করতে কোন দ্বিধা করা যাবে না। সুদের প্রচলন ঘটিয়ে, অশ্লীলতার প্রসার ঘটিয়ে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে, মিথ্যা-শঠতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে যদি নিজের স্বার্থ অর্জিত হয়, তাহলে অবশ্যই তা করতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটিই-জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করো। এই জীবন একবার হারালে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সুতরাং জীবিত থাকাবস্থায় ভোগের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হবে। খাও দাও আর ফূর্তি করো-(Eat, Drink and Be Maerry) এটার নামই হলো জীবন। কেননা আমাদের মহান কবি বলেছেন-

এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও কাল নিশিতের ভরসা কই
চাঁদনী জাগিবে যুগ যুগ ধরি আমরা তো রবনা সই।
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাঁকির খাতায় শূন্য থাক
কি লাভ শুনে দূরের বাদ্য মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

সকালের স্নিগ্ধ রোদ, এই মায়াবী চাঁদ, দক্ষিণা মলয় সমিরণ, সবুজের সমারোহ, পাখির কুহুতান, নদীর কুলকুল রব, তারাভরা আকাশ যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে, কিন্তু আমরা থাকবো না। সুতরাং জীবনকে ভোগ করে নাও। পরকালের বিষয়টি বাঁকী। হতেও পারে না-ও হতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তো নগদ, এসব যেভাবে পারো ভোগ করো। বহু দূরের বাজনা শোনায় তৃপ্তি নেই, কারণ ঐ বাজনা আর তোমার অবস্থান- এর মাঝে অনেক দূরত্ব। পরকাল আর তোমার জীবনের মধ্যে অনেক দূরত্ব। অতএব পরকালের আশায় দুনিয়ার জীবন বরবাদ করো না।

সুতরাং একজন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতায় নিজকে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে চেষ্টা-সাধনা থাকা উচিৎ ছিলো তা অনুশীলন না করার কারণে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা কতো ভয়াবহ হতে পারে তা ভেবে দেখার এখনই সময়।

আপনি একজন ব্যবসায়ী, আপনার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন

আপনি নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেন এবং পেশায় একজন ব্যবসায়ী। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল ব্যবসা সম্পর্কে কোন্ নীতিমালা আপনাকে অনুসরণ

www.pathagar.com

করার আদেশ দিয়েছেন, তা জানার চেষ্টা আপনি কখনো করেননি এবং জানা থাকলেও অনুসরণ করেননি। অধিক লাভের আশায় ব্যবসার পণ্যে ভেজাল দিয়েছেন, অবৈধভাবে নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী করেছেন, আমাদানীর ক্ষেত্রে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন। ব্যাংক ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেননি। সুদভিত্তিক ঋণ নিয়েছেন। মাদকদ্রব্য বা নেশা জাতিয় দ্রব্যের ব্যবসা করেছেন, অশ্লীল-নগ্ন ছায়া-ছবি নির্মাণ করছেন, সিনেমা হল বানিয়ে অশালীন ছবি প্রদর্শন করছেন, এভাবে করে জাতিয় চরিত্র ধ্বংস করছেন।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মওজুদ করে বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে অধিক মুনাফা লুটছেন, ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য সরবরাহ করছেন এবং সাধারণ মানুষ সে খাদ্য গ্রহণ করে নানা ধরনের শারীরিক জটিলতায় ভুগছে, নিম্ন মানের পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি ও অধিক বিক্রি করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এভাবে ব্যবসায়ী হিসেবে আপনি যাবতীয় নীতি-নৈতিকতাকে পদদলিত করে অর্থ উপার্জন করছেন। ব্যবসার কোনো একটি ক্ষেত্রেও আপনি আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের দেয়া নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

কিন্তু মৃত্যু যখন আপনার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলো, তখন আপনার মৃতদেহ কবরের নামানোর সময় বলা হলো, তোমাকে আল্লাহর নামে ও রাসূলের আদর্শের ওপরে রাখা হচ্ছে।

আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, কবরে নামানোর সময় আপনার মৃতদেহকে লক্ষ্য করে যে কথাগুলো বলা হবে, সেই কথাগুলোর ব্যাপারেই যদি ফেরেশ্তারা আপনাকে প্রশ্ন করে– আল্লাহর বান্দা! তোমার আত্মীয়-স্বজন ও সাথিরা যে কথা বলে কবরে তোমার লাশ দাফন করলো, তুমি কি জীবিতকালে সেই রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করেছো?

আপনি ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের কি জবাব দেবেন?

কবরের জগতে ফেরেশ্তারা যদি আপনাকে বলে– ওহে আল্লাহর বান্দা! তোমার মৃতদেহ ঢেকে দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমার সন্তান, নিকটাত্মীয় ও সাথিরা আল্লাহর কোরআন থেকে বলে গেলো– তুমি জীবনে যা কিছু করেছো, তার হিসাব দেয়ার জন্য তোমাকে এই মাটি থেকেই আদালতে আখিরাতে উঠানো হবে। তুমি আল্লাহর এই কথার প্রতি বিশ্বাসী ছিলে না। যদি আল্লাহর এই কথার ওপর তোমার বিশ্বাস থাকতো, তাহলে তো তুমি অসৎ পথে ব্যবসা করতে পারতে না।'

চিন্তা করে দেখুন তো, আপনি আল্লাহর ফেরেশ্তাদের কথার কি জবাব দেবেন?

www.pathagar.com

আপনি একজন নারী, আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে আপনাকে একজন নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার এটা সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে আপনাকে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু মুসলিম নারী হিসেবে আপনার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানার জন্য আপনি কি কোনো চেষ্টা করেছেন? আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার প্রতি পর্দা বাধ্যতামূলক করেছেন। কিন্তু আপনি পর্দা মেনে চলেছেন? বরং যেসব মুসলিম নারী পর্দা করেছে আপনি তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। পর্দার কথা যারা বলেছে, তাদেরকে আপনি প্রগতির শত্রু মনে করেছেন।

বিউটি পার্লার থেকে মেকআপ করে আপনি রাস্তায় আবেদনময়ী ভঙ্গিতে চলাফেরা করেছেন, এমন পোষাক আপনি পরিধান করছেন যে, আপনার দেহ সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। একশ্রেণীর কামার্ত পুরুষ আপনার প্রতি কামনা তাড়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। আপনার কারণে অসংখ্য পুরুষ চরিত্রহারা হয়েছে। লজ্জা হলো নারীর ভূষণ, আপনি সেই লজ্জার বাঁধন ছিন্ন করে নিজেকে আধুনিকা প্রমাণ করার জন্য অনাবৃতা হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা একমাত্র পুরুষের জন্য যেসব কাজ নির্বাচিত করেছেন, আপনি সমঅধিকারের নামে নিজেকে সেসব কাজে জড়িত করে নিজের মূল্যমান হ্রাস করেছেন।

মুহূর্ত কালের জন্য আপনি পরকালের কথা চিন্তা করেননি এবং মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে আপনার দিকে ছোবল দিতে পারে, এ চিন্তাও আপনি করেননি। এভাবে প্রগতির নামে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলছেন, হঠাৎ করে আপনি মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। এ অবস্থায় চিন্তা করে দেখুন তো, আপনার আত্মীয়-স্বজন আপনার লাশ নিয়ে কি করবেন?

আপনার নামের পূর্বে 'মুসলিম' শব্দটি থাকার কারণে আপনাকে শেষ গোছল দেয়ার জন্য যে স্থান নির্বাচন করা হবে, সে স্থানটি পর্দায় আবৃত করা হবে। কোনো পরপুরুষকে আপনার লাশ দেখতে দেয়া হবে না। এরপর আপনাকে কাফন পরানো থেকে কবরে নামানো পর্যন্ত পর্দার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ একজন মুসলিম নারীর জন্য জীবিতকালে যে পর্দার বিধান ছিলো, এখন আপনার মৃত্যুর পরে সেই বিধান অনুসরণ করা হবে।

www.pathagar.com

এবার আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, আপনি জীবিতকালে মুহূর্তের জন্য পর্দা করেননি, যারা পর্দা করতো তাদেরকে বিদ্রুপ করেছেন, প্রগতির শত্রু, সেকেলে, আনকার্লচার্ড ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এখন মৃত্যুর পরে আপনার মরা লাশের জন্য কি পর্দার প্রয়োজন আছে? যখন আপনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব হতো, তখন আপনি পর্দা করলেন না, এখন আপনার মৃতদেহের প্রতি কি কোনো পুরুষ আকর্ষণ অনুভব করবে?

এরপর আপনাকে যখন কবরে নামানো হবে তখন বলা হবে, তোমাকে আল্লাহর নামে এবং রাসূলের দলের ওপর রাখা হলো।

আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, আপনাকে যারা কবরে নামাবে এবং উক্ত কথাগুলো বলবে, তাদের বলা কথার সাথে আপনার জীবন-যাপন পদ্ধতির কি কোনো সাদৃশ্য ছিল?

কারণ আল্লাহর রাসূলের দলে তো ঐসব নারীরাই স্থান পাবে, যারা পৃথিবীতে কোরআন-হাদীসের বিধান অনুসরণ করেছে।

উল্লেখিত প্রশ্নগুলো আপনি জীবিতকালেই আপনার বিবেককে করুন। আপনার বিবেক যদি আপনাকে নেতিবাচক জবাব দেয়, তাহলে এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, আপনি এখন থেকে কোরআন-হাদীসের বিধান অনুসরণ করে জীবনকে বদলে দিবেন, রূপ-যৌবনের অহঙ্কার না করে এবং তা প্রদর্শনীর পণ্য না বানিয়ে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন গড়ুন।

মৃতদেহ নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা কি করবেন?

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি সহজবোধ্য করা যাক। মনে করুন, একজন ব্যক্তি তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটার পর থেকেই রাজনৈতিক দল হিসেবে X দলকে পছন্দ করে এবং X দলের পক্ষে কাজ করছে। তার তারুণ্য ও যৌবনকালকে X দলের একজন একনিষ্ঠ নেতা-কর্মী হিসেবে ব্যয় করেছে। এ অবস্থায় সেই ব্যক্তি চরম বার্ধক্যে উপনীত হলো। রোগ-জ্বরা, ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে সে অথর্ব হয়ে পড়লো। দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেললো, হাঁটার শক্তি নেই, হাত নাড়ানোর ক্ষমতা নেই, কথা বলতে গেলেও জড়িয়ে আসে। এমন একজন ব্যক্তি, তা তিনি জাতিয়ভাবে যতই পরিচিত ডাকসাইটে নেতাই হোন না কেনো, তিনি যদি জীবনের এই শেষ মুহূর্তে X দল ত্যাগ করে Y দলে যোগ দিতে চান, তখন Y দলের লোকজন কি তাকে গ্রহণ করবে?

সবাই তো তখন এই কথাই বলবে যে, যখন তোমার দেহে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ছিলো, মস্তিষ্ক উর্বর ছিলো, মেধা শক্তি ছিলো তীক্ষ্ণ, অনলবর্ষী বক্তা ছিলে, দুর্বার গতিতে মিছিল-মিটিং করার ক্ষমতা ছিলো, তখন তুমি তোমার যাবতীয় শক্তি ব্যয় করেছো X দলের পক্ষে। আর এখন তো তুমি মৃত লাশের মতো। তোমাকে দিয়ে এখন Y দলের কি উপকার হবে?

আপনারাই বলুন, Y দল কেনো– দেশের কোনো একটি রাজনৈতিক দলও কি এই অথর্ব-অক্ষম লোকটিকে নিজের দলে গ্রহণ করবে? কেউ করবে না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যদি এই কথা সত্য হয়, তাহলে যে ব্যক্তি তার জীবনকালে মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি, মৃত্যুর পরে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যতই বলা হোক না কোনো, তোমাকে আল্লাহর নামে আর রাসূলের আদর্শের ওপর রাখা হলো, আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই ঐ ব্যক্তিকে গ্রহণ করবেন না। মৃতদেহ নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা কি করবেন? কৈশোর, তারুণ্য-যৌবনকাল তথা জীবনের সবটুকু সময় সে দিয়েছে শয়তানকে, আর মৃত্যুর পরে মরাদেহ দিচ্ছে আল্লাহকে– ইসলামের বিধানের সাথে এর থেকে বড় প্রহসন আর কি হতে পারে?

বর্তমান পৃথিবীতে মৃতদেহের ব্যাপারে এক নতুন সংস্কৃতি চালু হয়েছে। দেশের কোনো কর্তা ব্যক্তি মারা গেলে বা যুদ্ধে কোনো দেশের সৈন্য নিহত হলে অথবা বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা মারা গেলে তার কফিন দেশের বা দলীয় পতাকায় আবৃত করা হয়। মনে করুন, X দলের কোনো নেতা মারা গেলো, প্রচলিত বস্তুবাদী সংস্কৃতি অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই তার কফিন X দলের পতাকায় আবৃত করা হবে। এখন X দলের নেতার কফিন তার দলীয় পতাকায় আবৃত না করে যদি Y দলের পতাকায় আবৃত করা হয়, তাহলে বিষয়টি কি X দলের লোকজন মেনে নেবে?

সাধারণ মানুষ যদি এই বিপরীত বিষয়টি মেনে না নেয়, তাহলে মহাজ্ঞানী ও শক্তিধর আল্লাহ তা'য়ালা কি করে এ ধরনের বিপরীত বিষয় মেনে নেবেন?

হতে পারেন আপনি একজন শ্রমজীবি, চাকরীজীবি, কৃষিজীবি, শিল্পী, গায়ক, শিল্পপতি, চিকিৎসক, মাওলানা-পীর, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, ওয়ায়েজীন-বক্তা, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, গবেষক বা অন্য কিছু। আপনি জীবিতকালে যা কিছুই করলেন, তা এই দুনিয়ার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের

জন্য। আপনার যাবতীয় কর্ম তৎপরতা পরিচালিত হলো মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত পন্থায়। আর মৃত্যুর পরে আপনার মৃতদেহ তুলে দেয়া হলো আল্লাহর রাসূলের দলে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কি আপনাকে রাসূলের দলে শামিল করবেন?

আপনার শ্রম, ব্যবসা, চাকরী, শিল্পকর্ম, গান, শিল্প, চিকিৎসা, ফতোয়া, পীর-মুরিদী, রাজনীতি, বিবেক-বুদ্ধি, লেখা, কবিতা-সাহিত্য, বক্তৃতা, অর্থনৈতিক নীতিমালা, আবিষ্কার বা গবেষণা কোনো কাজই মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেননি। জীবনের কোনো একটি দিকেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করেননি। কিন্তু আপনার মৃত্যুর পরে কাফন-দাফনের সময় বলা হলো, তোমাকে আল্লাহর নামে ও রাসূলের দলে তুলে দেয়া হলো।

জেনে বুঝে আপনার মৃতদেহকে কেন্দ্র করে যারা এ কথাগুলো বললো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে তাদের ধারণা মোটেই সুবিবেচনা প্রসূত নয়। তাদের মনে যদি আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি থাকতো যে, 'যার মৃতদেহকে কেন্দ্র করে আমরা এই কথাগুলো বলছি, এই ব্যক্তি জীবিতকালে রাসূলের দল করেছে না শয়তানের দল করেছে, তা মহান আল্লাহ অবশ্যই দেখেছেন। আখিরাতের ময়দানে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে।' তাহলে তারা অবশ্যই আপনার মৃতদেহকে কেন্দ্র করে ঐ কথাগুলো বলতো না।

আপনি একজন রাজনীতিবিদ, ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আপনি বস্তুবাদী দর্শনভিত্তিক রাজনীতি করলেন, মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম, হরতাল-ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল করলেন। যারা দেশের বুকে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে, তাদের বিরোধিতা করলেন, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বক্তৃতা, বিবৃতি দিলেন। আপনার মেধা-মননশীলতা, শিক্ষা, জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি তথা যাবতীয় যোগ্যতা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানুষের বানানো ভোগবাদী গনতন্ত্রের পক্ষে ব্যয় করলেন। অর্থাৎ আপনি চেষ্টা-সংগ্রাম করলেন আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথা শয়তানের পথে। মহান আল্লাহর ভাষায়-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ-

যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তারা আন্দোলন-সংগ্রাম করে তাগুতের পথে। (সূরা আন নিসা-৭৬)

এভাবে কুফরীর পথে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে করতে সময়ের ব্যবধানে বার্ধক্য আপনার দেহকে অবসাদ গ্রস্থ করে দিলো। বয়সের ভারে দেহ নুজ হয়ে পড়লো। আপনার যৌবনের জৌলুস হারিয়ে গেলো। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে আপনার সুখ্যাতি ছিলো, এখন আপনার কথা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রোগ-ব্যধি আপনাকে গ্রাস করেছে। ক্রমশঃ আপনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন।

মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন যুগিয়েছে, পবিত্র কোরআনের ভাষায় তারা হলো শয়তানের দল। আপনি সারা জীবন শয়তানের দল করলেন, এরপর আপনার মৃত্যুর পরে আপনাকে কবরে নামানোর সময় বলা হলো, তোমাকে রাসূলের দলে তুলে দেয়া হলো।

আপনি আপনার কৈশোর, তারুণ্য এবং যৌবন তথা জীবনের সোনালী বেলা কাটিয়ে দিলেন শয়তানের দলে, আর মৃত্যুর পরে মূল্যহীন দেহটি তুলে দিচ্ছেন রাসূলের দলে। আপনার এই মৃতদেহ কি মহান আল্লাহর কোনো প্রয়োজনে আসবে? এই মৃতদেহ নিয়ে তিনি কি করবেন?

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বার বার ডেকে বলেছেন, 'তোমরা মহান আল্লাহর সাহায্যকারী হও।' আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া বলতে বুঝায় আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান্-মাল দিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করা। আপনি আপনার জীবনকালে একটি বারের জন্যও কোরআনের আহ্বানে সাড়া দেননি। মৌলবাদ আর সম্প্রদায়িকতার নামে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করেছেন এবং শয়তানের দল করেছেন। আপনার মৃত্যুর পরে কবর দেয়ার সময় যতই বলা হোক না কেনো, 'তোমাকে রাসূলের দলে তুলে দেয়া হলো।' এসব কথা কোনো কাজে আসবে না। আপনার এবং আপনার মতো যারা, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত শুনুন-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ-

নিশ্চিত জেনে রেখো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং এর মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশ

www.pathagar.com

জগতের দুয়ার কখনই খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রের গমন। (সূরা আল আ'রাফ-৪০)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং এই বিধানের বিপরীত বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করেছে, মৃত্যুর পরে তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব এই লোকগুলোর জান্নাতে প্রবেশ করা।

আখিরাত ভিত্তিক চরিত্র গড়ুন

প্রত্যেক নবী-রাসূলই পরকালে আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা বলেছেন এবং মানুষের মনে পরকালের ভীতি সঞ্চার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তার সিংহভাগ জুড়ে থেকেছে পরকাল সম্পর্কিত আলোচনা। সর্বশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানব জাতির জন্য যে সর্বশেষ জীবন বিধান–আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এর মধ্যেও পরকালের বিষয়টিই সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে।

গোটা ত্রিশপারা কোরআনে পরকাল সম্পর্কিত যে আলোচনা এসেছে, তা একত্রিত করলে প্রায় দশ পারার সমান হবে। পরকালে জবাবদিহির ভীতি ব্যতীত কোনক্রমেই মানুষের মন-মস্তিষ্ক অপরাধের চেতনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সর্বাধিক কঠোর আইন প্রয়োগ করেও মানুষকে অপরাধ মুক্ত সৎ জীবনের অধিকারী বানানো যায় না। কারণ অপরাধীর প্রতি শাস্তির দন্ড প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন হবে সাক্ষ্য প্রমাণের। পক্ষান্তরে যে অপরাধী কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ না রেখে অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করে, সে থাকে আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং তার প্রতি পৃথিবীতে দন্ডও প্রয়োগ করা যায় না।

সুতরাং পৃথিবীতে এমন কোন আইন-কানুনের অস্তিত্ব নেই, যে আইন মানুষকে নির্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে একাকী অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। এই অবস্থায় মানুষকে অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে পারে কেবল পরকাল ভীতি তথা আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতি। এ কারণেই মানব মন্ডলীর জন্য প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআনে পরকালের বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

অপরদিকে প্রত্যেক যুগেই একশ্রেণীর মানুষ পরকালের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করেছে এবং পরকালের স্বপক্ষে যারা কথা বলেছে, তাদের বিরোধিতা করেছে। এই শ্রেণীর লোকগুলো কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে চায়নি যে, মৃত্যুর পরে মানুষ পুনরায় পুনর্জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহর আদালতে যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে। এই শ্রেণীর মানুষদের একজন স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তাঁর গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট।

এ জন্য তারা কোনভাবেই মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনকে বিশ্বাস করতে চায়নি। মৃত্যুর পরে মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি, চর্ম, গোস্ত এবং প্রতিটি অণু-পরমাণু ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মাটি সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলে। এরপরে কিভাবে পূর্বের ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ জীবন লাভ করবে? এই বিষয়টি হলো পরকাল সম্পর্কে সংশয়িত লোকদের চিন্তা-চেতনার অতীত।

আখিরাত বিশ্বাসীদের অপরাধ কি?

প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীরা যখন পরকালের কথা বলে মানুষের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছেন এবং মানুষের ভেতরে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, তখন পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী লোকগুলো নবী-রাসূলদেরকে পাগল হিসাবে চিহ্নিত করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। পরকাল সম্পর্কে কোন মতবাদ তারা গ্রহণ করতে চায়নি বরং পরকাল বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করেছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, যারা পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির কথা বলেছে, তাদের প্রতি একশ্রেণীর মানুষ কেন মারমুখী আচরণ করেছে এবং কেনই বা তাদেরকে নির্যাতন করেছে? পরকাল বিরোধিদের এমন কি ক্ষতি হচ্ছিলো যে, তারা পরকাল বিশ্বাসীদেরকে বরদাশ্ত করেনি?

আসলে পরকাল বিরোধিতার পেছনে এক মনস্তাত্বিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সেই কারণ হলো, যেসব লোক পরকালে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে–এ কথা বিশ্বাস করে, তাদের চরিত্র, আচার-আচরণ, মননশীলতা ও রুচি, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি হয় এক ধরনের। আর পরকাল অবিশ্বাসীদের উল্লেখিত যাবতীয় বিষয় হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, এ কথা আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে সত্য বলেই প্রমাণিত হয়ে আসছে।

যে ব্যক্তি পরকাল বিশ্বাস করে, তার এমন এক মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে যে, সে প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখে যে, তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কর্মকান্ড রেকর্ড হচ্ছে এবং মৃত্যুর পরের জগতে এ সম্পর্কে তাকে মহান আল্লাহর

www.pathagar.com

দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। মহান স্রষ্টা তার ওপরে যে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন, তার দৃষ্টি থেকে কোন কিছুই গোপন করা যাবে না। সে যদি কোন অপরাধমূলক কর্ম করে থাকে তাহলে এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে–এ বিশ্বাস তার ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলেই সে যে কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

আর যারা পরকাল অবিশ্বাস করে অথবা পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, তাদের চরিত্র হয় পরকাল বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, পরকাল বলে কিছুই নেই সুতরাং তাদের কোন কর্মের ব্যাপারে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। পৃথিবীর জীবনে তারা যদি অবৈধভাবে জীবন-যৌবনকে ভোগ করে, অপরের অধিকার খর্ব করে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়ে, দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের জন্য দেশ ও জাতির ক্ষতি করে, জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে, ক্ষমতার বলে অধীনস্থদের অপরাধমূলক কর্মে জড়িত হতে বাধ্য করে, স্বৈরাচারী নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে দেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করে, সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে তাদেরকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করে–তবুও তারা ভয়ের কোন কারণ অনুভব করে না। কারণ তারা এ বিশ্বাসে অটল যে, মৃত্যুর পরে তাদের এসব হীন কর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

কারণ পরকাল বিশ্বাস করলেই নিজের প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিতে হবে, যে কোন ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতা বন্ধ করতে হবে, অন্যায় ও অবৈধ পথে নিজের জীবন-যৌবনকে ভোগ করা যাবে না, অন্যায় পথে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়া যাবে না, ক্ষমতার মসনদে বসে দেশ ও জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, নিজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল করতে হবে, নির্দিষ্ট একটি গন্ডির ভেতরে নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। আর এসব করলে তো জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা যাবে না। পরকালের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণের পেছনে এটাই হলো মনস্তাত্বিক কারণ।

এই ধরনের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা গঠিত হয় পরকাল অবিশ্বাস করার কারণে। নৈতিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা, সুবিচার, দুর্বল, নির্যাতিত-নিপীড়িত ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন ইত্যাদি সৎ গুণাবলীতে তারা বিশ্বাসী নয়। অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, অনাচার, হত্যা-সন্ত্রাস, অঙ্গীকার ভঙ্গ

www.pathagar.com

ও বিশ্বাসঘাতকতা এদের কাছে কোন অপরাধ বা নৈতিকতার লংঘন বলে বিবেচিত হয় না। নিজের যৌন কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নারী জাতিকে এরা ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। ব্যক্তি স্বার্থ, জাতিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য একটি মানুষকেই শুধু নয়, গোটা একটি দেশ বা জাতিকে নিজেদের গোলামে পরিণত করতে বা ধ্বংস করে দিতেও এরা কুণ্ঠাবোধ করে না। পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সাক্ষী, এই পৃথিবীর বুকে এমন বহু জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করার পরও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকার কারণে তারা নিমজ্জিত হয়েছে নৈতিক অধঃপতনের অতল তলদেশে।

পরকাল অবিশ্বাসের কারণে তারা নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করে ন্যায়ের শেষ সীমা যখন অতিক্রম করেছে, তখনই তারা আল্লাহ তা'য়ালার গযবে নিপতিত হয়ে এই পৃথিবী থেকে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। অধিকাংশ মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবার এটাই হলো মূল কারণ যে, তাদের অন্তরে পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই। পরকাল বিশ্বাস অন্যায়কারীর হাতে-পায়ে জিঞ্জির পরিয়ে দেয়, ফলে সে অন্যায় পথে অগ্রসর হতে পারে না বিধায় তারা নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে করেছে অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত এবং আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে, ফাঁসির রশি তাদের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়েছে এবং বর্তমানেও তাদের উত্তরসূরিদের আচরণে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এই শ্রেণীর লোক পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে তাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত, সুশৃংখল এবং উদগ্র কামনা-বাসনাকে দমন করতে অতীতে যেমন রাজী ছিল না বর্তমানেও রাজী নয়। নিজ দেশের জনগণ বা ভিন্ন দেশের জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে তাদের ওপরে প্রভুত্ব করার কলুষিত কামনাকে এরা নিবৃত্ত করতে আগ্রহী নয়।

নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও পরকালের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই হলো মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার মূল কারণ। এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَاطْمَانُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ ايتِنَا غفِلُوْنَ، أُولئِكَ مَاْوهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

প্রকৃত বিষয় এই যে, যারা আমার সাথে আখিরাতে মিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং পৃথিবীর জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐসব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি অনুসারে করেছে। (সূরা ইউনুস-৭-৮)

এসব লোক পৃথিবীর জীবন নিয়েই নিশ্চিন্ত থেকেছে এবং কখনো এ চিন্তা তাদের মনে উদয় হয়নি যে, তাদের একজন স্রষ্টা এবং প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি তাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিপালন করছেন এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে যাচ্ছেন। সেই আল্লাহ্ তা'য়ালা যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দেখছেন এবং তাঁর কাছে সমস্ত কিছুর হিসাব দিতে হবে, এই বিশ্বাস তাদের নেই। এ কথা তারা বিশ্বাস করে না যে, এমন একটি সময় আসবে, সে সময়ে তাদের নিজেদের দেহের চামড়া, চোখ, কান, হাত-পা ইত্যাদি স্বয়ং তারই বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবে। এই বিশ্বাস না থাকার কারণেই তারা পৃথিবীতে যা খুশী করছে এবং মারাত্মক ক্ষতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। আখিরাতের দিন এসব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে বলা হবে–

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ، وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخسِرِيْنَ-

পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় যখন তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের সংবাদ আল্লাহও রাখেন না।

www.pathagar.com

তোমাদের এই ধারণা–যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে–তোমাদের সর্বনাশ করেছে এবং এর বিনিময়েই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো। (সূরা হা-মীম সাজ্‌দাহ্- ২২-২৩)

পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী ও অবিশ্বাসী লোকগুলো এই পৃথিবীতে আপাদ-মস্তক নোংরামীতে নিমজ্জিত থেকেছে, নিজের দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যায় কাজে ব্যবহার করেছে কিন্তু নিজের অজান্তেও এ কথা তারা কল্পনা করেনি যে, তার দেহের যে অঙ্গগুলোর প্রতি সে এত যত্নশীল এবং এসব অঙ্গের শোভাবর্ধন করার লক্ষ্যে সে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, এসব অঙ্গ-ই একদিন তার বিরুদ্ধে তারই অন্যায় কাজের সাক্ষী দেবে। এসব লোক বিশ্বাস করেছে স্রষ্টা বলে কেউ নেই এবং কোন কর্মের হিসাবও কারো কাছে দিতে হবে না, তাদের এই বিশ্বাসই তাদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে হাশরের ময়দানে।

ভ্রান্ত এই বিশ্বাস অনুসারে এসব লোক পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালিত করেছে এবং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, প্রভাবাধীন আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় লোকজন এবং নিজের অধীনস্থদের পরিচালিত করে তাদেরকেও মহাক্ষতির দিকে নিক্ষেপ করেছে। আখিরাতের দিন এসব লোকদেরকে যখন গ্রেফতার করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকগুলো ঐ লোকগুলো সম্পর্কে বলবে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

যারা ঈমান এনেছিলো সেই সময় তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা শূরা-৪৫)

ঐ শ্রেণীর মানুষগুলোই সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে পৃথিবীতে যাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং এরা মনে করতো, তারা যা করছে তা সঠিক কাজই করছে। এরা লেখাপড়া, বিদ্যা অর্জন, সমাজ কল্যাণমূলক কাজ, রাজনীতি, আন্দোলন-সংগ্রাম, মিছিল-মিটিং ধর্মঘটসহ যা কিছুই করেছে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত

www.pathagar.com

পথে না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে করেছে। কারণ এরা ভেবেছে এই পৃথিবীর জীবনই আসল জীবন, মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই। সুতরাং কারো কাছে নিজের কাজের হিসাব দিতে হবে না। এসব লোক পৃথিবীর জীবনে সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে।

এই শ্রেণীর লোকগুলো মহান আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও সেই আল্লাহ, কোন্ কাজে সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট হবেন, তাঁর সামনে গিয়ে একদিন উপস্থিত হতে হবে এবং নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এ চিন্তা তারা কখনো করেনি। পক্ষান্তরে এসব লোকগুলো পৃথিবীতে নিজেদেরকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করতো। তারা ধারণা করতো, তারা যা করছে—তা অবশ্যই সঠিক পথেই পরিচালিত হচ্ছে। দেশ ও জনগণের কল্যাণের দোহাই দিয়ে আন্দোলন মিছিল-মিটিং, হরতাল করছে, সন্ত্রাস করে দেশ ও জনগণের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি করছে, দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে, তবুও এরা জোর গলায় প্রচার করছে, তারা যা কিছুই করছে তা দেশের মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই করছে। এসব লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا -

হে রাসূল! এদেরকে বলুন, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই— যাদের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক পথেই করে যাচ্ছে। (সূরা কাহ্ফ-১০৩-১০৪)

প্রথম খন্ড সমাপ্ত

www.pathagar.com

আল্লামা সাঈদী

রচনাবলী

১

www.pathagar.com